Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামে নারীর ভূমিকা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

রিফাত পারভীন

রোলঃ 227021736

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামে নারীর ভূমিকা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

রিফাত পারভীন

রোলঃ 227021736

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ ইসলামে নারীর ভূমিকা ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে রিফাত পারভীন, আইডিঃ 227021736 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আলী হাসান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ইসলামে নারীর ভূমিকা" শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

রিফাত পারভীন

আইডিঃ 227021736

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানবজাতিকে সৃষ্টি করে তাকে দুটি প্রজাতিতে ভাগ করে দিয়েছেন। 'পুরুষ ও নারী'। কুরআন কারীমে এসেছে,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

হে মানব, আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিতি হও। নিশ্চয় আল্লাহর কাছে সে-ই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত যে সর্বাধিক পরহেযগার। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবকিছুর খবর রাখেন।
(সূরা হুজুরাত আয়াত: ১৩)

এই পৃথিবীকে বাসযোগ্য করে তোলা, আল্লাহর দাসত্বের দাবি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা, শরয়ী বিধি-বিধান পালন, কর্মের মানদণ্ডে পাপ-পুণ্য লাভের নিশ্চয়তা ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ে উভয় প্রজাতির রয়েছে সমান অংশীদারিত্ব।
কুরআন কারীমে এরশাদ হয়েছে,

وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

যে লোক পুরুষ হোক কিংবা নারী, কোন সৎকর্ম করে এবং বিশ্বাসী হয়, তবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রাপ্য তিল পরিমাণ ও নষ্ট হবে না।
(সূরা নিসা: আয়াত ১২৪)

সৃষ্টিকর্তার দরবারে যেমন কেউ কারো চাইতে ছোট নয়, দুনিয়াতে পাঠানোর সময়ও তেমনি তিনি কারো অধিকারকে খর্ব করে পাঠাননি। উভয়ের রয়েছে সুনির্দিষ্ট হক। কুরআন কারীমে এসেছে,

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

আর পুরুষদের যেমন স্ত্রীদের উপর অধিকার রয়েছে, তেমনি ভাবে স্ত্রীদেরও অধিকার রয়েছে পুরুষদের উপর নিয়ম অনুযায়ী। আর নারীরদের ওপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। আর আল্লাহ হচ্ছে পরাক্রমশালী, বিজ্ঞ।
(সূরা বাকারা: আয়াত ২২৮)

বস্তুত, যে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ দুটি প্রজাতিকে সমান মমতা- ভালোবাসা ও করুণা দিয়ে তৈরি করেছেন, সেই মহান সৃষ্টিকর্তা পুরুষ ও নারী উভয়কে সমান দায়বদ্ধতা দিয়েই প্রেরণ করেছেন। কেননা মানবসভ্যতা নারী পুরুষ উভয়ের পারস্পরিক সহযোগিতামূলক খেদমত এবং কর্মকান্ডের মাধ্যমেই টিকে থাকতে পারে।
কুরআন কারীমে এরশাদ হয়েছে,

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

আর ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী-তারা একে অপরের বন্ধু। তারা পরস্পরে নেক কাজের আদেশ করে, মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে, নামাযের পাবন্দি করে, যাকাত আদায় করে, আল্লাহ ও তার রাসুলের আনুগত্য করে। তারাই ঐ সকল লোক, যাদের উপর আল্লাহ রহম করেন। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। (সুরা তওবা: আয়াত ৭১)

বিভিন্ন যুগে নানা জাতি নারীকে নানাভাবে মূল্যায়ন করেছে। কেউ কেউ নারীকে নিম্নস্তরের ইতর প্রাণীর সঙ্গে তুলনা করে তাকে ভোগ্যসামগ্রীর মতো শুধুই ব্যবহার করেছে। আবার কেউ কেউ তাকে এমন মর্যাদা দিয়েছে যে, তাকে আল্লাহর আসনে সমাসীন করেছে।

একমাত্র ইসলাম এসেই নারীদের দিয়েছে প্রকৃত মর্যাদা ও অধিকার যা এর আগে পৃথিবীর কোন জাতি-সম্প্রদায় ও দেশ দিতে পারেনি। ইসলাম এসে ঘোষণা করেছে- নারী তোমার সম্মান, নারী যদি তোমার বোন হয় তা হলে সে তোমার গর্ব, নারী যদি তোমার স্ত্রী হয় তাহলে সে তোমার জীবন সঙ্গিনী, নারী যদি তোমার মা হয় তাহলে তাঁর পায়ের নিচে তোমার জান্নাত।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

পার্থিব জগৎ হলো ক্ষণিক উপভোগের বস্তু। আর পার্থিব জগতের সর্বোত্তম সম্পদ পুণ্যময়ী নারী। (মুসলিম, হাদিস : ১৪৬৭)

নারীর সম্মান ও নিরাপত্তা রক্ষায় ইসলাম প্রয়োজনীয় সব বিধান দিয়েছে। পবিত্র কুরআনে সুরা 'নিসা' (অর্থ : নারী) নামে একটি সুরাও নাযিল হয়েছে।
হাদিস শরীফে ইরশাদ হয়েছে,

اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا

তোমরা নারীদের কল্যাণ কামনা কর। (মুসলিম, হাদিস নং: ৩৭২০)

ইসলামের ইনসাফ ও ন্যায়ভিত্তিক জীবনব্যবস্থা নারীকে গৃহপালিত ইতর প্রাণীর স্তর থেকে হাতে ধরে মা-বোন, স্ত্রী-কন্যার রাজসিংহাসনে বসিয়েছে। ইসলামের প্রাপ্ত অধিকার ও মর্যাদায় ভূষিত হয়ে নারীগণ জীবন ও সমাজের নানা শাখায় এমন অসাধারণ কীর্তি রেখে গেছেন যা ইতিহাসের সোনালী পাতায় চিরভাস্বর হয়ে থাকবে যুগ যুগ ধরে। অনেক সময় তাদের অবদান পুরুষদের অবদানকে ছাড়িয়ে গিয়েছে।

মুসলিম নারীগণ পুরুষদের পাশাপাশি দ্বীন, ঈমান ও ইলমের জন্য যে অসাধারণ ত্যাগ ও কুরবানী দিয়েছেন তার তুলনা তাঁরা নিজেরাই। সম্পূর্ণ শরীয়তের গণ্ডির মধ্যে থেকে পারিবারিক জীবনের খুঁটিনাটি বিষয় থেকে নিয়ে সাহিত্য-সংস্কৃতি, দ্বীনী শিক্ষা অর্জন, দ্বীনের সংরক্ষণ, প্রচার-প্রসার, এমনকি জিহাদের ময়দানে স্বশরীরে যোগদান, শাহাদাত বরণসহ জীবন ও সমাজের প্রতিটি শাখায় তাঁরা অনন্য ভূমিকা পালন করেছেন।

ওসমানী (অটোমান) খিলাফতের পতনের পর থেকে শুরু হওয়া পাশ্চাত্যের অন্ধ গোলামির কুপ্রভাবে একবিংশ শতাব্দীর এই চলমান সময়ে মুসলিম বিশ্বের আকাশে বাতাসে উড়ে বেড়াচ্ছে 'নারী মুক্তি', 'নারী স্বাধীনতা' 'নারী-পুরুষের সমঅধিকার' ইত্যাদি চটকদার নাম বিশিষ্ট নির্বুদ্ধিতা, শয়তানি ও ষড়যন্ত্রের কতিপয় বিষাক্ত বেলুন। এসব বহুকথিত ও বহুলচর্চিত ফানুসের পেছনে ছুটে ছুটে পাশ্চাত্য হারিয়েছে শালীনতা, সম্ভ্রম, আত্মসম্মানবোধ, সুস্থ রুচি, সুস্থ পরিবার প্রথা এবং সর্বোপরি সুস্থ নির্মল জীবনবোধ।

পাশ্চাত্য সমাজগুলোর কর্তাব্যক্তিরা নিজেদের নৈতিকতা উচ্ছন্নে যাওয়ার পর নজর দিয়েছে রক্ষণশীল মুসলিম সমাজগুলোর দিকে। মিথ্যে স্বাধীনতা আর নগ্ন মুক্তির প্রলোভন দেখিয়ে মুসলিম নারীদেরকে ঘরের সুরক্ষিত নিরাপদ আশ্রয় থেকে রাস্তায় নামিয়ে আনার জন্য তাদের নিরন্তর প্রচেষ্টা রূপ নিয়েছে এক অলিখিত 'মিডিয়া ক্রুসেড'-এ। কেননা, একটি পরিচ্ছন্ন সমাজব্যবস্থার নৈতিক ভিত্তি ধসিয়ে দেওয়ার সবচেয়ে সহজ উপায় হলো, সে সমাজের নারীদের নৈতিকতা ও চারিত্রিক নির্মলতা নষ্ট করে ফেলা।

আঁট-ঘাঁট বেঁধে ময়দানে নামা অভিজ্ঞ প্রতিপক্ষের মোকাবেলায় হিমশিম খাচ্ছে অপ্রস্তুত মুসলিম কমিউনিটিগুলো। এ ধরনের জটিল পরিস্থিতিতে মুসলিম নারী সমাজের অবক্ষয় থেকে বেঁচে থাকার প্রথম ও প্রধান উপায় হলো নিজেদের আত্মপরিচয় ও প্রকৃত ভূমিকা খুঁজে বের করে তার উপর অটল থাকা এবং সাথে সাথে প্রচার-প্রচারণার অন্তরালের প্রকৃত বাস্তবতা সম্পর্কে সঠিক ধারণা রাখা।

তাই যদি আধুনিক নারী সমাজের সামনে ইসলামের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুসলিম মহীয়সীদের স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার মত ভূমিকা উপস্থাপন করা হয় তাহলে হয়তো পূর্বসূরীদের কীর্তিকলাপ তাদেরকে আকর্ষণ করবে, তাদের মধ্যে ঈমান-আখলাক, ইলম-আমলের আগ্রহ তৈরী হবে এবং তাদেরকে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দেওয়া যাবে। এভাবে যেমন একদিকে জানা যাবে ইসলামের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুসলিম নারীদের অমর কীর্তিগাথা, তেমনি অন্যদিকে বর্তমান সময়ের নির্যাতিতা-নিগৃহীতা নারী সমাজ খুঁজে পাবে তাদের চলার পথের পাথেয়।

ইসলামের পরিচয়

আভিধানিক অর্থ

ইসলাম শব্দটি سِلْمٌ শব্দ থেকে উৎকলিত। অভিধানে শব্দটি বিভিন্নভাবে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যথা:

১. اَلسَّلَم (سُ ও ل অক্ষরে যবর) অর্থ- ألاسْتِسْلاَم: আত্মসমর্পণ করা।

যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন-

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاء مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا

'আল্লাহ একটি উপমা পেশ করেছেন। একজন লোকের যার পরস্পর বিরোধী কয়েকজন মালিক রয়েছে, আরেক ব্যক্তির প্রভু মাত্র একজন। তাদের উভয়ের অবস্থা কি সমান?'
(সূরা যুমার : ২৯)

২. اَلسَّلْم (سُ ও ل অক্ষরে সাকিন) অর্থ- اَلصَّلْحُ: সন্ধি করা।

আল্লাহ তাআলা বলেন-

وإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا

'আর যদি তারা সন্ধি করতে আগ্রহ প্রকাশ করে, তাহলে তুমিও সে দিকেই আগ্রহী হও।'
(সূরা আনফাল : ৬১)

فَلاَ تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ

'তোমরা দুর্বল হয়ো না এবং সন্ধির জন্য আহ্বান করো, তোমরাই বিজয়ী হবে।'
(সূরা মুহাম্মদ : ৩)

৩. اَلسِّلْم (سُ অক্ষরে যের ও ل অক্ষরে সাকিন) অর্থ- اَلإِطَاعَةُ : আনুগত্য ও السَّلامُ: শান্তি। এ অর্থ দিয়ে ইসলামকে বোঝানো হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً

'হে ঈমানদারগণ। তোমরা পুরোপুরি ইসলামে প্রবেশ করো।'
(সূরা বাকারা : ২০)

পারিভাষিক সংজ্ঞা

ইসলাম সম্পর্কে অনেক সংজ্ঞা পাওয়া যায়। উল্লেখযোগ্য কিছু সংজ্ঞা এখানে আলোচনা করা হলো।

ইসলাম শব্দের অর্থ আনুগত্য করা, আত্মসমর্পণ করা, আল্লাহর কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করা এবং অনুগত হওয়া। এ কারণেই এর নাম ইসলাম। ইসলামের আরেকটি শাব্দিক অর্থ হচ্ছে- শান্তি। এর তাৎপর্য হলো, মানুষ তার দেহ ও মনের প্রকৃত শান্তি অর্জন করতে সক্ষম হয় শুধু আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ এবং অনুগত হওয়ার মাধ্যমে। এ ধরনের অনুগত জীবন অন্তরে শান্তি আনে এবং সামাজিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয় প্রকৃত শান্তি।

ইসলাম শব্দটি শরিয়তে ব্যবহৃত হয় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনীত বিশ্বাস ও বিধি-বিধানের সমষ্টিপূর্ণ দ্বীনের ক্ষেত্রে। 'ইসলাম' অর্থাৎ যাকে দ্বীন বলা হয়েছে, তা হলো গোপনে ও প্রকাশ্যে নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর আনুগত্য করা।

মোটকথা, আল্লাহর একত্ববাদের স্বীকৃতি দিয়ে আত্মসমর্পণ করা এবং সব ধরনের শিরক মুক্ত হয়ে আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করার নামই ইসলাম।

আত-তাবারী তার তাফসীরে বলেন-
'ইসলাম হলো আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করা তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমে।'

মুফতী মু. শফী বলেন-
'ইসলাম শব্দের আসল অর্থ আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করা এবং তাঁর অনুগত হওয়া। এ অর্থের দিক দিয়ে প্রত্যেক পয়গম্বরের আমলে যারা তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং তাদের আনীত বিধিবিধানের আনুগত্য করছে, তারা সবাই মুসলিম নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য ছিল। তাদের ধর্মও ছিল ইসলাম।

হাদিস শরিফে ইসলামের একটি সংজ্ঞা ও পরিচিতি সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। জিবরাঈল (আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম) যখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ইসলাম কী, আমাকে বলুন।

উত্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

'ইসলাম হলো এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল। নামায কায়েম করা, যাকাত দেওয়া, রমযান মাসে রোযা রাখা, বায়তুল্লাহর হজ্ব করা- যদি সক্ষমতা থাকে।

(মুসলিম, আবুল হোসাইন মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ, আস-সহীহ, কিতাবুল ঈমান, বাব: মারিফাতুল ঈমান ওয়াল ইসলাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৮)

একমাত্র ধর্ম-জীবনব্যবস্থা

ইসলাম আল্লাহপাকের মনোনীত একমাত্র 'দ্বীন', যা একটি পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত এ ব্যবস্থার আলোকে একজন মুসলমানকে জীবনযাপন করতে হয়। ইসলামে রয়েছে সুষ্ঠু সমাজ, রাষ্ট্র ও অর্থ ব্যবস্থা। আরো আছে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতিমালা। মানব চরিত্রের উৎকর্ষসাধন, ন্যায়নীতি ও সুবিচারভিত্তিক শান্তি-শৃঙ্খলাপূর্ণ গতিশীল সুন্দর সমাজ গঠন এবং সংরক্ষণে ইসলামের কোনো বিকল্প নেই, হতে পারে না।

ইসলাম এমন একটি ধর্ম, যার মাধ্যমে যখন মানুষ আল্লাহর সাথে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয় এবং তাঁর ইচ্ছার কাছে নিজেকে সমর্পণ করে, তখন সমগ্র মানবতার জন্য বয়ে আনে শান্তি। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর ওপর নাযিলকৃত পবিত্র গ্রন্থের বর্ণনা অনুযায়ী আদম (আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম) থেকে শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত সব নবী এই একমাত্র সত্য দ্বীনের প্রচার করে গেছেন। প্রত্যেক পয়গম্বরের আমলে আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য ধর্ম ইসলাম। যা তাদের অহী ও শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, সেটা ছাড়া অন্য কোনো ধর্মই গ্রহণযোগ্য নয়; যদিও তা বিগতকালের রহিত ধর্মও হয়ে থাকে। পরবর্তীকালে তা আর ইসলাম নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য থাকে না। ইবরাহীম আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম-এর কালে তার ধর্ম ছিল ইসলাম। মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম-এর যমানার সেই ধর্মের যেসব বিধান রহিত হয়ে যায়, তা ইসলাম নয়। তেমনিভাবে মূসা আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম-এর শরীয়তের কোনো বিধান রহিত হয়ে থাকলে তা ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম-এর সময় ইসলাম ছিল না। ঠিক এমনিভাবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আমলে পূর্ববর্তী শরীয়তের যেসব বিধান রহিত হয়েছে, তা এখন ইসলাম নয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আবির্ভাবের পর কুরআন ও তার শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ধর্মই ইসলাম নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য এবং এ ধর্মই আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য, অন্য কোনো ধর্ম নয়।

আল কুরআনে অসংখ্য আয়াত পাওয়া যায়, যেখানে বলা হয়েছে প্রত্যেক নবীর ধর্মই ছিল ইসলাম। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা এ ঘোষণা দিয়েছেন, ইসলামই একমাত্র ধর্ম, যা তাঁর নিকট গ্রহণযোগ্য।

বর্ণিত হয়েছে-

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللهِ الإِسْلام

'ইসলামই আল্লাহ তাআলার নিকট একমাত্র দ্বীন বা জীবন বিধান।

(সূরা আলে ইমরান : ১৯)

তিনি আরো বলেন,

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

'তোমাদের জন্য ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে মনোনীত করে দিয়েছি।' (সূরা মায়েদা : ৩)

আরো বর্ণিত হয়েছে-

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

'ইসলাম ছাড়া যে ব্যক্তি অন্য কোনো কিছুকে দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করতে চায়, তার সে দ্বীন কখনোই গ্রহণ করা হবে না এবং আখেরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।

(সূরা আলে ইমরান : ৮৫)

নারীজাতি সৃষ্টির হিকমাহ

নারীজাতি সৃষ্টি করার পিছনে রয়েছে আল্লাহ তাআলার অফুরন্ত হিকমত ও কল্যাণ-জ্ঞান।

আল্লাহ তা'আলা যখন ফিরেশতাদের সামনে ঘোষণা করলেন-

إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

পৃথিবীতে আমি খলীফাহ বানাতে চাই। (সূরা বাকারা : ৩০)

তখন প্রকৃতপক্ষে সেটা শুধু একজন পুরুষ বা হযরত আদম (আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম) কে সৃষ্টি করার ঘোষণা ছিলো না, বরং নর ও নারী সম্মিলিতরূপে যে 'মানব' সেই মানব সৃষ্টির ঘোষণা ছিলো। অর্থাৎ সেটা হযরত আদম ও হযরত হাওয়া উভয়ের সৃষ্টির ঘোষণা ছিলো। কারণ পৃথিবীতে মানবজাতির বিস্তার ও খেলাফত শুধু পুরুষ দ্বারা সম্ভব ছিলো না।

আদম (আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম) এর খেলাফতে হযরত হাওয়া (আলাইহাস সালাতু ওয়াসসালাম) এর ভূমিকা ছিলো অনিবার্য ও অপরিহার্য।
মানবজাতির বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে নানা সভ্যতা-সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে নানা সম্প্রদায় ও দেশ। পথহারা মানুষের হেদায়াতের জন্য প্রেরিত হয়েছে অসংখ্য নবী-রাসূল। এ সব সম্প্রদায় ও দেশের উত্থান আর নবীদের ঈমানী দাওয়াতের সম্প্রসারণ সব কিছুর নেপথ্যেও নারীদের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

অবার, মানবসম্প্রদায়ের জীবনধারণ ও জীবিকানির্বাহের জন্য একটি সমাজ ও রাষ্ট্রের অস্তিত্ব আবশ্যক। এই লক্ষ্যে আল্লাহ তায়ালা পুরুষের পাশাপাশি নারীজাতি সৃষ্টি করেছেন- প্রজনন ও প্রসবের মাধ্যমে যাদের গর্ভ থেকে মানবসন্তানের জন্ম ও বংশবিস্তার ঘটবে।

নারী জাতির সৃষ্টি সম্পর্কে আল্লাহপাক পবিত্র কুরআনে বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গীনীকে সৃষ্টি করেছেন; আর বিস্তার করেছেন তাদের দু'জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী। (সুরা নিসা: আয়াত ১)

নারী ব্যতীত পুরুষ কোনোভাবেই তার জীবনের স্বাভাবিক সফর সুন্দরভাবে সম্পন্ন করতে পারে না। এমনিভাবে কোনো ভদ্র নারী একজন জীবনসঙ্গী ছাড়া সুন্দরভাবে তার জীবন চালাতে পারে না। এখানে প্রত্যেককেই প্রত্যেকের এমন মুখাপেক্ষী করে তোলা হয়েছে, একজন ছাড়া আরেকজনের জীবনই চলে না।

নারী হচ্ছে নরের জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে একটি পবিত্র উপহার। যার উদ্দেশ্য হচ্ছে সুখ শান্তি ও স্বস্তি লাভ করা।
জান্নাতে হযরত আদম (আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম) কে যখন সৃষ্টি করা হলো, তখন নিজের মধ্যে তিনি একটি শূন্যতা, একটি অভাব এবং অশান্তি অনুভব করছিলেন। তিনি যখন ঘুমুলেন তখন তাঁর বামপার্শ্বের অস্থির ঊর্ধ্ব-অংশ থেকে প্রথম নারী হযরত হাওয়া (আলাইহাস সালাতু ওয়াসসালাম) কে সৃষ্টি করা হলো।

হজরত আদম (আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম) নিজের জীবনসঙ্গী পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং তাঁর সঙ্গ দ্বারা সুখ-শান্তি এবং স্বস্তি ও প্রশান্তি লাভ করলেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"আর এক নির্দশন এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সঙ্গিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাকো এবং তিনি তোমাদের জন্য পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে রয়েছে চিন্তাশীল লোকদের জন্য নির্দশনাবলী।" (সূরা আর রূম-২১)

কুরআন শরীফের এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, নারী সংসারের সুখ-শান্তির এক বড় হাতিয়ার। কবি বলেন- "নারী আছে বলেই সৃষ্টির এতো রূপ।" নারীর ভূমিকা পুরুষের জীবনে কতোটা ক্রিয়াশীল ও গুরুত্বপূর্ণ তা বোঝার জন্য এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, আল্লাহর জমিনে প্রথম হত্যাকাণ্ড নারীকে উপলক্ষ করে সংঘটিত হয়।

এই নারীই হচ্ছে সভ্যতার সুতিকাগার, পৃথিবীর মূল উপাদান ও পরিবারের প্রধান কারিগর। যুগে যুগে এই নারীই পরম মমতাময়ী মা, স্নেহের বোন, আদরের কন্যা, নির্ভরশীলতার অনুপম আধার স্ত্রী। নারী শুধু পৃথিবীতে টিকে থাকার অনিবার্য একক নয়। এই পৃথিবীর স্থিতিশীলতা আর কল্যাণকর রূপায়ণের মূল চালিকাশক্তি।

নারীকে বাদ দিয়ে কেবল পুরুষের গঠিত কোনো মানবসমাজ চিন্তাও করা যায় না। কবির ভাষায় "বিশ্বে যা-কিছু মহান সৃষ্টি চির-কল্যাণকর অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।"

তাই পৃথিবীর জন্য নারী জাতিকে বাদ দিয়ে যে পরিকল্পনা রচিত হবে, তা অনিবার্যভাবে হবে অসম্পূর্ণ এবং ত্রুটিপূর্ণ।

বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতায় নারীর অবস্থা

ইসলাম পূর্ব যুগে নারী ছিল সবচেয়ে অবহেলিত, লাঞ্চিত, বঞ্চিত, নির্যাতিত এবং অধিকার হারা জাতি। সে সময় নারীকে ভোগ-বিলাসের উপকরণ এবং বাজারের পণ্য হিসাবে গণ্য করা হ'ত। সেই সময়ে নারীদেরকে মানুষ হিসাবে যথাযোগ্য মর্যাদা দেয়া হত না এবং তাদের কোন সামাজিক অধিকার স্বীকৃত ছিল না। এমনকি মানব জাতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে সমাজে বেঁচে থাকার অধিকারটুকুও ছিল না। তাদের প্রতি খুবই কঠোর আচরণ করা হ'ত। নারীদেরকে মনে করা হ'ত দাসী এবং ভারবাহী পশু হিসাবে। যাদেরকে ক্রয়-বিক্রয় করা হ'ত। সে আমলে স্বামী যত খুশি স্ত্রী গ্রহণ করত এবং ইচ্ছা করলে তার স্ত্রীকে অপরের কাছে বিক্রি করে দিতে পারত কিংবা স্ত্রীকে দিয়েই কেউ ঋণ পরিশোধ করত। আবার কেউ উপহার হিসাবে কাউকে এমনিই দিয়ে দিত। তারা কন্যা সন্তান জন্মকে লজ্জাজনক মনে করে স্বীয় নিষ্পাপ কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দিতেও কুণ্ঠিত হ'ত না। নারীরা তারা পিতা-মাতা বা স্বামীর মৃত্যুর পর পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকেও বঞ্চিত হ'ত। পিতৃহীনা সুন্দরী-ধনবতী বালিকার অভিভাবক যথাযথ মোহর দানে তাকে বিবাহ করতে সম্মত হ'ত না। আবার অন্যত্র বিবাহ দিতেও অসম্মতি প্রকাশ করত। এ জাতীয় অমানবিক ও অমানুষিক যুলুম অত্যাচার নারী জাতির উপর করা হ'ত। নিম্নে বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতায় নারীর অবস্থান কেমন ছিল সে সম্বন্ধে কিছুটা আলোকপাত করা হলো:

গ্রীক ও রোমান সভ্যতায়

গ্রীক ও রোমান সমাজে নারীকে মনে করা হতো সকল অনিষ্টের মূল এবং সবচে' নিকৃষ্ট প্রাণী। বিশ্বখ্যাত গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস বলেন, 'Woman is the greatest source of chaos and disruption in the world' 'নারী জগতে বিশৃংখল ও ভাঙ্গনের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎস'।

পরিবারে মা, বোন, স্ত্রী ও কন্যা কোন নারীর মর্যাদাই দাসীর চেয়ে বেশী ছিলো না। নারী ছিলো বাজারে বেচা-কেনার পণ্য। পরিবার-প্রধান যে কোন নারীকে বাজারে বিক্রি করতে পারতো। কারণ আইনগতভাবেই নারী ছিলো পরিবারের অস্থাবর সম্পত্তি।

কোন পর্যায়েই নারীর উত্তরাধিকার স্বীকৃত ছিলো না। পুরুষের অনুমতি ছাড়া নারী তার সম্পত্তি ভোগ করতে পারতো না এবং হস্তান্তরও করতে পারতো না।

বিবাহের ক্ষেত্রে নারীর নিজস্ব কোন ইচ্ছা বা অধিকার ছিলো না। পরিবারের প্রধান পুরুষ যে স্বামী নির্বাচন করতো তাকেই গ্রহণ করতে নারী বাধ্য ছিলো।

প্রত্যেক ক্রিয়ার একটি প্রতিক্রিয়া থাকে, এটাই প্রকৃতির অমোঘ বিধান। সে হিসাবে গ্রীক ও রোমান উভয় সভ্যতারই শেষ দিকে বিপরীত প্রতিক্রিয়া দেখা দিলো। নারীসমাজ বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের মত উশৃঙ্খল হয়ে উঠলো এবং সমাজের সর্বত্র নগ্নতা ও যৌননৈরাজ্য ছড়িয়ে পড়লো, যার অনিবার্য ফলরূপে গ্রীক ও রোমান সভ্যতা বিলুপ্ত হয়ে গেলো।

তুরস্কের সুপ্রসিদ্ধ নারী বুদ্ধিজীবী খালিদা এদিব খানম গ্রীক ও রোমান সভ্যতায় নারীর লাঞ্ছনা সম্পর্কে 'তুরস্কে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দ্বন্দ্ব' নামক গ্রন্থে অত্যন্ত বিশদ আলোচনা করেছেন।

চীন সভ্যতায়

মি. স্ট্রেচি প্রাচীন চীনে নারীর অবস্থান জানাতে গিয়ে লেখেন, সুদূর প্রাচো অর্থাৎ চীনে নারীর অবস্থা ও অবস্থান খুব ভালো ছিল না। ছোট্ট ছোট্ট নারী শিশুদের পায়ে বেড়ি-কাঠ বা লোহার জুতো পরানোর প্রথা ছিল। উদ্দেশ্য ছিল তাদেরকে দুর্বল ও শক্তিহীন করে রাখা। এই প্রথা যদিও সমাজের উচ্চশ্রেণি এবং বিত্তবানদের মধ্যে প্রচলিত ছিল কিন্তু এর দ্বারা আসমানী হুকুমতের প্রাক্কালে নারীদের ভয়াবহ অবস্থা সম্পর্কে অনেকটাই আঁচ করা যায়।

ইংল্যান্ডে

মি. স্ট্রেচি ইংল্যান্ডে নারীর অবস্থান বর্ণনা করতে গিয়ে লেখেন, সেখানে নারীকে সব ধরনের নাগরিক সুবিধা ও অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হত। তার জন্য শিক্ষার দরজা বন্ধ ছিল। নিম্নশ্রেণির কিছু কাজকর্ম ছাড়া নারী ভালো কোনো পেশায় নিযুক্ত হতে পারত না। বিবাহের সময় তার সমস্ত সম্পত্তির মালিকানা ত্যাগ করতে বাধ্য করা হত। বলা হত মধ্যযুগ থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত নারীকে যে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে এরচেয়ে ভালো কিছু তখন আশা করা যেত না।

হামুরাবী আইনে নারী

হামুরাবী আইনে (যার জন্য ঐতিহাসিক বাবেল নগরী প্রসিদ্ধ ছিল) নারীকে গৃহপালিত পশুর ঊর্ধ্বে মনে করা হত না। এই নারীর অবস্থান চিহ্নিত করার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, কেউ যদি কারো কন্যাকে হত্যা করত তা হলে তার ক্ষতিপূরণ হিসেবে নিহত কন্যার বাবার হাতে হত্যাকারীর নিজের কন্যাকে আজীবনের জন্য হস্তান্তর করতে হতো। নিহতের বাবা তাকে হত্যা করবে না মাফ করবে নাকি তাকে তার দাসী-বাঁদি হিসেবে রেখে দেবে সেটা ছিল তার ইচ্ছাধীন ব্যাপার। অবশ্য প্রতিশোধ হিসেবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে হত্যাই করা হতো।

ইহুদি জাতি ও খৃস্টধর্মে

ইহুদি জাতি ও খ্রিস্ট ধর্মে নারীকে অভিশপ্ত মনে করা হয়, কারণ তাদের ধারণায় আদমকে ভ্রষ্ট করার জন্য শয়তান হাওয়াকেই অস্ত্ররূপে ব্যবহার করেছিলো। উভয়জাতির বিশ্বাস ছিলো যে, স্ত্রীলোক স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না, কারণ তার মধ্যে মানবাত্মা নেই। এই বিশ্বাসের ভিত্তিতেই ৫৮৬ খৃস্টাব্দে ফ্রান্সে এক ধর্মসম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিলো যে, স্ত্রীলোককে মানুষ বলা তো যায়, তবে তাকে শুধু পুরুষের সেবার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে।

খৃস্টধর্মের প্রভাবে নারীর প্রতি পাশ্চাত্যজগতের আচরণ ছিলো চরম অবমাননামূলক, যা মধ্যযুগ পর্যন্ত অব্যাহত ছিলো। এমনকি ১৮০৫ সাল পর্যন্ত বৃটিশ আইনে স্বামীর অধিকার ছিলো স্ত্রীকে বিক্রি করার। অন্যদিকে ফরাসী বিপ্লবের পরও নারীর অধিকার ও মর্যাদা রক্ষা করার কথা সেখানকার চিন্তানায়কদের মাথায় আসেনি। ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত ফরাসী নাগরিক আইনে অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া নারীর অধিকার ছিলো না কোন বিষয়ে কোন পক্ষের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার।

বৌদ্ধ ধর্মে

বৌদ্ধ ধর্মে নারীকে সকল পাপের জন্য দায়ী করা হ'ত। এ সম্পর্কে ঐতিহাসিক ওয়েষ্টমার্ক বলেন, Woman are of all the snares which the tempter has spread for man, the most dangerous; in woman are embodied all the powers of infatuation which blinded the mind of the world. অর্থাৎ 'মানুষের জন্য প্রলোভনের যতগুলি ফাঁদ বিস্তার করে রেখেছে, তন্মধ্যে নারীই সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক। নারীর মধ্যে সকল মোহিনী শক্তি অঙ্গীভূত হয়ে আছে, যা সমস্ত বিশ্বের মনকে অন্ধ করে দেয়'।

হিন্দুসমাজে

হিন্দুসমাজে নারীর অবস্থা ছিলো সবচে' করুণ। নারীদেরকে বলী দেওয়া হ'ত। অতীব হীন ও নীচু স্তরের প্রাণী মনে করা হ'ত। হিন্দুস্তানের হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের 'মনু সংহিতা'য় পিতা, স্বামী কিংবা দু'জনের মৃত্যুর পর পুত্রহীন নারীর স্বতন্ত্র-ব্যক্তিগত কোনো অধিকার বলতে কিছুই ছিল না। আর পিতা, স্বামী ও পুত্র; এই তিনজন মারা গেলে তাকে তার স্বামীর কোনো এক পুরুষ-আত্মীয়ের তত্ত্বাবধানে থাকা আবশ্যক ছিল। সে কোনো অবস্থাতেই তার নিজের ব্যাপারে স্বাধীন ছিল না। জীবিকার ক্ষেত্রে তার অধিকার-বঞ্চনার চাইতেও বেশি নির্মম ছিল স্বামীর

বিয়োগপরবর্তী জীবনে বেঁচে থাকার অধিকারের সামাজিক অস্বীকৃতি। সমাজ মনে করত স্বামীর মৃত্যুর পর তার আর বেঁচে থাকার অধিকার নেই। যার ফলে স্বামীর মৃত্যুর দিন 'সতীদাহ'ই (স্বামীর চিতায় পুড়ে মরা) ছিল এমন নারীর অবধারিত নিয়তি। এই প্রাচীন রীতি ব্রাহ্মণ্য সভ্যতার সেই আদিকাল থেকে সতেরো শতক পর্যন্ত বহাল ছিল। এরপর বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠনের আপত্তির মুখে এর বিলুপ্তি ঘটে।

আরব জাহিলিয়াতের সমাজে

আরব জাহিলিয়াতের সমাজেও আছে নারীর প্রতি নিষ্ঠুরতা ও নির্মমতার মর্মন্তুদ ইতিহাস। শুধু এইটুকু উল্লেখ করাই যথেষ্ট যে, কন্যাসন্তানের জন্মকে তখন মনে করা হতো চরম কলঙ্কের বিষয়।

জাহেলি সমাজের একটি চিত্র বর্ণিত হয়েছে আল কুরআনে এভাবে -

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ، يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

(আর যখন তাদের কাউকে কন্যাসন্তান জন্মের সংবাদ দেয়া হতো তখন দুশ্চিন্তায় তার মুখ কালো হয়ে যেতো, আর বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে থাকতো। ঐ জঘন্য খবরের কারণে মানুষের কাছ থেকে সে মুখ লুকিয়ে ফিরতো। (আর দিশেহারা হয়ে ভাবতো যে কী করবে সে?) লাঞ্ছনা সহ্য করে তাকে রেখে দেবে, না মাটিতে পুতে ফেলবে। কত মন্দ ছিলো তাদের এ মনোভাব!
(সূরা নাহল : ৫৮, ৫৯)

সেখানে নারীর জন্মগ্রহণই ছিলো অপরাধ, আর বেঁচে থাকা ছিলো আরো বড় অপরাধ। তাই অধিকাংশ সময় জন্মদাতা পিতা কন্যাসন্তানকে মায়ের বুক থেকে ছিনিয়ে নিতো এবং নিজের হাতে জ্যান্ত দাফন করে ফেলতো। অসহায় মায়ের বাধা দেয়ার কোন অধিকার ছিলো না। তাই কন্যাসন্তান জন্ম দেয়ার আশঙ্কায় মা ভুলে যেতো তার প্রসববেদনা। অস্থির পেরেশান হয়ে শুধু ভাবতো পিতার নিষ্ঠুরতা থেকে কীভাবে সে বাঁচাবে তার সন্তানকে? কোথায় কীভাবে লুকাবে সে তার কলিজার টুকরোকে?

কুরআনে অত্যন্ত আবেদনপূর্ণ ভাষায় এই নিষ্ঠুর প্রথার নিন্দা করে বলা হয়েছে-

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ ۙ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ

আর যখন জ্যান্ত দাফনকৃত কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, কোন অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিলো (তখন কী জবাব দেবে তোমরা?)
(সূরা আত-তাকভীর : ৮ ও ৯)

এই ছিলো ইসলামের পূর্বে বিশ্বের বিভিন্ন ধর্ম, সমাজ ও সভ্যতায় নারীদের অবস্থা ও মর্যাদাগত অবস্থান। এককথায় বলা যায়, মানুষ হিসাবে নারীর কোন মর্যাদাই ছিলো না। চরম লাঞ্ছনা ও যিল্লতি ছাড়া তার ভাগ্যে আর কিছুই ছিলো না।

বর্তমান যুগে নারীদের অবস্থা

আজ আধুনিকতার স্লোগানে উজ্জীবিত এ বিশ্ব। অগ্রসরমান বিশ্বে নারী এগিয়ে গেছে অনেক দূর। পাশ্চাত্যবাদীরা নারী স্বাধীনতার নামে নারীদেরকে আজ ঘরছাড়া করেছে। ইসলাম নারীদেরকে মর্যাদার যে উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করেছিল, পাশ্চাত্যবাদীরা তা ক্ষুণ্ণ করে নারীদের আবার অনাচার আর দুষ্কর্মের শৃংখলে বন্দী করে ফেলেছে।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যব্যাপী ইসলামের শত্রুগণের পক্ষ থেকে বিগত যুগে মুসলিম নারীরা ঐ নগ্ন হামলার শিকার হয়েছে এবং মুসলিম সন্তানদের কেউ কেউ সেই প্রয়াসকে গলধঃকরণ করেছে; ফলে তারা ঐ কলমসমূহ যা লিখেছে, তা-ই আওড়াতে থাকে এবং ঐ আওয়াজসমূহের প্রতিধ্বনি-ই করতে থাকে, যাতে নারী তার আপন গৃহ থেকে বেরিয়ে যায়, সে পুরুষের সাথে অবাধে মেলামেশা করতে পারে এবং তাকে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য থেকে এবং তার শিশু সন্তানদের যত্ন নেয়ার দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দিতে পারে। ঐ আওয়াজসমূহ মুসলিম নারীকে নিয়ে চিৎকার করে বলে: "তুমি যে অবস্থানে রয়েছো, তা ভেঙ্গে চুরমার করে দাও; তোমার চতুর্পাশে বিস্তৃত পর্দাসমূহ ছিঁড়ে ফেল; আমাদের দিকে বের হয়ে আস, যাতে তুমি আলো দেখতে পাও, যে আলো থেকে তুমি আড়ালে ছিলে যুগ যুগ ধরে। পুরুষের কর্তৃত্ব থেকে স্বাধীনতা অর্জন কর, মর্যাদার শর্তসমূহ থেকে মুক্তি লাভ কর, তোমার পর্দা খুলে ফেলে দিয়ে বের হয়ে আস, ঘর থেকে বের হয়ে আসার মাধ্যমে তোমার অস্তিত্ব ও কণ্ঠস্বরের প্রমাণ দাও, জীবনের প্রতিটি লোভনীয় বস্তু থেকে তোমার অংশটুকু গ্রহণ করার মাধ্যমে তুমি নিজেকে উপভোগ কর, তোমার স্বাধীন রুচি ব্যতীত অন্য কিছু যাতে তোমাকে শাসন না করে এবং বই

পুস্তকের প্রচ্ছদ পৃষ্ঠায় তোমার যাদুকরী কোমলতা ছাপিয়ে, সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা ও রূপ-সৌন্দর্য প্রদর্শনীর মাধ্যমে তুমি ব্যবসা চালিয়ে যাও!
এ যুগ হচ্ছে উপভোগের যুগ! আগে অবশ্য মান-মর্যাদা রক্ষার যুগ ছিল, এখন সেটা তো শেষ হয়ে গেছে, এ যুগ তো নতুন অনেক কিছু করেছে, সুতরাং তুমি চমৎকার কিছু কর!"

পশ্চিমা বিশ্ব সমস্ত পৃথিবীব্যাপী ফ্রিডম বা স্বাধীনতার এ ধ্যান-ধারণাকে জোরের সাথে প্রচার করলেও, প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতার মিথ্যা স্লোগানে জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে পশ্চিমের নারীরা হয়েছে এক অভিনব দাসত্বের শিকার। তাদের ইলেক্ট্রনিক আর প্রিন্ট মিডিয়াতে আধুনিকা নারীদের দেখলে মনে হয় জীবনের সবক্ষেত্রেই তারা প্রচণ্ড রকম স্বাধীন। স্বাধীন সমাজে তাদের ভূমিকা নির্ধারণের ক্ষেত্রে, স্বাধীন পোশাক পরিধানের ক্ষেত্রে কিংবা স্বাধীন পুরুষের সাথে সম্পর্ক তৈরির ক্ষেত্রে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, কেবল সেটুকু স্বাধীনতাই তাদের আছে, যেটুকু সুযোগসন্ধানী পুরুষদের চাহিদা মেটানোর জন্য প্রয়োজন। সমাজের নির্দেশ মানতে গিয়ে তারা নিজেকে পরিণত করে সস্তা বিনোদনের পাত্রে। আর মুক্ত-স্বাধীন হওয়ার জন্য বাধ্যতামূলকভাবে কাঁধে তুলে নেয় জীবিকা উপার্জনের মতো কঠিন দায়িত্ব, ইসলাম যা থেকে নারীদেরকে রেহাই দিয়েছে।

বস্তুত, আজকের বিশ্বসভ্যতাকে নিয়ন্ত্রণ করছে 'পুঁজিবাদ'। যার মূলভিত্তিই হচ্ছে, 'স্বার্থসিদ্ধি'। মুক্ত সমাজ, মুক্ত মানুষ, মুক্ত অর্থনীতি ইত্যাদি পশ্চিমা পুঁজিবাদী জীবনদর্শনের মূলমন্ত্র হলেও, মুক্ত সমাজের মুক্ত জীবনের ধারণা নারীকে মুক্তি তো দেয়ইনি বরং বহুগুণে বেড়েছে তাদের উপর অত্যাচার আর নির্যাতনের ধরন ও পরিমাণ। বস্তুত, ফ্রিডম বা স্বাধীনতার ধারণা পশ্চিমা সমাজের মানুষকে ঠেলে দিয়েছে সীমাহীন স্বেচ্ছাচারী ও দায়িত্বজ্ঞানহীন এক জীবনের দিকে। যেখানে স্বাধীনতার অপব্যবহারে নির্যাতিত হচ্ছে নারীসহ সমাজের অগণিত মানুষ। জবাবদিহিতার অনুপস্থিতির সুযোগে একজনের স্বাধীনতা হয়ে দাঁড়াচ্ছে অন্যজনের দাসত্বের কারণ। এই লাগাম ছাড়া ব্যক্তি-স্বাধীনতার চূড়ান্ত অপপ্রয়োগে তাদের সমাজে জ্যামিতিক হারে বাড়ছে খুন, ধর্ষণ, যৌন হয়রানি ও পারিবারিক সহিংসতাসহ সকল প্রকার নারী নির্যাতন।

পুঁজিবাদী সমাজ নারীকে দেখে স্রেফ ভোগ্যপণ্য ও মুনাফা হাসিলের উপকরণ হিসেবে। উপযোগিতা ফুরিয়ে গেলেই ছুঁড়ে ফেলে দেয় পরিত্যক্ত টিস্যু পেপারের মতো। ফলে, সমাজের কোনো সম্মানিত সদস্য হিসেবে বিবেচিত না হয়ে নারী নিজের অজ্ঞাতেই পরিণত হয়েছে সমাজে প্রচলিত অন্যান্য পণ্যের মতোই বিকিকিনির পণ্যে। আর এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে বড় বড় মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানিগুলো নারীর দৈহিক সৌন্দর্যকে পুঁজি করে চালিয়ে যাচ্ছে জমজমাট ব্যবসা। ফ্যাশন, ডায়েট আর কসমেটিকস ইন্ডাস্ট্রিগুলোই নির্ধারণ করে দিচ্ছে নারীর

পোশাক, তার সাজ-সজ্জা, এমনকি তার দেহের প্রতিটি অঙ্গের মাপ। স্বাধীনতার মিথ্যা স্লোগানে নারীকে তারা বাধ্য করছে জঘন্যভাবে দেহ প্রদর্শন করতে। তারপর, অর্ধনগ্ন সেসব নারীদেহকে কেন্দ্র করে গড়ে তোলা হচ্ছে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের ব্যবসা।

পাশ্চাত্য নারী প্রগতিবাদ আন্দোলন বিশ্বের নৈতিক অবক্ষয়কে আরো ত্বরান্বিত করেছে। ফলশ্রুতিতে-

১. অশ্লীলতার ব্যাপক প্রসার ঘটেছে।
২. অবাধ যৌনাচার স্বাভাবিক হয়ে পড়েছে। এক পুরুষ বহু নারীর সাথে এবং এক নারী বহু পুরুষের সাথে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তুলছে।
৩. সমকামিতা ও দুরারোগ্য ব্যাধি সিফিলিস, এইডস মহামারি রূপ ধারণ করেছে।
৪. বিশ্ব সুন্দরী প্রতিযোগিতা, ফ্যাশন শো, বিজ্ঞাপন, মডেলিং ও চিত্রশিল্পে নারীর শরীর প্রদর্শনের মহড়া চলছে।
৫. সেক্স ক্লাব এবং পতিতালয়গুলো নারী-পুরুষের যৌন উন্মাদনা চরিতার্থের সুযোগ করে দিচ্ছে।
৬. বিবাহ সম্পর্কে অনীহা এবং বিচ্ছেদ ও পরিবার ভাঙন আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে।
৭. স্কুলগুলোতে নিয়মিত যৌন শিক্ষা ও শিশু ভ্রূণহত্যার প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে
৮. কুমারী মাতৃত্বের কোনো হিসাব নেই।
৯. বৃদ্ধ বয়সে নারীর কোনো মূল্যায়ন থাকছে না।
১০. নারীর ওপর অফিস, আদালত, কলকারখানা ও মাঠে-ময়দানে পুরুষের মতো কাজের বোঝা অর্পিত হয়েছে।

ইসলামে নারীর অধিকার ও মর্যাদা

নারীর অধিকার ও মর্যাদা রক্ষায় ইসলাম যে ভূমিকা রেখেছে, ইসলামের আগে পৃথিবীর বুকে কোনো ধর্ম বা সভ্যতা এভাবে নারীর অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি! মৌলিক মানবিক অধিকারের ক্ষেত্রে এবং দ্বীন ও ধর্মের যাবতীয় কর্মের ক্ষেত্রে ইসলাম নারীকে পুরুষের সমমর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে। পুরুষের থেকে নারীকে ভিন্ন ভাবে দেখেননি। বরং যুগ যুগ ধরে অবহেলিত ও উপেক্ষিত নারী সমাজকে পুরুষের সমমর্যাদা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তার চেয়ে অধিক মর্যাদা দান করেছেন।

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

'স্ত্রীদেরও পুরুষদের উপর ন্যায় সঙ্গত অধিকার রয়েছে। আর নারীদের উপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে'
(বাক্বারাহ ২২৮)

হাদিস শরীফে ইরশাদ হয়েছে-

من كانت له أنثى فلم يئدها ولم يهنها و لم يؤثر ولده الذكور عليها أدخله الله الجنة

যে ব্যক্তি কন্যসন্তানকে জ্যান্ত দাফন করবে না এবং তার অমর্যাদা করবে না এবং পুত্রসন্তানকে তার উপর অগ্রাধিকার দেবে না আল্লাহ তাকে জান্নাতে দাখেল করবেন।
(সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ৫১০৩)

দ্বীন ও ধর্মের যাবতীয় কর্মে নারী ও পুরুষের সমমর্যাদা সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে-

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ

যে মন্দ কর্ম করে, সে কেবল তার অনুরূপ প্রতিফল পাবে, আর যে, পুরুষ অথবা নারী মুমিন অবস্থায় সৎকর্ম করে তারাই জান্নাতে প্রবেশ করবে। তথায় তাদেরকে বে-হিসাব রিযিক দেয়া হবে।

(সূরা মু'মিন:৪০)

ইসলাম বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর যে অধিকার ও মর্যাদা প্রদান করেছে সেগুলো নিম্নে আলোচনা করা হল-

বিবাহের মাধ্যমে নারীকে অধিকার ও মর্যাদা দান :

ইসলাম নারীকে বিবাহের মত সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা ও অধিকার প্রদান করেছে। জাহিলী যুগে বৈবাহিক ক্ষেত্রে নারীদের কোনরূপ অধিকার ছিল না। তারা শুধু পুরুষের ভোগের সামগ্রী ছিল। ইসলাম এহেন ঘৃণিত প্রথার মূলোৎপাটন করতঃ নারী ও পুরুষের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের নির্দেশ দিয়েছে।

এ মর্মে আল্লাহ তা‘আলা এরশাদ করেন,

فَانْكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُوْلُوا-ْ

‘তবে যেসব নারী তোমাদের পসন্দ হয়, তাদের মধ্য থেকে দুই দুই, তিন তিন, চার চার জনকে বিবাহ কর। কিন্তু তোমাদের মনে যদি আশংকা জাগে যে, তোমরা তাদের সাথে ইনসাফ করতে পারবে না। তাহ’লে একজন স্ত্রী গ্রহণ কর অথবা তোমাদের দাসীদেরকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ কর। অবিচার হ’তে বাঁচার জন্য এটাই অধিক সঠিক কাজ’।
(নিসা: আয়াত ৩)

স্বামী নির্বাচনের স্বাধীনতায় নারীকে অধিকার ও মর্যাদা দান :

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে নারীদের পসন্দমত স্বামী গ্রহণের কোন অধিকার ছিল না। যখন-তখন তাদেরকে পাত্রস্থ করা হ’ত। কিন্তু ইসলাম নারীকে স্বামী নির্বাচনের স্বাধীনতা দিয়েছে। যে কেউ ইচ্ছা করলে বলপূর্বক কোন নারীর স্বামী হ’তে পারবে না।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

فَلاَ تَعْضُلُوْهُنَّ أَن يَنْكِحْنَ َ

হে পুরুষরা! তোমরা মহিলাদেরকে (স্বীয় স্বামী নির্বাচন করে) বিয়ে করাতে বাধা প্রদান করো না’
(বাক্বারাহ ২৩২)।

হাদীছে এরশাদ হয়েছে,

عِنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ َ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنُ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ-َ

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘স্বামীহীনা নারীর বিবাহ তার অনুমতি ব্যতীত দেওয়া যাবে না। কুমারীর বিবাহ তার সম্মতি ব্যতীত দেওয়া চলবে না। তারা (উপস্থিত ছাহাবায়ে কেরাম) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! কুমারীর সম্মতি কিরূপে (নেওয়া যাবে)? উত্তরে তিনি বললেন, তার নীরবতাই সম্মতি’।
(৬৯৭০; মুসলিম ১৬/৮, হাঃ ১৪১৯, আহমাদ ৯৬১১)

স্ত্রী হিসাবে নারীকে অধিকার ও মর্যাদা দান :

ইসলাম পারিবারিক জীবনে নারীকে দিয়েছে তার ন্যায্য অধিকার। সংসার জীবনে নারী-পুরুষ পরস্পরের পরিপূরক। কোন একজনের একক প্রচেষ্টায় সংসার জীবন পূর্ণতা লাভ করতে পারে না।

মহান আল্লাহ এরশাদ করেন,

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُن َّ

‘তারা তোমাদের পোশাক এবং তোমরা তাদের পোশাক’

(সূরা বাক্বারাহ: আয়াত ১৮৭)।

কুরআন শরীফে আল্লাহ তা'আলার আদেশ-

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرۡهًاۖ وَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ لِتَذۡهَبُواْ بِبَعۡضِ مَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَـٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِن كَرِهۡتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـًٔا وَيَجۡعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيۡرًا كَثِيرًا

হে মুমিনগণ, তোমাদের জন্য হালাল নয় যে, তোমরা জোর করে নারীদের ওয়ারিছ হবে। আর তোমরা তাদেরকে আবদ্ধ করে রেখো না, তাদেরকে যা দিয়েছ তা থেকে তোমরা কিছু নিয়ে নেয়ার জন্য, তবে যদি তারা প্রকাশ্য অশ্লীলতায় লিপ্ত হয়। আর তোমরা স্ত্রীলোকদের সঙ্গে বসবাস করো সদাচারের সাথে। আর যদি (কোন কারণে) তোমরা তাদেরকে অপছন্দ করো তাহলে হতে পারে যে, তোমরা এমন কোন কিছুকে অপছন্দ করলে, আর আল্লাহ তাতে প্রচুর কল্যাণ রেখে দিলেন।

(সূরা নিসা : আয়াত ১৯)

এ বিষয়টি হাদীস শরীফে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে বলেছেন,

لاَ يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ

'কোন মুমিন পুরুষ কোন মুমিন নারীকে যেন সম্পূর্ণ অপছন্দ না করে। কারণ তার একটি স্বভাব অপছন্দ হলে, আরেকটি স্বভাব অবশ্যই পছন্দনীয় হবে।

(সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১৪৬৯; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস : ১৯৭৯)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

عَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي وَإِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوهُ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. والدارمي

'আয়িশাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সর্বোত্তম যে স্বীয় পরিবারের নিকট উত্তম। আর আমি আমার পরিবারের নিকট সর্বোত্তম। আর যখন তোমাদের যে কেউ মারা যায়, তখন তার (নিন্দা করা) হতে বিরত থাক।

(সহীহ : তিরমিযী ৩৮৯৫)

শুধু তাই নয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বৈবাহিক জীবনে বাস্তব দৃষ্টান্ত পেশ করে পুরুষদের শিক্ষা দিয়েছেন যে, স্ত্রীর সম্মান ও অধিকার কিভাবে প্রদান করতে হবে।

মোহর দানের মাধ্যমে নারীর অধিকার ও মর্যাদা :

ইসলাম নারীর মর্যাদার স্বীকৃতি স্বরূপ বিবাহের ক্ষেত্রে মোহর প্রদান অপরিহার্য করে দিয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

'তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে মোহর দিয়ে দাও সন্তুষ্টির সাথে'
(নিসা ৪)।

মা হিসাবে নারীকে অধিকার ও মর্যাদা দান :

ইসলাম ও তার নবীর কাছে মায়ের যে মর্যাদা তা পৃথিবীর কোন ধর্ম ও সভ্যতা এমনকি আধুনিক সভ্যতাও কল্পনা করতে পারেনি। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ

'আর আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদাচারের আদেশ করেছি। (কারণ) তার মা তাকে কষ্টের সঙ্গে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্টের সঙ্গে প্রসব করেছে।' (সূরা আহকাফ : ১৫)

এখানে পিতা-মাতা উভয়ের সঙ্গে সদাচার কেন করতে হবে তার কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে পিতার কোন অবদানের কথা বলা হয়নি, শুধু মায়ের ত্যাগ ও কষ্টের কথা বলা হয়েছে। অথচ পিতারও বিরাট অবদান রয়েছে সন্তানের জীবনে। এটা এদিকেই ইঙ্গিত করে যে, মাতার ত্যাগ ও কষ্টের তুলনায় পিতার ত্যাগ ও কষ্ট খুবই সামান্য।

হাদীস শরীফে এসেছে,

قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِي قَالَ " أُمُّكَ ". قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ " أُمُّكَ ". قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ " أُمُّكَ ". قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ " ثُمَّ أَبُوكَ ". وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ مِثْلَهُ

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার সদাচারের বেশী হকদার কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সাহাবী বললেন, এর পর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সাহাবী বললেন, এর পর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সাহাবী বললেন, এর পর কে? তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এর পর তোমার বাবা।
(সহীহ বুখারী, হাদীস : ৫৯৭১)

শুধু এই হাদীছই নয়, বরং অন্য এক হাদীছে বর্ণিত আছে, এক সাহাবী আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি জিহাদে গমন করতে চাই। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কি মা আছেন? সাহাবী বললেন, আছেন। তখন তিনি বললেন, যাও তার কাছে বসে থাকো, কেননা জান্নাত তার পায়েরই কাছে।
(মুসনাদে আহমদ ৩/৪২৯)

অন্য বর্ণনায় আছে, ‘জান্নাত হলো মায়েদের কদমের নীচে।’ (মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস : ৭৩৩০)

কন্যা ও ভগ্নি হিসাবে নারীর অধিকার ও মর্যাদা

কন্যা সন্তান আল্লাহ তাআলার নিআমত। কন্যার লালনপালন জান্নাতে যাওয়ার মাধ্যম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কন্যা সন্তানের লালনপালনের যে পরিমাণ ফযীলতের কথা বলেছেন, পুত্র সন্তান লালনপালনের ক্ষেত্রে সে পরিমাণ বলেননি।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

لاَ يَكُونُ لأَحَدِكُمْ ثَلاَثُ بَنَاتٍ أَوْ ثَلاَثُ أَخَوَاتٍ فَيُحْسِنُ إِلَيْهِنّ إِلاَّ دَخَلَ الجَنّة .ِ

যে ব্যক্তির তিনটি কন্যা সন্তান বা তিনজন বোন আছে। আর সে তাদের সাথে উত্তম আচরণ করেছে তাদেরকে নিজের জন্য অসম্মানের কারণ মনে করেনি সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে।
(জামে তিরমিযী, হাদীস ১৯১২)

অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন-

مَنْ كَانَ لَهُ ثَلاَثُ بَنَاتٍ أَوْ ثَلاَثُ أَخَوَاتٍ أَوْ ابْنَتَانِ أَوْ أُخْتَانِ فَأَحْسَنَ صُحْبَتَهُنَّ وَاتَّقَى اللهَ فِيهِنَّ فَلَهُ الجَنَّة ُ

যে ব্যক্তির তিনটি কন্যা সন্তান বা তিনজন বোন আছে অথবা দু'জন কন্যা সন্তান বা বোন আছে। সে তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করেছে এবং তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলাকে ভয় করেছে। তার জন্য রয়েছে জান্নাত।
(জামে তিরমিযী, হাদীস ১৯১৬)

কন্যা সন্তান জাহান্নাম থেকে মুক্তির উপায় হযরত আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ ابْتُلِيَ بِشَيْءٍ مِنَ البَنَاتِ فَصَبَرَ عَلَيْهِنّ كُنّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النّار .ِ

যে ব্যক্তিকে কন্যা সন্তান লালনপালনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এবং সে ধৈর্যের সাথে তা সম্পাদন করেছে সেই কন্যা সন্তান তার জন্য জাহান্নাম থেকে আড় হবে।
(জামে তিরমিযী, হাদীস ১৯১৩)

জান্নাতে প্রবেশ করার মাধ্যমও হল কন্যা সন্তানের লালনপালন করা। আবার জাহান্নাম থেকেও মুক্তি মিলবে কন্যা সন্তানের উত্তমরূপে প্রতিপালন করার দ্বারা।

এর চেয়ে বড় আরেকটি ফযীলত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।
হযরত আনাস রাযিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ دَخَلْتُ أَنَا وَهُوَ الجَنّةَ كَهَاتَيْنِ، وَأَشَارَ بِإِصْبَعَيْهِ

যে ব্যক্তি দুইজন কন্যা সন্তানকে লালনপালন ও দেখাশুনা করল [বিয়ের সময় হলে ভাল পাত্রের কাছে বিবাহ দিল] সে এবং আমি জান্নাতে এরূপ একসাথে প্রবেশ করব যেরূপ এ দুটি আঙুল। তিনি নিজের দুই আঙুল মিলিয়ে দেখালেন।
(জামে তিরমিযী, হাদীস ১৯১৪)

কন্যা সন্তান প্রতিপালনের তিনটি ফযীলত সকল ফযীলতের সারমর্ম হল তিনটি জিনিস। এক. আল্লাহ তাআলা জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিবেন। দুই. জান্নাত দান করবেন। যা নিআমত ও আরাম আয়েশের স্থান। তিন. আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গী হওয়ার সৌভাগ্য দান করবেন। যা সফলতার সর্বোচ্চ চূড়া। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ তিনটি ফযীলত বর্ণনা করেছেন কন্যা সন্তান লালনপালনকারীদের জন্য
এ ফযীলতের কথা পুত্র সন্তানের বেলায় বলা হয়নি। বরং কন্যা সন্তানের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে।

এক হাদীছে আছে-

لا تكرهوا البنات, فإنهن المؤنسات الغاليات

তোমরা মেয়েদের অপছন্দ করো না। কারণ তারা অন্তরঙ্গতা পোষণকারী মূল্যবান সম্পদ।
(মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ১৭৩০৬)

ইসলামে নারীর শিক্ষার অধিকার

ইসলামের পূর্বে অন্যান্য ধর্ম ও সভ্যতা যেখানে নারীর শিক্ষার কোন অধিকারই স্বীকার করেনি। এমনকি আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতায়ও এই সেদিন পর্যন্ত যেখানে নারীশিক্ষাকে ঘৃণার চোখে দেখা হতো সেখানে ইসলাম সেই প্রথম দিন থেকে নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য শিক্ষার সমান অধিকার ঘোষণা করেছে।

ইসলামে নারীর ভরণপোষণের অধিকার

ইসলাম নারীসমাজের প্রতি অনেক বড় একটি ইহসান এই করেছে যে, পরিবারের জীবিকা ও যাবতীয় অর্থনৈতিক দায়দায়িত্ব থেকে তাকে সম্পূর্ণরূপে অব্যাহতি দান করেছে এবং তা পুরুষের কাঁধে অর্পণ করেছে। এটা কন্যা হিসাবে, স্ত্রী হিসাবে এবং সন্তানের মা হিসাবে বাবার কাছে, স্বামীর কাছে এবং সন্তানের পিতার কাছে নারীর অধিকার ও প্রাপ্য।

ইসলামে নারীর অর্থনৈতিক অধিকার

ইসলাম নারীসমাজের উপর আরো যে ইহসান করেছে তা এই যে, তাকে তার নিজস্ব পরিমন্ডলে সম্পদ উপার্জনের এবং সঞ্চয়ের অধিকার দান করেছে। মীরাছ ও মোহররূপে যে সম্পদ সে লাভ করবে, নিজের শ্রম দ্বারা যে সম্পদ সে উপার্জন করবে সেগুলোর উপর তার পূর্ণ অধিকার ইসলাম নিশ্চিত করেছে। নারী যতই সম্পদশালী হোক, তার ভরণপোষণের দায়িত্ব পুরুষের, নারীর নিজের নয়।

মোটকথা, ইসলাম নারীর প্রতি সকল প্রকার অত্যাচার, অবিচার নিষিদ্ধ ঘোষণা করতঃ নারীকে সর্বক্ষেত্রে অধিকার ও মর্যাদা প্রদান করেছে।

সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে ইসলামে নারীর ভূমিকা সম্পর্কে জানার গুরুত্ব

পাশ্চাত্যবাদীরা পারিবারিক বন্ধনকে ভেঙ্গে নারীদেরকে নিজেদের অর্থ উপার্জনের মাধ্যম হিসাবে গড়ে তুলছে। আমেরিকা ও ইউরোপীয় দেশগুলোতে এমনকি আমাদের দেশেও ৮৫% নারী ধনতন্ত্রবাদের সেবায় নিজেদের বিলিয়ে দেয়।

পাশ্চাত্য সভ্যতা আজ নারীদেরকে অপরের ইচ্ছার পুতুল বানিয়ে তাদেরকে বাজারের পণ্য ও ফ্যাশনের প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করছে এবং খদ্দেরদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য নারীদের বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করছে। যেমন- নারীদের নগ্ন ও অশ্লীল ছবি, নারী বিষয়ক নানান অশ্লীল গল্প, কবিতা, উপন্যাস, অশ্লীল সিনেমা ইন্টারনেট সহ বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছে।

অথচ নারীদের প্রতি আল্লাহ তাআলার হুকুম হলো:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۖ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করবে-মূর্খতা যুগের অনুরূপ নিজেদেরকে প্রদর্শন করবে না। নামায কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে। হে নবী পরিবারের সদস্যবর্গ। আল্লাহ কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পূর্ণরূপে পূত-পবিত্র রাখতে।
(সূরা আহযাব: আয়াত ৩৩)

ফলে যুব সমাজ এমনকি বৃদ্ধদেরও মানষিক বিকৃতি ঘটছে। এভাবে পাশ্চাত্য সভ্যতা নারীদেরকে তাদের উন্নত মর্যাদার আসন থেকে টেনে নীচে নামিয়ে আনছে। অল্প কথায়, নারীর মর্যাদা দানের পরিবর্তে নারী জাতির প্রতি দিন দিন অমর্যাদা ও অবমাননাই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

পাশ্চাত্যসভ্যতার কর্ণধারগণ আজ পরিষ্কার বুঝতে পারছেন যে, তাদের সমাজ ও সভ্যতার অবক্ষয়ের মূল কারণ কী এবং তা থেকে উত্তরণের উপায় কী? কিন্তু অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে এবং পরিবার-ব্যবস্থা ভেঙ্গে গিয়ে সমাজ ও সভ্যতার দেহে পচন ধরা শুরু হয়ে গেছে। এখন আর ফিরে আসার কোন উপায় নেই।

আল্লামা ইকবাল সত্যই বলেছেন,

ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزر گاہوں کا
اپنے افکار کی دنیا میں سفر کرنہ سکا

পশ্চিমারা আজ বিভিন্ন নক্ষত্রের কক্ষপথে বিচরণ করছে অথচ তাদের আসল চিন্তার দুনিয়াতে কোনো সফরই করতে পারল না।

অন্যদিকে মুসলিম সভ্যতায় পারিবারিক ব্যবস্থা এখনো সম্পূর্ণ অটুট। সুতরাং দুই সভ্যতার সঙ্ঘাতে ইসলামী সভ্যতার বিজয় এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী, যদি না মুসলিম পারিবারিক ব্যবস্থাকেও গুঁড়িয়ে দেয়া যায়। এজন্যই পাশ্চত্যের চিন্তানায়কগণ তথাকথিত নারী-স্বাধীনতার নামে তাদের সমাজদেহের পচনব্যাধি আমাদের সমাজেও ছড়িয়ে দিতে উঠে পড়ে লেগেছে।

আর আধুনিক নারী সমাজ দ্বীন, ঈমান, আমল ও আখলাক সর্ম্পকে সম্পূর্ণ উদাসীন। আমরা আমাদের আত্মপরিচয় হারিয়ে পথে বসেছি।
প্রকৃতপক্ষে, কোনো জাতি যখন নিজের ইতিহাসকে ভুলে গিয়ে অন্ধ অনুকরণের মাধ্যমে অন্য জাতির আদর্শ গ্রহণ করে, তখনই তার পতন অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। বর্তমান মুসলিম মহিলাদের অবস্থাও হয়েছে ঠিক তাই। ফলে পাশ্চাত্যের মতো মুসলিম সমাজেও অশান্তির আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে।

কী অবক্ষয় এসেছে আজি
কর্ণধার সব হারিয়েছে পুঁজি
অনুভূতিহীন অন্তর তার
দুঃখ নেই হোক না ক্ষতি।

আমাদের দেশের জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশী লোক আজ বস্তুবাদী চিন্তায় আচ্ছন্ন। ভোগবাদের বৃত্তে আবদ্ধ আমাদের প্রজন্ম। নারীরা যখন দ্বীনি বিষয়ে সচেতন ছিলেন, যখন নারীরা ভাবতেন তারাই জাতির রূপকার তখন পৃথিবীর দিকে দিকে ইসলাম বিজয়ী হয়েছিলো। সচেতন, দ্বীনদার, ঈমানদার নারীদের ওই সময়গুলোকে আজও বলা হয় ইসলামের স্বর্ণযুগ।

আর আজ যখন নারীরা তাদের দায়িত্বের প্রতি উদাসীন হয়ে পড়েছেন তখন পৃথিবীর পথে পথে মুসলমানেরা লাঞ্ছিত-বঞ্চিত হচ্ছে, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে নেমে এসেছে অমানিশার ঘোর আঁধার।

বর্তমানের কঠিন পরিস্থিতিতে মুসলিম নারীদের উপর পাশ্চাত্য সভ্যতার এই নগ্ন হামলার বিরুদ্ধে প্রয়োজন জোটবদ্ধ পরিশ্রম বা চেষ্টা- সাধনা, যাতে মুসলিম নারী তার বিরুদ্ধে প্রণীত পরিকল্পনাকে পরিপূর্ণ মনোযোগের সাথে বুঝতে পারে। অতঃপর সে পর্যবেক্ষণ করবে এবং তার পথ সে সচেতন দৃষ্টিতে গ্রহণ করতে সক্ষম হবে।
এরই পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিম নারীদের সামনে তুলে ধরা জরুরি ইসলামের মহীয়সী নারীদের গৌরবোজ্জ্বল জীবনালেখ্য, বিশেষত ইসলামের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা। কেননা, মানুষজন এটা জেনে চমকে যায় যে, ইসলামি অনুশাসনের ভেতরে জীবনধারণ করেও একজন নারী চিন্তাবিদও হতে পারেন। সেই চিরাচর্চার জগতে নেতৃত্বের আসনে আসীন হতে পারেন। ইসলামের আদেশ-নিষেধের ব্যাপারে অর্জন করতে পারেন সুদ্ধ জ্ঞান। আবার সেই বিষয়ে মতামতও প্রকাশ করতে পারেন। কারণ, ইসলাম এ কথা বলে না যে, নারীরা জীবন ও সমাজের সব দিক থেকে বিমুখ হয়ে ঘরের চার দেয়ালে বন্দি হয়ে থাকবে বরং ইসলাম নারীদেরকে দিয়েছে প্রকৃত মর্যাদা ও অধিকার, দিয়েছে ইহ-পরকালীন সফলতার নিশ্চিত গ্যারান্টি।
আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

যে সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং সে ঈমানদার, পুরুষ হোক কিংবা নারী আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং প্রতিদানে তাদেরকে তাদের উত্তম কাজের কারণে প্রাপ্য পুরষ্কার দেব যা তারা করত।
(সূরা নাহল: আয়াত ৯৭)

তাই প্রগতির স্রোতে ভেসে যাওয়া নারীদের সামনে যদি মুসলিম নারীদের অনস্বীকার্য অবদান পেশ করে বলা হয় যে, এই ছিলো তাদের জীবন আর এই হলো আমাদের জীবন! তাহলে হয়তো তারা ইসলামের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিবেদিতপ্রাণ সংগ্রামী নারীগণের যুগান্তকারী ভূমিকা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞানার্জন করে একদিকে যেমন পাবেন আত্মার খোরাক অপরদিকে পাবেন ইসলামী আদর্শ ও ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা।

ইসলামে নারীর ভূমিকা

ইসলাম নারীদেরকে দিয়েছে বিশেষ মর্যাদা ও সম্মান। সে মর্যাদা এবং সম্মানে ভূষিত হয়ে মহীয়সী নারীগণ ইসলামের এমন কোন ক্ষেত্র নেই যেখানে তাদের জ্ঞান, দৃঢ়তা, সাহসিকতা, উদারতার শুভ্রতা ছড়ায়নি। ইসলামের সোনালী ইতিহাসের যেখানেই সাফল্য বা কৃতিত্ব রয়েছে সেখানেই পুরুষের পাশাপাশি কোনো না কোনো নারীর ভূমিকা অবশ্যই আছে। হাবশার হিজরত অথবা মদীনার হিজরত, পুরুষদের সঙ্গে নারীরাও হিজরত করেছেন। বীরত্ব ও সাহসিকতায় যদি খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নাম বলেন তাহলে হজরত খুওয়াইলা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর নামও বলতে হবে। ত্যাগ-তিতিক্ষা, সহযোগিতা আর সহমর্মিতায় যদি হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নাম আসে তাহলে হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর নামও আসবে। নিপীড়ন-নির্যাতন আর দুঃখ-কষ্ট সহ্যে যদি হজরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নাম আসে তাহলে হজরত জুনাইরিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর নামও আসবে। হাসান-হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুমা যেমন জান্নাতের যুবকদের নেতা তেমনি হজরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহাও জান্নাতের মহিলাদের নেত্রী। ফেকাহ বা আইন শাস্ত্রে আব্দুল্লাহ বিন মাস'উদ রাদিয়াল্লাহু আনহু যেমন ফকীহদের ইমাম তেমনি হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাও বিশিষ্ট ফকীহ বা আইনবেত্তা। ইবাদাত ও সাধনায় হজরত হাসান বসরী (র.)-এর নাম নিলে হজরত রাবিয়া বসরীর (র.)-এর নামও নিতে হবে। মোট কথা ইসলামের ইতিহাস এ কথাই বলে যে, সর্বক্ষেত্রে নারীরা পুরুষদের পাশাপাশি অসাধারণ দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞার স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

ইসলামে নারীদের অগ্রগামিতা

দ্বীনের কিছু কিছু দিক তো এমনও আছে যে, মহিলাগণ পুরুষদের চেয়েও এগিয়ে গেছেন এবং তারা প্রথম স্থান অধিকার করে নিয়েছেন। যেমন-

• ইসলামের ভিত্তি প্রতিষ্ঠায় রয়েছে হাজেরা আলাইহাস সালাতু ওয়াসসালাম-এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

• সর্বপ্রথম ঈমান এনেছেন এবং মুসলিম হয়েছেন হযরত খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু আনহা।

• নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুখ থেকে সর্বপ্রথম কুরআন শরীফ শুনেছেন মহিলা সাহাবী হজরত খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু আনহা।

• দিদারে নবী অর্থাৎ নবুওয়াত প্রাপ্তির পর সর্বপ্রথম নবীর দর্শন লাভ করেন মহিলা সাহাবী হজরত খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু আনহা।

• এই উম্মতের মাঝে সর্বপ্রথম শাহাদাত বরণ করেন মহিলা সাহাবী হজরত সুমাইয়্যা রাদিয়াল্লাহু আনহা।

ইসলামের ভিত্তি প্রতিষ্ঠায় নারীর ভূমিকা

ইসলামের যে বিশ্বজনীন ব্যবস্থা তার ভিত নির্মিত হয়েছে একজন নারীর অবদানের উপর। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম ও হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম কা'বা নির্মাণ করেছেন। আল্লাহ তাআলা এর পটভূমি তৈরি করেছিলেন হাজেরা আলাইহাস সালাতু ওয়াসসালাম-কে দিয়ে। সেখান থেকে উৎসারিত হয়েছে যমযম কূপ। বায়তুল্লাহর আবাদী সেখান থেকেই শুরু।

দুনিয়াতে যে কোনো জিনিসের আবাদীতে নারীদের ছোঁয়া আছে। দুনিয়াতে একটি ঘর আবাদ করতে নারীদের প্রয়োজন। চাই সে মা হোক, স্ত্রী হোক, বোন হোক। তাদের মাধ্যমেই ঘর আবাদ থাকে। তদ্রূপ আল্লাহর হুকুম ও দ্বীন প্রতিষ্ঠায় নারীদের ভূমিকা ও সহায়তা রয়েছে শুরু থেকেই।

মক্কা মুকাররমায় কত মানুষ তওয়াফ করছে, কত ইবাদত হচ্ছে কিন্তু গোড়াতে এর আবাদীতে আল্লাহ যাদের শ্রম ও কুরবানী নিয়েছেন তাদের অন্যতম হলেন, একজন নারী। তিনি হলেন হাজেরা আলাইহাস সালাতু ওয়াসসালাম। এই যে সাফা-মারওয়ার মাঝে দৌড়াতে হয়, এ দৌড়

মা হাজেরা আলাইহাস সালাতু ওয়াসসালাম-এরই স্মৃতি বহন করে। তাঁর এই দৌড় ছিল সন্তানের পানির জন্য, এতদসত্বেও এই দৌড়ও আল্লাহর জন্যই। কারণ তাদের মক্কায় অবস্থানই ছিল আল্লাহর হুকুমে ও আল্লাহর জন্য। হাদীসে এই ঘটনা সবিস্তারে এসেছে।

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে, ইসমাঈল আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম তখন দুগ্ধপোষ্য শিশু ছিলেন। ইবরাহীম আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম আল্লাহ তাআলার আদেশ অনুযায়ী তাঁকে ও তাঁর জননী হাজেরা আলাইহাস সালাতু ওয়াসসালামকে বর্তমান কা'বাগৃহ ও যমযম কূপের অদূরে রেখে দিলেন।

তখন এ স্থানটি পাহাড় বেষ্টিত জনশূন্য প্রান্তর ছিল। দূর-দূরান্ত পর্যন্ত পানি ও জনবসতির কোন চিহ্ন ছিল না। ইবরাহীম আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম তাঁদের জন্য একটি পাত্রে কিছু খাদ্য এবং মশকে পানি রেখে দিলেন।

এরপর ইবরাহীম আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম সিরিয়া প্রত্যাবর্তনের আদেশ পান। যে জায়গায় আদেশটি লাভ করেন, সেখান থেকেই আদেশ পালন করত রওয়ানা হয়ে যান। কিন্তু আল্লাহর আদেশ পালনে তিনি এতটুকু বিলম্ব করাও সমীচীন মনে করেন নি যে, হাজেরা আলাইহাস সালাতু ওয়াসসালামকে সংবাদ দেবেন এবং কিছু সান্ত্বনার বাক্য বলে যাবেন।

ফলে হযরত হাজেরা আলাইহাস সালাতু ওয়াসসালাম যখন তাঁকে যেতে দেখলেন, তখন বারবার ডেকে বললেন, আপনি আমাদেরকে কোথায় ছেড়ে যাচ্ছেন ? এখানে না আছে কোন মানুষ এবং না আছে জীবনধারণের কোন উপকরণ।
কিন্তু হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম পেছনে ফিরে দেখলেন না। সম্ভবত তিনি আল্লাহ্ তা'আলারই আদেশ পেয়েছেন। তাই পুনরায় ডেকে জিজ্ঞেস করলেনঃ আল্লাহ্ কি আপনাকে এখান থেকে চলে যাওয়ার আদেশ দিয়েছেন?

তখন ইবরাহীম আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম পিছনে তাকিয়ে উত্তর দিলেন, হাঁ, এটা আল্লাহর হুকুম।

তখন হাজেরা আলাইহাস সালাতু ওয়াসসালাম বলেছিলেন,

إذا لا يضيعنا

'তাহলে আল্লাহ আমাদের ধ্বংস করবেন না।'

ছোট্ট একটি কথা। কিন্তু ঈমান কোন স্তরের হলে, কত মজবুত আস্থা এবং বিশ্বাস থাকলে জনমানবহীন মরভূমিতে একটি দুগ্ধপোষ্য শিশুকে নিয়ে একজন নারী এ কথা বলতে পারেন। এঁরাই আমাদের আদর্শ মা। আদর্শ নারী।

তিনি যে বললেন, আল্লাহ আমাদের ধ্বংস করবেন না। বিষয়টি তাহলে কী? ধ্বংসের সমস্ত উপকরণ এখানে মজুদ! এখানে জনবসতির কোনো চিহ্ন নেই! রাতে কোনো হায়েনা বা বিষাক্ত প্রাণী দংশন করতে পারে। দিনের বেলায় সূর্য উদিত হলে মরুভূমির তাপ থেকে রক্ষার কোনোই উপায় নেই! তাহলে দেখা যাচ্ছে বাহ্যত ধ্বংসের সকল ব্যবস্থা এখানে বিদ্যমান! কিন্তু হাজেরা আলাইহাস সালাতু ওয়াসসালাম বললেন—

إذا لا يضيعنا

'তাহলে আল্লাহ আমাদের ধ্বংস করবেন না'

এটা আল্লাহর হুকুম হলে আমাদের ধ্বংস বা ক্ষতি হবে না। আল্লাহর হুকুমের ভেতরে আবাদি আছে, জীবন আছে, স্থায়িত্ব আছে।

আমরা তো এখন জনবসতিতে থেকে আল্লাহর হুকুম মানছি। তাঁরা এমন সময় আল্লাহর হুকুম মেনেছেন যখন হুকুম পালন করতে গিয়ে তাঁরা সামনে মৃত্যু দেখেছেন। হাজেরা আলাইহাস সালাতু ওয়াসসালাম এমন সময় আল্লাহ তাআলার হুকুম মেনেছেন, যখন মরুভূমির ভেতরে জীবন ধারণের কোনো উপকরণ ছিল না।

জনমানবহীন খাদ্য ও পানীয় শুন্য একটি মরুভূমিতে স্ত্রী ও দুগ্ধপোষ্য সন্তানকে রেখে আসা ইব্রাহীম আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম-এর জন্য যতখানি অসহনীয় ছিল তার চেয়েও বিস্ময়কর ছিল হযরত হাজেরা আলাইহাস সালাতু ওয়াসসালাম- এর এমন নির্বাসিত জীবন মেনে নেয়া। অথচ আল্লাহর আদেশ বলে তারা হাসিমুখে বরণ করে নেন যাবতীয় মানসিক ও দৈহিক কষ্ট।

একটি থলিতে রাখা খেজুর ও মশকের পানি ফুরিয়ে গেলে কোলের যাদুর প্রাণ নাশের আশংকায় হযরত হাজেরা আলাইহাস সালাতু ওয়াসসালাম অস্থির হয়ে যান। পানির সন্ধান পাবেন আশায় একবার সাফা পাহাড়ের উপর উঠেন, আবার মারওয়া পাহাড়ের দিকে দৌঁড়ে যান। মনে হয় পানি সাফা পাহাড়ের উপর টলমল করছে। আবার দৌঁড়ে সাফা পাহাড়ে গিয়ে নিরাশ হন। মনে হচ্ছে পানি মারওয়া পাহাড়ে ঝিলমিল করছে। আসলে মরুভূমির প্রখর রোদে

মরিচিকার মায়াজালকে পানির অথৈ তরঙ্গ বলে ভ্রম হচ্ছিল। এভাবে হাজেরা আলাইহাস সালাতু ওয়াসসালাম সাত বার দুই পাহাড়ের মাঝখানে দৌঁড়ান।

শেষবারে লক্ষ করেন, শিশুকে যেখানে রেখে পানির জন্য ছুটাছুটি করছেন সেখানে ইসমাঈল আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম-এর পায়ের নিচ থেকে পানির ঝর্ণা উৎসারিত হচ্ছে। হাজেরা আলাইহাস সালাতু ওয়াসসালাম তাড়াতাড়ি সেই ঝর্ণার চারপাশে আল তুলে দেন। এই ঝর্ণাই বর্তমান যমযম কূপ। সেই কূপকে কেন্দ্র করে মক্কায় জুরহুম সম্প্রদায়ের বসতি গড়ে উঠে। কাবাঘর নির্মিত হয়। হজের প্রবর্তন হয়।

তখন থেকে যত নবী রাসূল দুনিয়াতে এসেছেন, যত আলেম ওলী এসেছেন, কিয়ামত পর্যন্ত আসবেন, প্রতি বছর লাখ লাখ হাজি হজ করেন, সারা বছর ওমরা করেন, তাদের সবাইকে মহিয়সী নারী বিবি হাজেরা আলাইহাস সালাতু ওয়াসসালাম- এর অনুকরণ করতে হয়। তিনি যেভাবে দৌঁড়িয়েছেন সেভাবে সাফা মারওয়ায় সায়ী করতে হয়। তারপর মা হাজেরার স্মৃতিধন্য যমযমের পানি পান করে আমরা প্রাণ জুড়াই।

আল্লাহ তাআলা এই বংশ থেকে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করলেন। যেই স্থানে আল্লাহ তাআলার আহকাম পালিত হল ঐ স্থানের কত আবাদী! কত ইবাদত, কত যিন্দেগী, কত ক্ষমা ওখানে রয়েছে! কত মানুষের জান্নাত ওখানে রয়েছে! ইসলামের ভিত্তি প্রতিষ্ঠায় নারীদের ভূমিকার এর চেয়ে বড় উদাহরণ আর কী হতে পারে!

ইসলামে নারীরা যেসব ক্ষেত্রে প্রথম

নম্রতা, ভদ্রতা এবং হৃদয়ের কোমলতা একজন ভালো মানুষের অনন্য গুণ। এর মাধ্যমেই ব্যক্তি ভালো কথা, উপদেশ ও শিক্ষার আলোকে খুব সহজে হৃদয়ে ধারণ করতে পারে। ফুলের সামান্য স্পর্শ বা নির্মল বাতাসের সামান্য ছোঁয়ায় তার অন্তর্জগতে দোলা লাগে। অপরদিকে কঠিন হৃদয় হয়ে থাকে সুদৃঢ় বৃক্ষের মতো; প্রবল ঝঞ্ঝাবায়ুও যাকে হেলাতে পারে না। সেই আলোকচ্ছটা স্বচ্ছ আয়নাকে খুব সহজেই ভেদ করে; কিন্তু পাথরকে ধারালো তিরও ভেদ করতে পারে না।

মানুষের অবস্থাও ঠিক এমন। নরম স্বভাব ও কোমল হৃদয়ের মানুষগুলো খুব সহজেই হকের দাওয়াত কবুল করতে পারেন; অপরদিকে কঠিন হৃদয়ের মানুষগুলোর হৃদয়ে অবাক করা মুজিজাও কোনো প্রভাব ফেলে না। এর উদাহরণ রয়েছে সর্বত্র। সব যুগে। সব মানুষের ইতিহাসে। কিন্তু ইসলামের ইতিহাসে এর দৃষ্টান্ত বিপুল।

ইসলামের সূচনাকালে এমন বহু কাফির ছিল যাদেরকে বহু প্রচেষ্টা করেও আল্লাহ তাআলার সামনে নত করানো যায়নি। বারবার ঈমানের দিকে আহ্বান করার পরও তাদের কোনো সাড়া মিলেনি। তাদের অন্তর এতটাই কঠিন ছিল যে, সেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হৃদয় বিগলিত বাণীও কোনো প্রভাব ফেলেনি। পক্ষান্তরে সাহাবিগণ কুরআনের একটি আয়াত শুনেই ইসলাম গ্রহণের জন্য পাগলপ্রায় হয়ে গিয়েছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উত্তম চরিত্র মাধুর্য, সুকোমল স্বভাব-প্রকৃতি, তার হৃদয়-গলানো উপদেশ, বাহ্যিক সৌন্দর্য, আকার-আকৃতি, ইসলামের সঠিক শিক্ষা-দীক্ষা-সহ প্রতিটি প্রভাবক ও মুগ্ধকর বিষয়কে তাঁরা সাদরে গ্রহণ করেছেন। তাঁদের অন্তর বিমুগ্ধ ও বিস্মিত হয়েছে। ফলে বেশ সহজেই তাঁরা ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। প্রবেশ করেছেন সত্য ও সুন্দরের শাশ্বত ঠিকানায়।
পুরুষ সাহাবিদের মতো নারী সাহাবিগণও সমানতালে এই ফজিলতে শরিক ছিলেন। ক্ষেত্রবিশেষে তাঁরা ছিলেন অগ্রগামী।

প্রথম ইসলাম গ্রহণকারিণী

খাদিজা বিনতু খুয়াইলিদ রাদিয়াল্লাহু আনহা সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছেন। এর জন্য তাঁকে কোনো জোর-জবরদস্তি কিংবা হুমকি-ধামকি দিতে হয়নি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুয়ত- প্রাপ্তির পর ঘরে এসে প্রিয়তমা স্ত্রী খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে সর্বপ্রথম ঈমানের দাওয়াত দেন। খুশিমনে, বিনাবাক্যে তিনি কালিমা পড়ে ইসলাম কবুল করে নেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র স্ত্রীগণের মধ্যে খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর স্থান সর্বোচ্চ। তিনি তাঁর প্রথম স্ত্রী। চল্লিশ বছর বয়সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে তার বিয়ে হয়। তার জীবদ্দশায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর কোনো বিয়ে করেননি। ইব্রাহীম ছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সব সন্তানই তার গর্ভজাত। খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর সর্বপ্রথম ঈমান আনেন।
ড. মু. হুসাইন হায়কল ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করেছেন, যখন সূরা মুদ্দাসসির নাযিল হলো, তখন খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'জিবরাঈল আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম আল্লাহ তাআলার নির্দেশ নিয়ে এসেছিলেন। মানুষকে তাঁর ইবাদত করার আহ্বান জানানোর জন্য তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনিই একমাত্র ইবাদতের যোগ্য। কিন্তু খাদিজা, আমি কীভাবে এই আহ্বান জানাবো? কে আমার এই আহ্বানে সাড়া দেবে?' এ কথা শুনে খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সান্তনা দান করে বললেন, আপনি অটল থাকুন। 'আমি বিশ্বাস করি যে, আপনি আল্লাহর রাসূল। '

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুয়্যতের প্রতি খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা ছিল একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। কারণ দীর্ঘ দশ বছর থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণী হিসেবে জীবনযাপন করেছেন। এই দীর্ঘ সময় রাসূলুল্লাহর সাহচর্যে থেকে খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর নিকট এ সত্য প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল যে, সততা, আমানতদারিতা, তাকওয়া ও ন্যায়নিষ্ঠতার মতো গুণাবলি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মধ্যে পুরোপুরি রয়েছে। তিনি অধিকাংশ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে গভীর চিন্তা ও ধ্যানে নিমগ্ন দেখতে পেয়েছেন। তার এ কথা জানা ছিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চিন্তা-গবেষণার পরম লক্ষ্য ছিল সত্যের সন্ধান। তিনি পৌত্তলিক তথা বাতিল ধ্যানধারণাকে বিন্দুমাত্রও গুরুত্ব প্রদান করেন

না। হিরা গুহা থেকে প্রত্যাবর্তন ও অহীর সূচনা লগ্নে খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা এ বিষয়টি পুরোপুরি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন।

এক পর্যায়ে খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা ফেরেশতাকে দেখার আগ্রহ প্রকাশ করেন। একবার ফেরেশতা আসলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা-কে প্রথমে বামদিকে, এরপর ডানদিকে এবং সর্বশেষ সামনে বসিয়ে রাখেন। এই তিন অবস্থায়ই ফেরেশতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট অবস্থান করেন। খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর মনে প্রগাঢ় বিশ্বাস জন্ম নেয় যে, যিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে অহী নিয়ে আসেন, তিনি ফেরেশতা; শয়তান নন।

আল-কুরআনে আল্লাহ পাক ইবরাহীম আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম-এর দাওয়াতের পদ্ধতি বর্ণনা করে বলেছেন-

قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِين
'বলো আমার নামায, আমার ইবাদতের সব অনুষ্ঠান, আমার জীবন-মৃত্যু সবকিছুই আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য, যার কোনো শরীক নেই। এরই নির্দেশ আমাকে দেওয়া হয়েছে এবং সবার আগে আমিই আনুগত্যের শির নতকারী।'
(সূরা আনআম: আয়াত ১৬৩)

আল কুরআনের এ আয়াতেরই পরিপূর্ণ প্রতিফলন ঘটেছিল খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা- এর জীবনে। সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনীত রিসালাতকে সর্বপ্রথম গ্রহণ করার সৌভাগ্য তিনি অর্জন করেন।

ইবনুল আছীর বলেন-

خَدِيجَةُ أَوَّلُ خَلْقِ اللهِ أَسْلَمَ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ، لَمْ يَتَقَدَّمْهَا رَجُلٌ وَلَا امْرَأَةٌ

'এ ব্যাপারে মুসলিম উম্মার ইজমা হয়েছে যে, খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা আল্লাহর সৃষ্টি জগতের মধ্যে সর্বপ্রথম মুসলমান হয়েছেন। তার পূর্বে কোনো পুরুষ বা নারী ইসলাম গ্রহণ করেননি।'

যুহরী, কাতাদা, মূসা ইবন উকবা, ইবন ইসহাক, আল ওয়াকিদী ও সাঈদ ইবন ইয়াহইয়া বলেছেন-

أَوَّلُ مَنْ آمَنَ بِالله وَرَسُولِهِ : خَدِيجَةُ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم

'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর সর্বপ্রথম ঈমান আনেন খাদিজা, আবু বকর ও আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)।'

হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ سَابِقَةُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ إِلَى الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

'আল্লাহ ও মুহাম্মদের ওপর ঈমান আনার ব্যাপারে খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা বিশ্বের সকল নারীর অগ্রবর্তিনী। (আল-হাকীম, আল-মুসতাদরাক আলাস-সহীহাঈন, কিতাব। মারিফাতুস সাহাবাতি, বাব: খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ, হাদীস নং: ৪৮৪৬)

প্রথম সালাত আদায়কারিণী

নামায ফরজ হওয়ার হুকুম যখন নাযিল হয়নি, তখন থেকেই খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা ঘরের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে নামায আদায় করতেন। ইবন ইসহাক উল্লেখ করেছেন, একদিন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু দেখতে পেলেন, তারা দুজন অর্থাৎ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা নামায আদায় করছেন। খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা তখন নতুন দ্বীনের দাওয়াত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে পেশ করলেন এবং এ কথা কাউকে বলতে নিষেধ করলেন। এ বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায়, উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যে সর্বপ্রথম খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে নামায আদায়ের গৌরব অর্জন করেন।

আফিফ আল-কিন্দি নামক এক ব্যক্তি কিছু কেনাকাটার জন্য মক্কায় এসেছিলেন। একদিন সকালে লক্ষ করলেন, এক যুবক কাবার কাছে এসে আসমানের দিকে তাকালো। তারপর কিবলামুখী হয়ে দাঁড়ালো। একজন কিশোর এসে তার পাশে দাঁড়িয়ে গেল। তারপর এলো এক মহিলা। সেও তাদের দুজনের পিছনে দাঁড়ালো। তারা নামায শেষ করে চলে গেল। দৃশ্যটি আফিফ আল-কিন্দি দেখলেন। আব্বাসকে তিনি বললেন, 'বড় রকমের কোনো একটা কিছু

ঘটতে যাচ্ছে।' আব্বাস বললেন, 'হ্যাঁ।' তিনি আরো বললেন, 'এ নওজোয়ান আমার ভাতিজা মুহাম্মদ। কিশোরটি আমার আরেক ভাতিজা আলী এবং মহিলাটি মুহাম্মদের স্ত্রী। আমার জানা মতে দুনিয়ায় তারা তিনজনই মাত্র এই নতুন ধর্মের অনুসারী। '

তারিখু ইবনু খুমাইস গ্রন্থে রাফি রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "সোমবার দিন আমি নবুয়ত প্রাপ্ত হয়েছি। খাদিজা সেদিনই বিকেলে আমার সঙ্গে সালাত আদায় করেছে। তার পরদিন মঙ্গলবার সালাত আদায় করেছে আলি। তার পরদিন যাইদ ইবনু হারিসা ও আবূ বকর আমাদের সঙ্গে সালাতে শরিক হয়েছে।"

ইসলামের প্রথম শহীদ

আম্মার বিন ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মাতা সুমাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রিসালাতে আস্থা স্থাপন করে মুসলমানদের সংখ্যা সাতে উন্নীত করেন। ইমাম আহমাদ ও ইবন মাজাহ বর্ণনা করেছেন, আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, সর্বপ্রথম যারা ইসলামের ঘোষণা দান করেন, তারা হলেন সাতজন। খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা, আবু বকর, আম্মার, আম্মারের মা সুমাইয়া, সুহাইব, বিলাল ও আল মিকদাদ (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)।

আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে তার চাচার দ্বারা, আবু বকরকে তার গোত্রের দ্বারা নিরাপত্তা বিধান করেন। আর অন্যদের কাফেররা লোহার বর্ম পরিয়ে প্রচণ্ড রোদে দাঁড় করিয়ে রাখত।

সুমাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা সত্যের দুশমনদের হাতের প্রথম শিকার। স্বামী ইয়াসির পুত্র আম্মারকে সঙ্গে নিয়ে এককালের কৃতদাসী সুমাইয়া ইসলাম কবুল করেছিলেন। এ তো কম স্পর্ধা নয়। সারা আরব যাকে শত্রুজ্ঞান করে প্রায় এক ঘরে করে রেখেছে, তার দলেই তিনি স্বামী-পুত্র নিয়ে যোগদান করলেন। শুরু হলো নির্যাতন ইয়াসির পরিবারের ওপর। নির্যাতন ভোগ করে স্বামী ইয়াসির মৃত্যুবরণ করেন। কিন্তু তাতেও তিনি বিন্দুমাত্র দমিত হলেন না। তাকে তপ্ত বালুর ওপর শুইয়ে রাখা হতো। মাথার ওপর প্রদীপ্ত সূর্য এবং নিচে তপ্ত বালু রাশির মধ্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেত। সন্ধ্যাবেলা তাকে ঘরে ফিরিয়ে আনা হতো। নতুন আদর্শে বিশ্বাস স্থাপন করার বিষয়টি আরো চিন্তা-ভাবনা করে দেখার জন্য রাতের বেলা তাকে ফুরসত দেওয়া হতো। পরদিন তার কাছে এসে তাদের আশা ভঙ্গ হতো। ক্রোধে ফেটে পড়ত

অবিশ্বাসীদের দল। কষ্টের মাত্রা আরো বাড়িয়ে দিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নির্যাতন দেখে খুব কষ্ট পেতেন।

জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একদিন মুশরিকরা যখন আম্মার ও তার পরিবারবর্গকে শাস্তি দিচ্ছিল, তখন সেই পথ দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথাও যাচ্ছিলেন। তিনি তাদের অবস্থা দেখে বলেন, 'হে ইয়াসিরের পরিবার-পরিজন! তোমাদের জন্য সুসংবাদ। তোমাদের জন্য রয়েছে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি।'

আবদুল্লাহ ইবন জাফর বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সেই অবস্থায় দেখে বলেন, 'হে ইয়াসিরের পরিবারবর্গ! ধৈর্য ধরো। হে ইয়াসিরের পরিবারবর্গ! ধৈর্য ধরো। তোমাদের জন্য জান্নাত নির্ধারিত রয়েছে।' উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একদিন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে আল-বাতহা উপত্যকায় হাঁটছিলাম। তখন দেখতে পেলাম, আম্মার ও তার পিতা-মাতার ওপর উত্তপ্ত রোদে নির্যাতন চালানো হচ্ছে। আম্মারের পিতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দেখে বলে ওঠেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! কালচক্র এরকম?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'হে ইয়াসিরের পরিবার-পরিজন! ধৈর্য ধরো। হে আল্লাহ, ইয়াসিরের পরিবারবর্গকে ক্ষমা করুন।'

সারাদিন শাস্তি ভোগ করার পর সন্ধ্যায় তারা মুক্তি পেতেন। শাস্তি ভোগ করে সুমাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা প্রতিদিনের মতো একদিন সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরলেন। পাষণ্ড আবু জাহেল তাকে অশালীন ভাষায় গালি দিতে থাকে। এক পর্যায়ে তার পশুত্বের মাত্রা সীমা ছাড়িয়ে যায়। সে সুমাইয়ার দিকে বর্ষা ছুড়ে মারে এবং সেটি তার যৌনাঙ্গে গিয়ে বিদ্ধ হয় এবং তাতেই তিনি শাহাদাত বরণ করেন।

মায়ের এমন অসহায় মৃত্যুবরণে ছেলে আম্মারের দুঃখের অন্ত ছিল না। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম । এখন তো যুলুম-অত্যাচার মাত্রাছাড়া রূপ নিয়েছে।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ধৈর্যধারণ করার উপদেশ দিলেন। তারপর বললেন-
'হে আল্লাহ। তুমি ইয়াসির পরিবারের কাউকে জাহান্নামের আগুনে শাস্তি দিও না।'

সুমাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর শাহাদাতের ঘটনাটি হিজরতের পূর্বের। এ কারণে তিনিই হলেন ইসলামের প্রথম শহীদ। মুজাহিদ (রহ) বলেন, 'ইসলামের প্রথম শহীদ হলেন, আম্মার

রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মা সুমাইয়া।' বদর যুদ্ধে আবু জাহেল নিহত হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আম্মারকে বললেন, 'আল্লাহ তোমার মায়ের ঘাতককে হত্যা করেছেন।' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিশ্বস্ত কর্মী সুমাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা ইসলামী সমাজের গোড়াপত্তনের সংগ্রামে যেভাবে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন, তার দৃষ্টান্ত দুনিয়ায় বিরল।

আদর্শ ইসলামিক পরিবার গঠনে নারীর ভূমিকা

একটি পরিবার গড়ে ওঠে নারী ও পুরুষের যৌথ প্রচেষ্টায়। তবে বলা যায় সংসারের প্রাণ হিসেবে বিরাজ করে নারী। এখানে আদর্শ পরিবার গঠনে মুসলিম নারীর কয়েকটি ভূমিকার দিক তুলে ধরা হলো।

পরিবারক আগলে রাখে

পরিবারকে আগলে রাখার ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সব ধরনের পরিস্থিতে তারা পরিবারকে আগলে রাখে, পরিবারের মানুষদের অনুপ্রেরণা জোগায়। নিজে না খেয়ে পরিবারের অন্য সদস্যদের মুখে খাবার তুলে দেয়। অসুস্থ শরীর নিয়েই স্বামী-সন্তানের সেবায় নিয়োজিত থাকে। একটা নারী প্রতিদিন স্বামী-সন্তান ও নিজের সতীত্ব রক্ষার জন্য লড়াই করে যায়। তাদের এই ত্যাগ বিফলে যাওয়ার নয়। মহান আল্লাহ তাদের উত্তম পুরস্কারে পুরস্কৃত করবেন।

একবার আসমা বিনতে ইয়াজিদ (রা.) এক আনসারি নারী সাহাবি নবীজির দরবারে এসে বলেন, হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, পুরুষরা যখন জিহাদে বের হয় আমরা তখন তাদের পরিবার, অর্থ-সম্পদ এবং সন্তানদের দেখাশোনার দায়িত্বে ব্যস্ত থাকি, তাহলে আমরা কি এর প্রতিদান পাব? তখন নবীজি সামনে বসা সাহাবিদের উদ্দেশ করে বলেন, দেখেছো দ্বিনি বিষয়ে এই নারী কত চমৎকার প্রশ্ন করেছে! তারপর ওই নারীকে নবীজি বলেন, তোমরা স্বামীর অনুপস্থিতিতে তোমাদের সতীত্ব রক্ষা করবে, স্বামীর সন্তুষ্ট অনুযায়ী চলার চেষ্টা করবে এবং সন্তানদের দেখাশোনা করবে, তাহলে তোমরাও আল্লাহর পক্ষ থেকে এর যথাযথ প্রতিদান পাবে। (শুয়াবুল ঈমান বায়হাকি, হাদিস : ১১/১৭৭)

স্বামীর অনুপ্রেরণা

পুরুষ যখন জীবনসংগ্রামে ক্লান্ত হয় তখন নারীই তাকে পুনরায় শক্তি সঞ্চয়ে সহযোগিতা করে। যেখানে একজন পুরুষ পরিবারের হাল ধরেছে, সেখানে তার পেছনে রয়েছে একজন নারীর প্রেরণা।
তাইতো মহান রাব্বুল আলামিনের ঘোষণা-

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا

‘তিনিই সে সত্তা যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একটি মাত্র সত্তা থেকে, আর তার থেকেই তৈরি করেছেন তার জোড়া। যাতে তার কাছে স্বস্তি পেতে পারে।’ (সুরা আরাফ : ১৮৯)

একজন স্বামীর পরিপূর্ণভাবে দ্বিন পালন করার জন্য একজন পূণ্যবতী স্ত্রী সহায়ক হয়। স্বামীর সুখ-দুঃখে ছায়ার মতো তার পাশে থাকে একজন পূণ্যময়ী নারী। বিপদে তাকে সাহস দেওয়া, সুদিনে আল্লাহর হুকুম পালনে উৎসাহী করা, সৎ কাজে আত্মনিয়োগের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া একজন মুমিন নারীর ভূষণ। আর যদি নারী পুণ্যবতী না হয়, তাহলে সেই স্বামীর জীবনটা নরকে পরিণত হয়। শুধু একটি পরিবারই নয়; বরং একটি সমাজ ধ্বংস করার জন্য একটি নারীই যথেষ্ট।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

‘পার্থিব জগৎটাই হলো ক্ষণিক উপভোগের বস্তু। আর পার্থিব জগতের সর্বোত্তম সম্পদ পুণ্যময়ী নারী।’ (মুসলিম, হাদিস : ১৪৬৭)

গর্ভধারণ

সন্তান গর্ভধারণের মাধ্যমে নারীরা পরিবার তথা সমাজ-সুরক্ষা করে থাকে। কেননা তারা গর্ভধারণ না করলে সমাজ ধীরে ধীরে মানবশূন্য হয়ে বিরান হয়ে যাবে। পশ্চিমাবিশ্বের কিছু দেশের ক্রমহ্রাসমান জন্মহার এর চাক্ষুষ প্রমাণ। তাদের নারীরা সঠিক হারে গর্ভধারণ না করার ফলে তাদের ভবিষ্যৎ আজ মারাত্মক হুমকির মুখে পড়েছে। গর্ভধারণের মাধ্যমে নারীরা এভাবে একটি পরিবার এবং মানবসমাজ সুরক্ষা করে থাকে।

সন্তান প্রতিপালন

জননী হিসেবে একজন নারীকে চরম ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। সন্তানের জন্মদান থেকে শুরু করে বড় করে তোলা পর্যন্ত মা চরম কষ্ট সহ্য করেন যেই কষ্টের সঙ্গে পৃথিবীর কোনো কষ্টের তুলনা হয় না। সন্তানপ্রতিপালনের মাধ্যমেও তারা সুরক্ষা-কর্ম আনজাম দিয়ে থাকে। কেননা সন্তানপ্রতিপালন না করলে ভূমিষ্ঠ সন্তান যে মৃত্যুমুখে পতিত হবে তা বলাইবাহুল্য। যাবতীয় বিপদ ও মৃত্যুর হাত থেকে সুরক্ষার জন্য নারীরা সন্তান প্রতিপালন করে থাকে।

সন্তানের প্রথম পাঠশালা মায়ের কোল

ইসলাম নারীদের সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা দিয়েছে মা হিসেবে। মায়ের ত্যাগ ও ভালোবাসায় একজন সন্তান তার মানবীয় প্রতিভার বিকাশ ঘটান। তা ছাড়া মায়ের ভালোবাসা, আদর-স্নেহে একজন সন্তান বড় হয়ে ওঠে।

আল্লাহকে ডাকতে শেখে। সাধারণত একজন মা-ই সর্বপ্রথম সন্তানকে মহান আল্লাহর বড়ত্ব সম্পর্কে ধারণা দেন। এক কথায় প্রতিটি মানুষ পৃথিবীতে আসা এবং বেড়ে ওঠার পেছনে প্রধান ভূমিকা একমাত্র মায়ের। মায়ের তুলনা অন্য কারো সঙ্গে চলে না। তাই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতদের মায়ের প্রতি যত্নশীল হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

হাদিসে এসেছে,

قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِي قَالَ " أُمُّكَ ". قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ " أُمُّكَ ". قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ " أُمُّكَ ". قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ " ثُمَّ أَبُوكَ ". وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ مِثْلَهُ

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার সদাচারের বেশী হকদার কে? তিনি বললেন, তোমার মা। ছাহাবী বললেন, এর পর

কে? তিনি বললেন, তোমার মা। ছাহাবী বললেন, এর পর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। ছাহাবী বললেন, এর পর কে? তখন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এর পর তোমার বাবা।

(সহীহ বুখারী, হাদীস : ৫৯৭১)

পরিবারব্যবস্থা সুরক্ষিত রাখা

প্রয়োজনে বাইরে বের হওয়া ছাড়া বাকি সময় নারীরা ঘরে অবস্থান করার মাধ্যমে সুরক্ষা-কর্ম আনজাম দিয়ে থাকে। কেননা তারা ঘর ছেড়ে সামাজিক কর্মক্ষেত্রে বের হলে যেমন পরিবারব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়বে তেমনিভাবে নৈতিকভাবেও সমাজ চরম অবক্ষয়ের শিকার হবে। ধ্বংসপ্রাপ্ত গ্রিক, রোমান সভ্যতা এবং অধুনা ধ্বংসপ্রায় পশ্চিমা সভ্যতার পতন-ট্রাজেডি এর সুস্পষ্ট প্রমাণ। নারীরা ঘরে অবস্থান করে মূলত আমাদের সমাজ-সুরক্ষার এ মহৎ কাজ আনজাম দিচ্ছে।

মোট কথা, একজন নারী পরিবারের জন্য যেভাবে নিজেকে উজাড় করে দিয়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তার কোনো বিনিময় পৃথিবীতে নেই।

মহামানব গঠনে নারীর ভূমিকা

ইতিহাস অধ্যয়ন করলে এ কথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, প্রত্যেক সফল মানুষের সাফল্যের নেপথ্যে অবশ্যই কোনো না কোনো নারীর ভূমিকা রয়েছে। মহীয়সী নারীগণ কখনো মা হিসেবে, কখনো বোন হিসেবে, আবার কখনো স্ত্রী বা কন্যা হিসেবে পরম মমতায় এই সমাজ, এই জগৎকে কতো আলোকিত ব্যক্তিত্ব উপহার দিয়েছেন তার হিসেব কে দিতে পারে।

আলোকিত ব্যক্তিত্ব বিনির্মাণ

বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন আলোকিত ব্যক্তিত্ব বিনির্মাণে ক্ষণজন্মা কয়েকজন কীর্তিমান নারীর অসাধারণ ভূমিকার উদাহরণ পেশ করা হলো-

হজরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর ভূমিকা

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পূর্ণাঙ্গ ও সফল জীবনের পিছনে হজরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর অসাধারণ ভূমিকা ইতিহাসের পাতায় সোনালী হরফে খচিত আছে।

বিয়ের পনেরো বছর পর রাসল ৪০ বছর বয়সে নবুয়্যত লাভ করেন। অহী লাভের পর সর্বপ্রথম তিনি বিষয়টি খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা-কে অবহিত করেন। পূর্ব থেকেই খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবী হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন। সহীহ বুখারীর 'ওহীর সূচনা' অধ্যায়ে একটি হাদীসে বিষয়টির বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে।

উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণনাটি এরূপ- তিনি বলেন, প্রথমে যে অহী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসত, তা হলো ঘুমের মধ্যে তার সত্য স্বপ্ন। তিনি যে স্বপ্নই দেখতেন, তা ভোরের আলোর মতো স্পষ্ট হতো। এরপর তার নিকট নির্জন জীবনযাপন ভালো লাগল। তাই তিনি একাধারে কয়েকদিন পর্যন্ত নিজ পরিবারের নিকট না গিয়ে হেরা গুহায় নির্জন পরিবেশে আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন থাকতে লাগলেন। আর এ উদ্দেশ্যে কিছু খাবার তিনি সঙ্গে নিয়ে যেতেন। পরে তিনি বিবি খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর নিকট ফিরে এসে আবার ঐরূপ কয়েকদিনের জন্য কিছু খাবার সঙ্গে নিয়ে যেতেন। এভাবে হেরা গুহায় থাকাকালে তার নিকট সত্য (অহী) এলো। জিবরাঈল আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম সেখানে এসে তাকে বললেন, 'পড়ুন।' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আমি তো পড়তে পারি না।' তিনি বলেন, ফেরেশতা তখন আমাকে ধরে এত জোরে আলিঙ্গন করলেন যে, এতে আমি চরম কষ্ট অনুভব করলাম। এরপর ফেরেশতা আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'পড়ুন।' আমি বললাম, 'আমি পড়তে পারি না।' তখন তিনি দ্বিতীয়বার আমাকে ধরে খুব জোরে আলিঙ্গন করলেন। তাতে আমার অত্যন্ত কষ্টবোধ হলো। এরপর আমাকে তিনি ছেড়ে দিয়ে পড়তে বললেন। আমি বললাম, 'আমি পড়তে পারি না।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ফেরেশতা তৃতীয়বার আমাকে ধরে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করায় আমার ভীষণ কষ্ট হলো। এবার তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন,

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ - خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ - اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ - الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ - عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَم

'পড়ুন আপনার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাটবাঁধা রক্ত থেকে। পড়ুন এবং আপনার রব অতিশয় দয়ালু। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না।'
(সূরা আলাক : ১-৫)

প্রথম ওহী অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মারাত্মকভাবে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ঘরে ফিরে আসেন এবং খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা-কে উদ্দেশ্য করে বলেন-

زملونی زملونی

আমাকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দাও, আমাকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দাও।

খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাই করলেন। তার ভয় চলে গেলে তিনি খাদিজার নিকট সব ঘটনা বর্ণনা করেন।
বুখারী শরীফের বর্ণনা অনুযায়ী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই সময় বলেছিলেন-

خشيت على نفسی

আমি আমার জীবনের ব্যাপারে শংকিত।

এ কথা শুনে হজরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন-

كلا ما يخزيك الله. إنك لتصل الرحم وتحمل الكلي و تكسب المعدوم
وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق

অর্থ: "হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! কখনো নয়। আল্লাহ আপনাকে কখনো ধ্বংস করবেন না। আপনি তো আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখেন। অন্যের বোঝা বহন করেন। অসহায় নিঃস্বদের সহযোগিতা করেন। অতিথিদের আপ্যায়ন করেন। সৎকাজে অপরের সাহায্য করেন। "
হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ! আপনি উত্তম চরিত্রের অধিকারী। আল্লাহ আপনাকে ধ্বংস করবেন না। খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর এ সব সান্ত্বনা আশা ও অভয় বাণী শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশ্বস্ত ও শান্ত হন।

খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাকে সঙ্গে নিয়ে তার চাচাতো ভাই ওরাকা ইবন নওফেল ইবন আসাদ ইবন আবদুল উযযার নিকট গেলেন। ওরাকা জাহেলি যুগে ঈসায়ী ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ইবরানী ভাষায় কিতাব লিখতেন। তাই আল্লাহর ইচ্ছা ও তাওফিক অনুযায়ী তিনি ইনজিলের অনেকাংশ (সুরইয়ানী ভাষা থেকে) ইবরানী ভাষায় রূপান্তরিত

করেন। তিনি বৃদ্ধ ও অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর নিকট থেকে সব কথা শুনে ওরাকা তার ভাতিজার বক্তব্য শুনতে চাইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সব ঘটনা শোনালেন। ওরাকা বললেন, 'এ সেই রহস্যময় জিবরাঈল ফেরেশতা, যাকে মূসা আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম-এর নিকট আল্লাহ প্রেরণ করেন। হায়! আমি যদি তোমার নবুয়্যতের সময় বলবান যুবক থাকতাম। হায়! আমি যদি সে সময় জীবিত থাকতাম, যখন তোমার জাতি তোমাকে মক্কা থেকে বের করে দেবে।'
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওরাকাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তারা কি সত্যিই আমাকে বের করে দেবে?' ওরাকা বললেন, 'হ্যাঁ, তুমি যা নিয়ে (দুনিয়ায়) এসেছ, তদ্রূপ কোনো কিছু নিয়ে যে ব্যক্তিই এসেছে, তার সাথেই শত্রুতা করা হয়েছে। আমি তোমার যুগে বেঁচে থাকলে তোমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করব।'
(বুখারী)

খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ রাদিয়াল্লাহু আনহা সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর ঈমান আনলেন। আল্লাহর কাছ থেকে যে প্রত্যাদেশ তিনি পেলেন, তা সত্য বলে মেনে নিলেন। নবুয়্যতের দায়িত্ব পালনের কাজেও তাঁকে অপরিসীম সহযোগিতা করেছেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর সঙ্গে হজরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা এর বিবাহের পর তিনি তাঁর সমস্ত সহায়-সম্পত্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে উঠিয়ে দেন।
ইসলামের দাওয়াত দিতে গিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফেরদের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে যখন ঘরে আসতেন তখন হজরত খাদিজা রাদিয়ালহু আনহা তাঁকে সান্ত্বনা দিতেন, অভয় দিতেন, আশার বাণী শোনাতেন।
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সফলতার পিছনে স্ত্রী হিসেবে হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর ভূমিকার তুলনা আর কি হতে পারে?

হজরত ফাতেমা বিনতে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর ভূমিকা

হজরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু এই উম্মতের সফল ব্যক্তিদের অন্যতম। তিনি ঈমান ও ঈমানিয়াতের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিলেন।

নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيًّا لَكَانَ عُمَرًا

আমার পরে যদি কোনো নবী আসতেন তাহলে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী হতেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, 'যে পথে উমর চলে শয়তান সে পথ ছেড়ে পালায়।'

৩ বার এ রকম হয়েছে যে, শয়তান হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সামনে এসেছে এবং উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ৩ বারই শয়তানকে মাটিতে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছেন।

আল্লাহ যাকে এতো বড় ঈমানী শক্তি দান করেছিলেন তাঁর ইসলাম গ্রহণের কাহিনীটি বড়ই বিস্ময়কর, হৃদয়বিদারক।

একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে তরবারি হাতে বের হন হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু। পথিমধ্যে এক সাহাবীর সঙ্গে দেখা হয় তাঁর। সাহাবী জিজ্ঞেস করেন কোথায় যাচ্ছো উমর? উমর বললেন, আমি মুসলমানদের নবী মুহাম্মদকে হত্যা করতে যাচ্ছি। সাহাবী উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কথা শুনে বললেন, ঠিক আছে মুহাম্মদকে হত্যা করতে যাচ্ছো; তবে আগে তোমার নিজের ঘরের খোঁজ নাও। তোমার বোন ও ভগ্নিপতি তো ইসলাম গ্রহণ করেছেন। এ কথা শুনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রচন্ড রেগে গেলেন। দ্রুত পায়ে হেঁটে বোনের বাড়ির দরজায় গিয়ে আওয়াজ দিলেন। তখন ঘরের ভিতরে বোন আর ভগ্নিপতিকে অন্য এক সাহাবী কুরআন শরীফ শিক্ষা দিচ্ছিলেন। আওয়াজ শুনে বোনের বুঝতে অসুবিধা হলো না যে, উমর এসেছেন। তাঁরা কুরআন শরীফের যে অংশ পড়ছিলেন তা সরিয়ে ফেললেন। যে সাহাবী কুরআন শিক্ষা দিচ্ছিলেন তিনি ঘরের এক কোণে লুকিয়ে গেলেন।

ভগ্নিপতি দরজা খোলা মাত্র উমর জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা নাকি ইসলাম গ্রহণ করেছো? ভগ্নিপতি বললেন, ইসলাম যদি সত্য ধর্ম হয় তাহলে তা গ্রহণে সমস্যা কোথায়? এ কথা শুনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু রেগে আগুন হয়ে গেলেন। ভগ্নিপতিকে মারধর শুরু করলেন। বোন

বাঁচাতে এলে তাঁর গালে এমন জোরে থাপ্পড় মারলেন যে, বোন সহ্য করতে না পেরে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। তাঁর মুখ থেকে রক্ত এবং চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগলো। তারপরও বোন ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা দাঁড়িয়ে বললেন, উমর! তুমি যে মায়ের দুধ পান করেছো আমিও সেই মায়ের দুধ পান করেছি। তুমি হয়তো আঘাতে আঘাতে আমার দেহ থেকে প্রাণ বের করে ফেলবে কিন্তু আমার অন্তর থেকে ঈমান বের করতে পারবে না। বোনের এ কথা শুনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হৃদয়ে একটু দয়ার সঞ্চার হলো। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞেস করলেন- ফাতেমা! তোমরা কি পড়ছিলে আমাকে একটু শোনাও!! ফাতেমা বললেন, ভাই তোমার শরীর অপবিত্র। শিরকের নাপাকি তোমার অঙ্গে অঙ্গে জড়িত। আল্লাহর কালাম পড়তে হলে তুমি গোসল করে এসো। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু গোসল করে এলেন। ইতোমধ্যে আত্মগোপনকারী ওই সাহাবী যিনি কুরআন শিক্ষা দিচ্ছিলেন তিনি বেরিয়ে এলেন এবং সূরা ত্ব-হা এর প্রথমদিকের আয়াতগুলো পড়তে পড়তে যখন এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন-
إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

অর্থ: আমি আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই। আমার ইবাদত করো এবং আমার স্মরণে নামাজ কায়েম করো। (সূরা ত্বহা: ১৪)

এই আয়াতগুলো শোনার পর তার মনে কেমন এক আবেগময় ঝড় খেলে যায় এবং তিনি ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। বলতে থাকেন তোমরা আমাকে কালেমা পড়াও। ওই সাহাবী বলতে থাকেন আল্লাহু আকবার! আল্লাহু আকবার! আমি রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুখ থেকে শুনেছি, তিনি আপনার জন্য আল্লাহর দরবারে দু'আ করেছেন যে, হে আল্লাহ! উমর ইবনে খাত্তাব বা উমর ইবনে হিশাম তাদের উভয়ের যে কারো দ্বারা ইসলামকে সাহায্য করুন। চলুন! আমি আপনাকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে নিয়ে যাবো। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দারে আরকামে সাহাবীদের নিয়ে বসে আছেন। তারা দারে আরকামে পৌছে দরজায় নক করলেন। ভিতর থেকে কেউ ছিদ্র দিয়ে তাকিয়ে দেখলেন, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তরবারি হাতে দণ্ডায়মান। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বললেন, বাহিরে উমর তরবারি হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। মনে হচ্ছে তার মাঝে কোনো পরিবর্তন এসেছে। তখনই হজরত হামজাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু এগিয়ে এসে বললেন, দরজা খুলে দাও! উমর যদি ইসলাম গ্রহণের জন্য এসে থাকে তাহলে তাকে মোবারকবাদ আর যদি অন্য কোনো উদ্দেশ্যে এসে থাকে তাহলে তার তরবারি দিয়েই তার মাথা ছিন্ন করে রেখে দেবো। তখন এক সাহাবী দরজা খুলে দেন এবং উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ভিতরে এসে বসেন এবং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে উদ্দেশ করে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কালেমা পড়তে এসেছি।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মতো এতো বড় ইসলাম বিদ্বেষীর মুখে এ কথা শুনে সাহাবায়ে কেরাম সমস্বরে আল্লাহু আকবার বলে চিৎকার দিয়ে ওঠেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও খুশি হয়ে বলেন, আল্লাহ আমার দু'আ কবুল করেছেন। এরপর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে চিরদিনের জন্য আপন করে নেন। আত্মার আত্মীয় করে হৃদয়ের মণিকোঠায় স্থান দেন।

হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলাম গ্রহণের আগে মুসলমানগণ দারে আরকামে নামাজ আদায় করতেন। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু মুসলমান হওয়ার পর বললেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমর ইসলাম গ্রহণ করেছে অথচ এখনো আপনি ঘরে নামাজ পড়ছেন। আসুন আমরা মসজিদে গিয়ে নামাজে আদায় করবো। ইসলাম গ্রহণের দিক থেকে চল্লিশতম ব্যক্তি হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু। তাঁর আগে ঊনচল্লিশ নাম্বারে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন হজরত হামজা রাদিয়াল্লাহু আনহু। এই চল্লিশজন সাহাবী নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নেতৃত্বে মসজিদে হারামে হাজির হন। মসজিদে হারামে হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ঘোষণা করেন, হে মক্কার কাফেরগণ! তোমরা যদি তোমাদের স্ত্রীদের বিধবা করতে চাও, তোমাদের সন্তানদের ইয়াতীম বানাতে চাও, তাহলে আজ এসো উমরের মোকাবিলায়।

হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা ইসলামকে সাহায্য করেন এবং মসজিদে নামাজের প্রচলন করে দেন। মুসলিম উম্মাহর আলোকিত ব্যক্তিত্ব বিনির্মাণের পিছনে বোন হিসেবে এক ক্ষণজন্মা মহীয়সী নারীর ভূমিকা ইতিহাসে অমর হয়ে আছে।

হজরত বায়েজিদ বোস্তামী (র.)-এর মায়ের ভূমিকা

হজরত বায়েজিদ বোস্তামী (র.) নকশবন্দী তরীকার এক মহান বুযুর্গ। তাঁর ব্যাপারে হজরত জুনাইদ বাগদাদী (র.) বলেন, ওলী-আওলীয়াদের মাঝে বায়েজিদ বোস্তামী (র.) হলেন ওই পর্যায়ের, জীবরাঈল (আ.) ফেরেশতাদের মাঝে যে পর্যায়ের।

ইতিহাসে আছে বায়েজিদ বোস্তামী (র.) শৈশবে ইয়াতীম হয়ে যান। তাঁর মা তাঁকে মাদরাসায় ভর্তি করে ক্বারী সাহেবকে বললেন, তাকে খুব বেশী বাড়িতে আসতে দিবেন না। বেশী বাড়িতে আসলে তার মন মাদরাসা থেকে ওঠে যেতে পারে। বায়েজিদ একদিন কারী সাহেবকে বললেন, হুজুর! আমার বাড়ি যেতে মন চাচ্ছে। কারী সাহেব অনেক পড়া দিয়ে বললেন, যদি এই পড়া মুখস্থ শোনাতে পারো তাহলে যেতে পারো। বায়েজিদ ছিলেন প্রখর মেধাবী তাই দ্রুত সবক মুখস্থ করে শুনিয়ে দিলেন। উস্তাদের কথামতো ছুটি নিয়ে বায়েজিদ বাড়ির পথে রওয়ানা করলেন। বাড়িতে পৌছে ঘরের দরজায় নক করলেন। তখন তাঁর মা ওজু করছিলেন। আওয়াজ শুনে মা বুঝতে পারলেন বায়েজিদ এসেছে। তিনি চিন্তা করলেন, আজ যদি দরজা খুলে ছেলেকে ঘরে প্রবেশ করতে দেই তাহলে হয়তো তার সব সময় বাড়িতে আসার অভ্যাস হয়ে যাবে এবং লেখা পড়ায় ব্যাঘাত ঘটবে। মা দরজার পাশে এসে বললেন, কে? উত্তর আসলো, বায়েজিদ। মা বললেন আমার এক বায়েজিদ ছিলো আমি তাকে আল্লাহর পথে উৎসর্গ করে দিয়েছি। তুমি কোন বায়েজিদ? মায়ের কথা শুনে বুদ্ধিমান ছেলে বুঝে নিলেন যে, মায়ের ইচ্ছে তিনি যেনো ইলমে দ্বীন অর্জনে মগ্ন থাকেন। বায়েজিদ বোস্তামি (র.) মাদরাসায় ফিরে এলেন এবং একদিন পরিপূর্ণ আলেমে হক্কানী হয়ে মাদরাসা থেকে বের হলেন। সুবহানাল্লাহ! দ্বীনের এতোবড় আলেমে রব্বানী বানানোর পিছনে মহীয়সী এ মায়ের কতো বড় ভূমিকা!

ইমাম গাজালি (র.)-এর মায়ের ভূমিকা

ইমাম মুহাম্মদ গাজালি এবং আহমদ গাজালি (রহমতুল্লাহি আলাইহিমা) ছিলেন দুই সহোদর। শৈশবে বাবা হারিয়ে মায়ের আদরে তাঁরা বেড়ে ওঠেন। তাঁদের শিক্ষা-দীক্ষার হাতেখড়িও মায়ের হাতেই। মায়ের তত্ত্বাবধানেই তাঁরা দু-জন যুগশ্রেষ্ঠ আলেম ও আবেদে পরিণত হন।

ইমাম মুহাম্মদ গাজালি (র.) ছিলেন দর্শনশাস্ত্রের মহাপণ্ডিত। আর অপর ভাই আহমদ গাজালি (র.) ছিলেন, 'সাহেবে কাশফ' (অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন সাধক)। ইমাম মুহাম্মদ গাজালি (র.) মসজিদে নামাজ পড়াতেন কিন্তু তাঁর ভাই আহমদ গাজালি ইমামের পিছনে নামাজ না পড়ে একা একা নামাজ আদায় করে নিতেন। দুই ভাইয়ের মধ্যকার এ ঘটনা ধীরে ধীরে লোক মুখে ছড়িয়ে পড়ে। লোকজন বিরূপ মন্তব্য করছে দেখে ইমাম গাজালি (র.) তাঁর মাকে বললেন, মা! আমি মসজিদের ইমাম ও খতিব। কিন্তু লোকজন আমার ব্যাপারে অভিযোগ করছে, যে ইমামের আপন ভাই তাঁর পিছনে নামাজ পড়েন না তার পিছনে কি অন্য মুসল্লিদের নামাজ হবে? মা কথা শুনে আহমদ গাজালি (র.) কে বললেন, তুমি তোমার ভাইয়ের পিছনে নামাজ আদায় করবে। মায়ের নির্দেশে তিনি মুহাম্মদ গাজালির পিছনে নামাজ আদায় করতে যান। ইমাম গাজালি (র.) নামাজ পড়ানো শুরু করলে আহমদ গাজালি (র.) প্রথম রাকা'আত পড়ার পর দ্বিতীয় রাকা'আতে নামাজ ভেঙ্গে ঘরে চলে আসেন। ভাইয়ের এ আচরণে ইমাম গাজালি (র.) মুসল্লিদের কাছে আরো ছোট হয়ে যান।

ইমাম গাজালি (র.) ঘরে এসে মাকে বললেন, মা ভাইতো আজ আমার নাক কেটে দিয়ে এসেছে। মা আহমদ গাজালিকে ডেকে বললেন, তুমি আমার কথা শুননি কেনো? আহমদ গাজালি (র.) বললেন, মা! আমি আপনার কথায় তাঁর পিছনে নামাজ আদায় করতে গিয়েছিলাম। সে যতোক্ষণ নামাজ পড়াচ্ছিলো ততোক্ষণ আমি তাঁর পিছনে নামাজ পড়ছিলাম কিন্তু সে যখন নামাজ পড়ানোর পরিবর্তে অন্য চিন্তায় মগ্ন হয়ে গেলো তখনই আমি নামাজ ভেঙ্গে চলে এসেছি।

মা গাজালি (র.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি চিন্তা করছিলে? ইমাম গাজালি (র.) কেঁদে কেঁদে বললেন, মা! আমি ক্ষমা চাচ্ছি, আসলে আমার অনেক বড় ভুল হয়ে গেছে। আমি নামাজের আগে নারীদের কিছু মাসআলা-মাসায়িল এবং এ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করছিলাম। যখন নামাজে দাঁড়িয়েছি তখন প্রথম রাকা'আতে আমি আল্লাহর প্রতি ধ্যান রেখে পড়েছি কিন্তু দ্বিতীয় রাকা'আতে নারীদের ওই সব মাসআলা-মাসায়িল আবার আমার মাথায় চলে আসে। তাদের কথা শুনে মা বললেন, আফসোস! তোমরা দুজনের কেউ কোনো

কাজের নয়। মায়ের কথা শুনে দুজন জিজ্ঞেস করলেন, মা আমরা কীভাবে তোমার কাজের হলাম না? মা বললেন, একজন নামাজে দাঁড়িয়ে মাসআলা-মাসায়িল নিয়ে ভাবছো আর আরেকজন পিছনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ইমামের অন্তর দেখছো। তোমাদের কারো মন আল্লাহর দিকে নেই।

এ ছিলো মায়ের দেওয়া শিক্ষা। ফলে তাঁরা একেকজন হয়ে যান যুগের পথিকৃৎ। আমরা এ ঘটনায় ইসলামের সফল দুই মনীষীর সফলতার পিছনে এক মায়ের ভূমিকা দেখতে পাই।

আব্দুল কাদের জিলানী (র.)-এর মায়ের ভূমিকা

'আব্দুল কাদের জিলানী (র.) শৈশবে মাদরাসায় পড়ার জন্য সফর যাচ্ছিলেন। মা তাঁর জামার পকেটে টাকা দিয়ে বললেন, যতো বড় বিপদই আসুক না কেনো তুমি সব সময় সত্য কথা বলবে। রাস্তায় কাফেলার ওপর ডাকাত দল আক্রমণ করে। এক ডাকাত তাঁকে জিজ্ঞেস করে, তোমার কাছে কি কোনো টাকা পয়সা আছে? তিনি সুস্পষ্ট বললেন, হ্যাঁ! আমার কাছে টাকা আছে। ডাকাত জিলানীকে তাঁর সরদারের কাছে নিয়ে যায়। সরদার সব ঘটনা শুনে বিস্মিত হয়ে গেলো। সে ভাবলো এই ছোট্ট বালকের তো জীবনেরও ভয় নেই, নেই সম্পদের ভয়। তাহলে সে সত্য কথা বললো কেনো? ডাকাত সরদার আব্দুল কাদের জিলানী (র.) কে বললো, 'মানুষ ডাকাতের হাতে ধরা পড়লে নিজের জান-মাল রক্ষার চেষ্টা করে, আচ্ছা! তুমি সত্য কথা বললে কেনো?' আব্দুল কাদের জিলানী (র.) বললেন, 'আমি সফরের উদ্দেশে বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় আমার মা আমাকে উপদেশ দেন। বলেন, বাবা! যতই বিপদ আসুক না কেনো সব সময় সত্য কথা বলবে।'
ছোট্ট আব্দুল কাদেরের কথা শুনে ডাকাত সরদার খুব মর্মাহত হলো। সে ভাবে ছোট এই বালক তার মায়ের কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করছে অথচ আমি কালেমা পড়েছি কিন্তু বিন্দুমাত্র আল্লাহর আদেশের তোয়াক্কা করছি না। বালক আব্দুল কাদের (র.)-এর সত্যবাদিতা দেখে ডাকাত দলের সবাই তাওবা করে দ্বীনের পথে ফিরে আসে। এই ছোট বালক বড় হয়ে যুগের ওলী হয়ে যান। যাতে আজ পর্যন্ত সারা দুনিয়ার মানুষ এক নামে চিনে। এ ঘটনাও আমাদেরকে একজন সফল মানুষ গঠনে এক মায়ের ভূমিকার কথা জানান দেয়।

খাজা মঈন উদ্দীন চিশতী আজমিরী (র.)-এর মায়ের ভূমিকা

হজরত খাজা মঈন উদ্দীন চিশতি (র.)-এর হাতে এক দিনে ৭ লক্ষ হিন্দু ইসলাম গ্রহণ করেন ও সত্তর লক্ষ মুসলমান বাইয়াত গ্রহণ করেন। বাইয়াতও কালেমা পড়ানোর পর তিনি ঘরে ফিরলে তাঁর চেহারা আনন্দে ঝলমল করছিলো। মাকে সালাম দিলেন, মা জবাব দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার আজ তোমাকে বড় খুশি মনে হচ্ছে? তিনি বললেন, মা! আল্লাহ আমাকে কতো বড় সৌভাগ্যের অধিকারী করেছেন। আমার হাতে লাখো লাখো মানুষ ইসলাম গ্রহণ করছে। মা ছেলের কথা শুনে বললেন, বাবা! এটাতো তোমার কৃতিত্ব নয়। হজরত খাজা মঈন উদ্দীন চিশতী (র.) বললেন, মা আপনি সত্যি বলেছেন, যদি বিস্তারিত বলতেন। মা বললেন, মঈন উদ্দীন! তুমি শিশু থাকা অবস্থায় আমি কোনো দিন তোমাকে ওজু ছাড়া দুধ পান করাই নি। এটা ওই দুধের বরকত। এ জন্যই আল্লাহ তোমার হাতে লক্ষ লক্ষ মানুষের ইসলাম গ্রহণের তৌফিক দান করছেন।

এ ঘটনাও একজন ওলীয়ে কামেলের সফলতার পিছনে একজন মায়ের ভূমিকার প্রমাণ দেয়।

খাজা কুতুব উদ্দীন বখতিয়ার কাকী (র.)-এর মায়ের ভূমিকা

খাজা কুতুব উদ্দীন বখতিয়ার কাকী (র.) দিল্লির কুতুব মিনারের সন্নিকটেই সমাহিত হয়ে আছেন। তিনি ছিলেন মোঘল সম্রাটদের পীর। সে যুগের সম্রাটগণ যেহেতু তাঁর মুরিদ ছিলেন তাহলে এ কথা স্বাভাবিক যে, সাধারণ নাগরিকগণও তাঁর মুরিদ ছিলেন। তিনি ছিলেন লাখো লাখো মানুষের মুর্শিদ।

ইতিহাসে আছে, তিনি যখন ছোট তখন তাঁর মা-বাবা পরামর্শ করলেন, ছেলেকে উত্তম শিক্ষায় শিক্ষিত করবেন। মা বললেন, আমার কাছে একটি বুদ্ধি আছে। ছেলে আরেকটু বড় হলে সেই বুদ্ধি প্রয়োগ করবো। তিনি বড় হলে মা-বাবা তাকে মাদরাসায় ভর্তি করে দেন। মা ভাবলেন এখন আমার বুদ্ধি কাজে লাগাতে পারি। সে মতে একদিন ছেলেকে মাদরাসায় পাঠিয়ে মা খাবার রান্না করে ঘরের কোথাও লুকিয়ে রাখলেন। ছেলে মাদরাসা থেকে এসে খাবার চাইলো। মা বললেন, বাবা। আমি প্রতিদিন আল্লাহর কাছে খাবার চাই, তিনি রিযিক দাতা, দুনিয়ার সব মানুষ ও প্রাণীকে তিনি রিযিক দেন, তাই তুমি আল্লাহর কাছে চাও, আল্লাহ তোমাকে খাবার দিবেন। ছেলে বলল, মা আমি আল্লাহর কাছে কিভাবে চাবো? মা বললেন, তুমি জায়নামাজ বিছাও। ছেলে জায়নামাজ বিছায়। মা বললেন, তুমি জায়নামাজে

বসো। ছেলে জায়নামাজে বসল। এর পর মা বললেন, হাত ওঠাও! ছেলে নিষ্পাপ হাত দু-খানি আল্লাহর শাহী দরবারে বাড়িয়ে দিয়ে বলতে থাকে, হে আল্লাহ! এই মাত্র মাদরাসা থেকে এলাম, আমার খুব ক্ষুধা পেয়েছে। তুমিতো আমার আব্বু-আম্মুকে খাবার দাও, দয়া করে আমাকেও খাবার দাও! ছেলে দু'আর পর মাকে বলে, মা! আমি এখন কি করবো? মা বললেন, ওই রুমে খুঁজে দেখো খাবার পেয়ে যাবে। ছেলে সামান্য খোঁজা-খুঁজির পর খাবার পেয়ে যায়। সে দিন ছেলে খাবার পেয়ে খুব খুশি হয়ে যায়। পরিতৃপ্তি সহকারে খায়। এর পর থেকে এটা তার অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। প্রতিদিন এভাবে খাবার খেতে খেতে তার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্ম নেয় যে, রিযিকের মালিক আল্লাহ। সে মাকে বলে, মা! আল্লাহ না কতই ভালো। তিনি সবাইকে খাবার দেন। শহরে-বন্দরে, বনে-জঙ্গলে, পাহাড়ে-পর্বতে যে যেখানেই থাকে তিনি তার খাবার ব্যবস্থা করেন। ছেলে যখন আল্লাহর এসব গুণাগুণ বলতো তখন মায়ের মন আনন্দে ভরে ওঠতো। তিনি ভাবতেন আমার কৌশল কার্যকর হয়েছে এবং আমার ছেলের অন্তরে আল্লাহর ওপর আস্থা, বিশ্বাস ও ভালোবাসা তৈরী হয়েছে।

ছেলের অন্তরে শিশু বয়সেই আল্লাহর প্রেম ভালোবাসা ও বিশ্বাস জাগ্রত করতে পেরে মা খুবই আনন্দিত। কিন্তু এরই মাঝে ঘটে গেলো অনাকাঙ্ক্ষিত একটি ঘটনা। একদিন মা তার কোনো এক আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে গেলেন। যাওয়ার সময় তিনি ভুলে গিয়ে ছিলেন ছেলের খাবার তৈরী করে রেখে যাওয়ার কথা।

আত্মীয়ের বাড়িতে যাওয়ার অনেক পরে তার মনে হলো খাবার তৈরী করে রাখেননি। ছেলে হয়তো মাদরাসা থেকে ফিরে এসেছে। মা কেঁদে কেঁদে দ্রুত পায়ে হেঁটে বাড়ির পথে রওয়ানা করলেন। রাস্তায় আল্লাহর দরবারে দু'আ করলেন, হে আমার রব! আমি আমার ছেলের বিশ্বাস তৈরীর জন্য এক পদ্ধতি গ্রহণ করেছি, আল্লাহ তুমি আমার ইজ্জত রক্ষা করো। আজ যদি আমার ছেলের বিশ্বাস ভঙ্গ হয়ে যায় তাহলে আমার সব পরিশ্রম বৃথা যাবে। আল্লাহ আমার ভুল হয়ে গেছে, সময়ের প্রতি খেয়াল ছিলো না। মা ঘরে এসে দেখলেন, ছেলে শুয়ে আছে। তাড়াহুড়া করে খাবার তৈরী করে ঘরের এক জায়গায় লুকিয়ে রাখলেন। পরে ছেলের কাছে গিয়ে তার কপালে চুমু খেয়ে আদর করে বললেন, আজ আমার বাবার অনেক কষ্ট হয়ে গেছে। অনেক ক্ষিধে পেয়েছিলো বুঝি! তাইনা। ছেলে বলল, না মা আমার তো ক্ষুধা পায়নি। মা বললেন, কেনো? তুমি কি খেয়েছো? ছেলে বলল আমি যখন মাদরাসা থেকে এসেছি তখন তোমাকে না পেয়ে জায়নামাজ বিছিয়ে আল্লাহর কাছে দু'আ করেছি। হে আল্লাহ আমার খুব ক্ষুধা পেয়েছে। আজতো আম্মাও বাড়িতে নেই। আল্লাহ আমার খাবারের ব্যবস্থা করে দাও! এরপর আমি ওই রুমে গিয়ে এক জায়গায় একটি রুটি পড়ে থাকতে দেখি। আমি তা উঠিয়ে খেয়ে নিয়েছি। মা তার কথা শুনে বললেন,

আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ তুমি আমার ইজ্জত রক্ষা করেছো! প্রথম প্রথম মা রুটি তৈরী করে রেখে দিয়ে ছেলের বিশ্বাস তৈরী করার ফলে পরবর্তীতে ছেলের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে। তার মনে আল্লাহর ওলী হওয়ার বীজ মা বপন করে দেন। এই বীজ একদিন চারা গাছে রূপান্তরিত হয়। ধীরে ধীরে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে তা বিরাট এক মহীরুহে পরিণত হয়। সেই মহীরুহ তৈরীতে যার সবচেয়ে বেশী ভূমিকা তিনি এক মহীয়সী নারী। তিনি এক ভুবন বিজয়ী মহা মানবের মা।

হজরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলীয়া (র.)-এর মায়ের ভূমিকা

হজরত নিজামুদ্দীন আওলীয়া (র.) মাত্র পাঁচ বছর বয়সে পিতাকে হারান। মা ছিলেন অত্যন্ত দ্বীনদার ও নেককার নারী। তিনি বেশ যত্নের সঙ্গে ছেলের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করেন। নিজামদ্দীন (র.) বলেন, যে দিন আমাদের ঘরে রান্না- বান্না করার কিছু থাকতো না সেদিন মা বলতেন, 'আজ আমরা সবাই আল্লাহর মেহমান।' এ কথা শুনে আমার খুব ভালো লাগতো। একদিন আল্লাহর এক বান্দা আমাদেরকে অনেকগুলো আটা দিয়ে যান। তার দেওয়া আটা দিয়ে আমরা নিয়মিত রুটি খেতে থাকি কিন্তু আমি মনে মনে সেই অপেক্ষায় ছিলাম, আম্মা আবার করে বলবেন- 'আজ আমরা সবাই আল্লাহর মেহমান।' অবশেষে একদিন আটা শেষ হয়ে গেলো। মা বললেন, আজ আমরা সবাই আল্লাহর মেহমান। এ কথা শুনে আমি এতো আনন্দিত হলাম যা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়।

খাজা নিজামুদ্দীন (র.) তাঁর মায়ের ইন্তেকালের পর একদিন তিনি বিষন্ন মনে আক্ষেপের স্বরে বলছিলেন, একদিন নতুন চাঁদ দেখে মায়ের কাছে গিয়ে সালাম দিয়ে বলি, মা! নতুন চাঁদের মোবারকবাদ। মা বলেন, আগামী মাসে নতুন চাঁদ। দেখে কাকে সালাম দিবে, কাকে মোবারকবাদ জানাবে? আমি বুঝে ফেললাম যে মায়ের মৃত্যু অত্যাসন্ন। তাঁর এ কথার পর আমার হৃদয় ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাচ্ছিলো। অমি কেঁদে কেঁদে বলি, আমি অসহায়কে কার কাছে রেখে যাবে মা? মা বললেন, এর উত্তর আগামী কাল দেবো। পরের দিন তাহাজ্জুদের পর ঘরের কাজের মেয়ে এসে বললো, মা আপনাকে ডাকছেন। মায়ের কাছে হাজির হলে মা বললেন, গতকাল তুমি আমাকে একটি কথা জিজ্ঞেস করেছিলে, আজ জবাব দেব বলে ওয়াদা করেছিলাম। শোন বাবা! ভালো করে শোন। তোমার ডান হাত কোনটি? আমি ডান হাত মায়ের সামনে দিলাম। মা আমার হাত তাঁর হাতে নিয়ে বললেন, আল্লাহ আমি তাকে তোমার হাতে সোপর্দ করলাম। এর পর তিনি নিজের জীবনকে জীবনের মালিকের হাওলা করে দিলেন।

মায়ের এ আমলের কারণে আমার মনে আল্লাহর প্রতি এমন আস্থা তৈরী হয় যে, এর পর আমিও মায়ের মতো হয়ে যাই। এখানেও একজন সফল ব্যক্তির সাফল্যের পিছনে এক মায়ের ভূমিকা প্রকাশ পেয়েছে নিশ্চয়ই।

হজরত ইলিয়াস কান্ধলবী (র.)-এর মায়ের ভূমিকা

হজরত মাওলানা ইলিয়াস কান্ধলবী (র.) ভারতের মুজাফফর নগর জেলার আওতাধীন কান্ধালার এক ঐতিহ্যবাহী বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের বংশের সবাই ছিলেন দ্বীনদার-মুত্তাকী। পুরুষেরা তো বটেই তাঁর বংশের মহিলাদের দ্বীনদারীর কথা আমাদের মতো অধমদের জ্ঞানেও ধরে না। তাঁদের পরিবারগুলোতে রমজান মাসে বিস্ময়কর এক পরিবেশ বিরাজ করতো। সবাই তাসবীহ-তাহলীল, জিকির, নফল ও অন্যান্য ইবাদত-বন্দেগীতে একনিষ্ঠভাবে মগ্ন হয়ে থাকতেন। মহিলারাও নামাজে পূর্ণ কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করতেন। তাফসীরে কুরআন, মাজাহেরে হক, মাশারিকুল আনওয়ার প্রভৃতি কিতাব মহিলাগণ ঘরেই তাদের বাচ্চাদের পড়িয়ে দিতেন। কখনো কখনো শাহ 'আব্দুল আজিজ (র.), সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ (র.)-এর বংশের ঘটনা বর্ণনা করা হতো। মহিলাগণ তাদের বাচ্চাদেরকে কাঠবিড়ালী আর খরগোশ-কচ্ছপের ঘটনা শোনানোর পরির্বতে আওলীয়ায়ে কেরামের শিক্ষণীয়, হৃদয়স্পর্শী ও গঠনমূলক ঘটনাবলী শোনাতেন। একবার হজরত ইলিয়াস (র.) এ রকম এক ঘটনা শুনে বলে উঠেন, আমাকে বলো! আমরা যাদের বংশে জন্মগ্রহণ করেছি তাদের উদাহরণ কি দুনিয়ার কোথাও আছে?

হজরত ইলিয়াস (র.) কে শৈশবে তাঁর মা এমন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেন যে, শিশুকালেই তাঁর অন্তরে দ্বীনের সম্মান ও ভালোবাসা দৃঢ় হয়ে যায়। এই ছেলে বড় হয়ে দাওয়াত ও তাবলিগের প্রতিষ্ঠাতা হন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতির মাধ্যমে আজ বিশ্বব্যাপী দ্বীনের মেহনত চলছে।

আকাবির-আসলাফের দ্বীনি শিক্ষায় মায়েদের ভূমিকা

পৃথিবীতে সন্তানের সবচেয়ে নিকটতম মানুষ মা। সন্তানের জন্য মায়ের যে মমতা ও ব্যাকুলতা তার কোনো তুলনা নেই। তাই তো জনম দুঃখিনী মা নিজের সকল সুখ-শান্তি বিসর্জন দেন সন্তানের প্রশান্তি চেয়ে। মমতাময়ী মা ভুলে যান তাঁর দুঃখ যাতনা কলিজার টুকরো সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে।

সন্তানের লালন-পালন ও উত্তম চরিত্র গঠনে মায়ের ভূমিকা অগ্রগণ্য। মায়ের কোল প্রতিটি সন্তানের প্রথম পাঠশালা। মায়ের কাছেই সন্তান গ্রহণ করে জীবনের প্রথম পাঠ। মায়ের ভাষাতেই ফোটে সন্তানের প্রথম কথা। মায়ের আচরণ থেকেই সে শিখে জীবন যাপনের নিয়ম। শৈশব-কৈশোরে সন্তানের মধ্যে যে স্বভাব-চরিত্র গড়ে উঠে, সেটাই তার জীবনের শেকড় ও ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। এরপর যখন সে পরিণত বয়সে উপনীত হয়, তখন কৈশোরে গড়া সেই ভিত্তিই তার জীবন যাপনের ক্ষেত্রে নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। তাই সন্তানের উষালগ্ন হতে যদি তাকে সঠিক তরবিয়ত দেয়া না হয়, উত্তম শিক্ষা-দীক্ষা ও আদব-কায়দায় গড়ে তোলা না হয়, তাহলে পরে আর কোনো পন্থাই কার্যকর হয় না।

জীবনী ও ইতিহাসগ্রন্থে আমাদের আকাবির-আসলাফের এমন হাজারো ঘটনা খুঁজে পাওয়া যায়, যেখানে সন্তানকে দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত করণে শুধু মায়েরাই বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন। এখানে সে রকম কয়েকটি ঘটনা পেশ করা হচ্ছে।

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর মায়ের ভূমিকা

হজরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু যিনি শৈশব থেকেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে থাকতেন। তিনি ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিশেষ খাদেম। তাঁর মা ছিলেন হজরত উম্মে সুলাইম রাদিয়াল্লাহু আনহা। তিনি থাকতেন মদীনায়। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু শৈশবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু ছোট থাকতেই তার মা তাকে কালেমা শিখাতেন।
উম্মে সুলাইম রাদিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন অত্যন্ত খোদাভীরু-পুণ্যবতী নারী। স্বামীর বিচ্ছেদের পর অনেক লোক তার নিকট বিয়ের প্রস্তাব পেশ করে কিন্তু তিনি একমাত্র সন্তানের শিক্ষা-দীক্ষা, তালীম-তারবিয়াতের চিন্তা করে সব প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘হযরত আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু উম্মে সুলাইম রাদিয়াল্লাহু

আনহা-কে বিবাহের প্রস্তাব দিলেন। উম্মে সুলাইম রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমার ছেলে আনাস প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত এবং ইলমের মজলিসগুলোতে না বসা পর্যন্ত আমি বিবাহ করবো না।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় যান তখন আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বয়স দশ। উম্মে সুলাইম রাদিয়াল্লাহু আনহা হজরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে একজন ভালো মানুষ বানানোর আশা পোষণ করতেন। তিনি ভাবলেন আনাসকে মানুষ করতে হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে পেশ করার চেয়ে উত্তম পন্থা আর কি হতে পারে? মা উম্মে সুলাইম রাদিয়াল্লাহু আনহা ছেলেকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে উপস্থিত করে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি এ সন্তানকে বড় আদর-যত্নে লালন-পালন করেছি। আমার মনের ইচ্ছে তাকে আপনার দরবারে রেখে যাবো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার প্রস্তাবে সম্মত হলে হজরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু দরবারে নববীর নূরানী পরিবেশে বেড়ে ওঠতে লাগলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা করতেন আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু তা দেখতেন এবং মুখস্থ করে ফেলতেন। সব কাজে তার অনুসরণ করতেন। আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহে পরবর্তীতে হজরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিশেষ সাহাবীদের মর্যাদাপূর্ণ তালিকায় গণ্য হন। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অসংখ্য হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজেই বলেন, 'আমার মা যদি আমার শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা না করতেন তাহলে আমি নিতান্তই মূর্খ থেকে যেতাম'। আরেক বর্ণনায় এসেছে হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'আল্লাহ তাআলা আমার আম্মাকে উত্তম বিনিময় দান করুন তিনি আমাকে উত্তমভাবে লালন-পালন করেছেন'।

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু ইলম শেখা আরম্ভ করার পর তাঁর মা আবু তালহা রা.-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। এই ঘটনায় একজন মহামানব গঠনের নেপথ্যে এক মহীয়সী মায়ের বিরল ভূমিকা প্রকাশ পেয়েছে।

ইমাম রবিয়াতুর রাই (র.)-এর মায়ের ভূমিকা

ইমাম রবিয়াতুর রাই (র.) যখন মায়ের পেটে তখন তার পিতা আবু আব্দুর রহমান ফররুখ জিহাদের উদ্দেশ্যে ঘর ছেড়ে চলে যান। যাওয়ার সময় তিনি স্বীয় স্ত্রীরে ত্রিশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে বলেন, এগুলো সতর্কতার সঙ্গে রাখবে। আমি যদি জীবিত অবস্থায় জিহাদ থেকে ফেরত আসি তাহলে এগুলো দিয়ে ব্যবসা করবো। আমার অনুপস্থিতিতে যদি তোমার কোনো প্রয়োজন দেখা দেয় তাহলে এখান থেকে প্রয়োজন মতো খরচ করবে। আমি যাওয়ার পর তোমার ছেলে বা মেয়ে যাই আল্লাহ দেন খুব ভালো করে তার যত্ন নিবে। এই উপদেশ দিয়ে ফররুখ (র.) জিহাদে চলে যান। তিনি যাওয়ার পাঁচ মাস পর জন্মগ্রহণ করেন রবিয়া (র.)। ধীরে ধীরে বড় হতে থাকেন রবিয়া। মায়ের তত্ত্বাবধানে বাবার রেখে যাওয়া স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে চলছিলো রবিয়ার লেখাপড়ার ব্যয়ভার। রবিয়া (র.)-এর লেখাপড়ার পিছনে বাবার রেখে যাওয়া সব স্বর্ণমুদ্রা শেষ হয়ে যায়। রবিয়া (র.) ছিলেন তীক্ষ্ণ মেধাবী ও প্রচুর অধ্যবসায়ী। তিনি কুরআন-হাদীস, ফেকাহ ও আরবী সাহিত্যসহ জ্ঞানের সব শাখায় এমন পাণ্ডিত্য অর্জন করেন যে, তাঁর জ্ঞানের খ্যাতি সমগ্র আরব জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। মাত্র বাইশ বছর বয়সে তিনি যুগের ইমাম হয়ে যান। সাতাশ বছর জিহাদে কাটানোর পর ফররুখ (র.) ঘরে ফেরার সুযোগ পান। ঘরে এসে বল্লমের মাথা দিয়ে দরজায় শব্দ করেন। রবিয়া (র.) দরজা খুলে দেন। ফররুখ (র.) কোনো কথা ছাড়াই স্বাভাবিকভাবে ঘরে ঢুকতে লাগলে ইমাম রবিয়া (র.) তাঁকে বাঁধা দিয়ে বলেন, কে আপনি? অনুমতি ছাড়া আমার ঘরে প্রবেশ করছেন? ফররুখ (র.) রেগে বললেন, হে আল্লাহর দুশমন! এটা আমার ঘর। তুমি কে? কেনো এসেছো? দুজনের কথা কাটা-কাটিতে আওয়াজ উঁচু হতে লাগলো। অনেক লোক সমাগম হয়ে গেলো। এর পর ফররুখ (র.) তাঁর পরিচয় দিয়ে বললেন, আমার নাম ফররুখ। আমি সাতাশ বছর জিহাদে ছিলাম। আজ আমি এসেছি। আপনারা আমাকে চিনেন না? ফররুখ (র.)-এর কথা শুনে ভিতরের ঘর থেকে স্ত্রী উঁকি দিয়ে দেখে তাঁকে চিনে ফেললেন। ফররুখ (র.) ও রবিয়া (র.) পিতা পুত্রকে ভিতরে ডেকে নিয়ে পরিচয় করিয়ে দিলেন। এর পর পিতা পুত্রের বুকে বুক মিলিয়ে অনেক কান্নাকাটি করলেন।

খাওয়া-দাওয়ার পর ফররুখ (র.) স্ত্রীকে ৩০ হাজার স্বর্ণমুদ্রার কথা জিজ্ঞেস করলেন। স্ত্রী বললেন, আপনি শান্ত থাকুন আমার নিকট এর সম্পূর্ণ হিসাব রক্ষিত আছে। এরই মাঝে নামাজের সময় হয়ে যায়। ইমাম রবিয়া (র.) আজানের সঙ্গে সঙ্গে মসজিদে চলে যান। স্ত্রী স্বামী ফররুখ (র.) কে বললেন, যান মসজিদে নববীতে নামাজ পড়ে আসুন। মসজিদে নববীতে গিয়ে ফররুখ (র.) দেখেন এক শায়েখ দরস দিচ্ছেন। দূর থেকে সুস্পষ্ট তাঁকে দেখা না গেলেও মজলিশের লোকসমাগম দেখে বুঝা যাচ্ছিলো যে, নিশ্চয় এ শায়েখ অনেক বড় এবং উঁচু পর্যায়ের। অনেক মানুষ মাথা নিচু করে গভীর মনোযোগের সঙ্গে তাঁর পাঠ গ্রহণ করছেন।

রবিয়া (র.) আলিশান উঁচু পাগড়ী পরিহিত তাই ফররুখ (র.) তাঁকে দেখে চিনতে পারছিলেন না আসলে তিনি কে? তিনি পাশের এক জনকে জিজ্ঞেস করলেন, এই বুযুর্গ কে? একজন খুব আক্ষেপ করে বললো, আফসোস! আপনি উনাকে চিনেন না? উনি হলেন, ইমাম রবিয়াতুর রায় বিন আবু আব্দুর রহমান ফররুখ (র.)।

এ কথা শুনে তিনি এতো আনন্দিত হলেন যে, তাঁর চোখ দিয়ে পানি ঝরতে লাগলো। তিনি আল্লাহর দরবারে অসংখ্য শুকরিয়া আদায় করলেন। ঘরে এসে স্ত্রীকে বললেন, আজ আমি আমার ছেলের যে মর্যাদা ও সম্মান দেখেছি এর আগে এতো সম্মান ও মর্যাদা আর কারো দেখি নাই। স্ত্রী বললেন, সন্তানের এই মর্যাদা আপনার পছন্দ নাকি ত্রিশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা পছন্দ? ফররুখ (র.) বললেন, খোদার কসম! ওই ত্রিশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা আমার ছেলের মোকাবিলায় কিছুই নয়। স্ত্রী বললেন, আমি ওই ত্রিশ হাজার স্বর্ণমুদ্রার পুরোটাই তার লেখা-পড়ার পিছনে ব্যয় করেছি। ইমাম রবিয়া (র.) শীর্ষস্থানীয় তাবেয়ীদের একজন। ইলম-আমল, প্রজ্ঞা ও যোগ্যতায় তিনি এতো উপরে ছিলেন যে, ইমাম মালেক (র.), ইমাম সুফিয়ান সাওরী (র.), ইমাম আওযায়ী (র.) সহ আরো অনেকেই তাঁর ছাত্র ছিলেন। শেষ কথা হলো তাঁর এ মর্যাদার পিছনে সবচেয়ে বেশী ভূমিকা পালন করেছেন যিনি তিনি হলেন তাঁর মমতাময়ী মা।

সুফিয়ান সাওরী (র.)-এর মায়ের ভূমিকা

শায়খুল ইসলাম, ইমামুল হুফফায এবং ইবাদতগুযার আলেমদের নেতা হিসাবে পরিচিত প্রখ্যাত তাবে তাবেঈ আবু আব্দুল্লাহ সুফিয়ান বিন সাঈদ আছ-সাওরী (র.) ৯৭ হিজরীতে কূফার বনু তামীম গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। প্রবল জ্ঞানান্বেষী এই মুহাদ্দিছের শিক্ষকের সংখ্যা প্রায় ছয়শ' এবং ছাত্র প্রায় বিশ হাযার। তাঁর সম্পর্কে সুফিয়ান ইবনু উয়ায়না (রহঃ) বলেন, 'সুফিয়ান সাওরীর মত হালাল-হারাম সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তি আমি আর কাউকে দেখিনি'।

পরিবার থেকেই তিনি লাভ করেন ইলম হাসিলের অদম্য আগ্রহ। হযরত ওয়াকী ইবনুল জাররাহ রাহ. বলেন, সুফিয়ান সাওরীর আম্মা তার পুত্র সুফিয়ানকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন,

يا بني اطلب العلم وأنا أكفيك من مغزلي يا بني إذا كتبت عشرة أحاديث فانظر هل ترى في نفسك زيادة في مشيتك وحلمك ووقارك فإن لم تر ذلك فاعلم أنَّه لا يضرك ولا ينفعك

'হে বৎস! তুমি ইলম অর্জন করো। আমি সুতাকাটার বিনিময়ে যে পারিশ্রমিক পাব তা দিয়ে তোমার লালন-পালন ও ব্যয়ভার বহন করার জন্য যথেষ্ট হবো। হে আমার পুত্র ! তুমি দশটি হাদীস লেখার পর দেখ, তোমার মধ্যে জ্ঞানার্জনের চাহিদা, সহিষ্ণুতা, শিষ্টতা ও গাম্ভীর্য বেড়েছে কি না , তোমার মধ্যে যদি এ ক্ষেত্রে কোনো উন্নতি না ঘটে, ইলমের চাহিদা বৃদ্ধি না পায়, তবে মনে রেখ এটা তোমার উপকার-অপকার, লাভ-ক্ষতি কিছুই করবে না।'

সুফিয়ান তার শায়েখদের থেকে ইলম শেখায় রত হন। তার মায়ের কথা তাকে বেশী করে ইলম শিখতে প্রেরণা যোগাত এবং এজন্য কষ্ট স্বীকার করতে তিনি কুণ্ঠিত হতেন না। কারণ মায়ের পক্ষ থেকে ছেলের প্রতি এমন কথা উচ্চারণ বাস্তবে বড়ই কঠিন। তাই মায়ের কথা ছেলের মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। তার উপর সে প্রভাব এতটাই পড়েছিল যে, ইলম অনুসারে আমল তার আদত-অভ্যাস ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে পরিণত হয়েছিল। তাই তার জীবনের একটা মুহূর্তও তিনি অনর্থক নষ্ট করেননি। তিনি বলতেন, আমরা যখনই আমাদের শিক্ষাদানের জন্য কাউকে পাই তখনই আমরা তার থেকে ইলম শিখতে শুরু করি।

মালেক ইবনে আনাস (র.)-এর মায়ের ভূমিকা

ইমাম মালেক বিন আনাস (র.)-এর মায়ের নাম আলেয়া বিনতে শুরাইক। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ও বিদ্যান নারী ছিলেন। তিনি আপন পুত্র মালেকের শিক্ষা-দীক্ষায় অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন। ইলমের ওযন বুঝা, আলেমদের মর্যাদা অনুধাবন করা, তাদের মান-ইয্যত কতখানি দেওয়া জরূরী, একজন শিক্ষার্থীর মধ্যে ইলম অন্বেষণের জন্য কতটা আদব-আখলাক থাকা অত্যাবশ্যক ইত্যাদির জ্ঞানে ইমাম মালেকের মাকে প্রবাদ হিসাবে উল্লেখ করা হয়। তার চেয়েও বড় কথা, ইলম কার থেকে শেখা যাবে এবং কার থেকে শেখা যাবে না; কোন ইলমের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী, যাকে অন্য বিদ্যার উপর প্রাধান্য দিতে হবে এবং অগ্রগণ্য ভাবতে হবে সে বিষয়ে তার সুস্পষ্ট ধারণা ছিল।

ইমাম মালেক (র.) তখন কিশোর। সুললিত কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন। তাই তার গান শেখার ইচ্ছে হলো। মাকে গান শেখার কথা বললেন। তাঁর আম্মা তাকে বললেন যে, 'তুমি তো গায়কদের মতো সুন্দর নও। গায়ক যদি দেখতে সুন্দর না হয় তাহলে মানুষ তার দিকে ফিরেও তাকায় না। সুতরাং তুমি গানের চিন্তা বাদ দিয়ে ফিকহ অর্জন কর।' ইমাম মালেক (র.) বলেন, তখন আমি গায়কদের পরিত্যাগ করে ফুকাহাদের অনুসরণ করলাম। ফলে আল্লাহ তাআলা আমাকে কোন অবস্থানে পৌঁছিয়েছেন তা তো দেখতেই পাচ্ছেন।

অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, ইমাম মালেক (র.) বলেন, আমি আমার মা-কে বললাম যে, আমি দীনি শিক্ষা অর্জন করবো। তখন আমার মা আমাকে আলেমদের পোশাক মাথায় টুপি ও ধবধবে সাদা পাগড়ী পরিয়ে দিলেন এবং বললেন-

اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه

রবীয়াতুর রাই এর মজলিসে যাও এবং প্রথম তার শিষ্টাচার ও আদব- আখলাক শিক্ষা কর। অতঃপর তার ইলম শিক্ষা করো।

আরেকটি বর্ণনায় আছে তিনি বলেছিলেন-

اذهب فاكتب الآن

যাও এখন হাদীস লেখ, পড়।

ইমাম মালেক তার সান্নিধ্যে থেকে ফিকহ ও হাদীসের জ্ঞান অর্জন করেন।
সেই সময় ইমাম রবীয়াতুর রাই মসদিজে নববীতে দরস দিতেন এবং মদীনার বড় বড় আলেম ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তার দরসে উপস্থিত থাকতেন। এ জন্য তার মা পুত্রের শিক্ষা-দীক্ষার জন্য

তার মজলিসকেই নির্বাচন করেছিলেন এবং এখান থেকেই তার পুত্র ইমাম মালেক হয়ে বের হয়েছেন। ইমাম রাবীয়াতুর রাই ইমাম মালেক রহ.-এর সর্বপ্রথম উস্তায।

ইমাম মালেক (র.)-এর মধ্যে সেই শৈশব থেকে তার মায়ের প্রভাব বিদ্যমান ছিল। ইলমের মজলিসে ছেলেকে বসানো, ইলম ও বিদ্বান আলেমদের কদর করা, ইলম দ্বারা নিজেকে বিভূষিত করা, ইলমের খোশবুতে মাতোয়ারা হওয়ার মতো পথে মা তাকে বিশেষ প্রেরণা যুগিয়েছিলেন। এসব কারণে মহান ইমামের মধ্যে আরো অনেক মহৎ গুণের সমাবেশ ঘটেছিল। যেমন- ব্যাপক মুখস্থশক্তি, বিশাল ধৈর্য, তীক্ষ্ণ মেধা, প্রখর অন্তর্দৃষ্টি, অকৃপণভাবে মানুষকে সম্মান দান ইত্যাদি।

ইমাম মালেক (র.)-এর মায়ের উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। তিনি প্রজন্ম পরম্পরায় মায়েদের জন্য তাদের সন্তানদের কিভাবে যথাযথ মানুষ করে গড়ে তোলা যায় সে বিষয়ে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় রেখে গেছেন।

ইমাম শাফেঈ (র.)-এর মায়ের ভূমিকা

যে মহান ইমামের কথা এখানে আলোচনা করা হচ্ছে হাদীছের জগতে তার মাহাত্ম্য ও ফযীলত কোন অবিদিত বিষয় নয়। তার মর্যাদা ও খ্যাতি মুসলিম বিশ্বে খুবই সুবিদিত বিষয়। 'বিশ্ব-জগতের সঙ্গে যেমন সূর্যের সম্পর্ক, শরীরের সঙ্গে যেমন সুস্থতার সম্পর্ক তেমনি হাদীছের সাথে তার সম্পর্ক'। তার সম্পর্কে এ মন্তব্য করেছেন তারই বিখ্যাত ছাত্র আহমাদ ইবনু হাম্বল (র.)।

ইমাম শাফেঈর পুরো নাম মুহাম্মাদ বিন ইদরীস আশ-শাফেঈ। ইমাম শাফেঈ (র.)-এর মায়ের নাম ফাতেমা বিনতে আব্দুল্লাহ। আল্লাহর ইচ্ছাক্রমে জন্মের মাত্র দু'বছরের মাথায় তাঁর পিতা মারা যান। তখন থেকে তিনি মায়ের তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হ'তে থাকেন। মা অত্যন্ত হিম্মতের সাথে অবিরত ধারায় তার লালন-পালন ও শিক্ষা-দীক্ষার কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন। অনেক বড় ও কঠিন কাজকেও মা এজন্য ছোট করে দেখেছেন। তিনি তার ছেলেকে ইলম শেখার জন্য উৎসর্গ করেছিলেন। ছেলে ইলম শিখতে দেশে দেশে ঘুরছে, শায়খদের দরসে তিনি ছেলেকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, তার জন্য ইলমের হালাকাতে জায়গা তালাশ করছেন, আর এমনি করে শাফেঈ (র.) ইমাম বনে গেছেন, যিনি দুনিয়ার খাঞ্চা বিদ্যা দিয়ে ভরে দিয়েছেন।

ইমাম শাফেঈ (র.) তৎকালীন শামের আসক্বালান শহরের গির্যা এলাকায় ১৫০ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। ইমাম শাফেঈর বয়স যখন দু'বছর হয় তখন তার দৃঢ়চেতা মা কোলের ছেলেকে নিয়ে মক্কায় পৌঁছেন। ছেলে আরবী ভাষার বিশুদ্ধ রীতি ও ঢং আয়ত্ব করবে, তার মাঝে সচ্চরিত্রের গুণাবলি বিকশিত হবে, উন্নত ধ্যান-ধারণা ও সদভ্যাস গড়ে উঠবে এবং ভালোভাবে আদব-আখলাক ও ইলম শিখতে পারবে, আরবী কবিতা শিখবে- সেটা ছিল মায়ের আশা।

কুরআন হিফযের প্রতি তার মা প্রথমেই গুরুত্ব দেন। ফলে মাত্র সাত বছর বয়সে তিনি কুরআন হিফয সম্পন্ন করেন। তারপর তিনি হাদীছ শেখায় মনোনিবেশ করেন। মাত্র দশ বছর বয়সে তিনি ইমাম মালেক সংকলিত মু'আত্তা গ্রন্থ মুখস্থ করে নেন। তারপর তিনি মক্কায় ইলম অন্বেষণে মশগূল হন এবং শারঈ বিদ্যায় এতটাই ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন যে বিশ বছর না হ'তে তিনি ফৎওয়া দানের অনুমতি লাভ করেন। তার এ অর্জনের পিছনে মহীয়সী মায়ের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

এই মহীয়সী মায়ের জিহাদ-সংগ্রাম দেখার মতো। অভাব নিত্য সঙ্গী হওয়া সত্ত্বেও তিনি ছেলের শিক্ষার জন্য মরিয়া হয়ে কাজ করেছেন। এক পর্যায়ে ছেলের পড়ার খরচের জন্য নিজের বাড়িটা পর্যন্ত বন্ধক রেখেছেন। ছেলে সেই অর্থ নিয়ে বাইরে সফর করেছে।

ইমাম শাফেঈর মায়ের পক্ষে যতটা সম্ভব হয়েছে ছেলেকে তিনি এক অনুকরণীয় শিক্ষাদান করে গেছেন। তিনি তার জীবনকে স্রেফ ছেলের মধ্যে সীমিত রেখেছিলেন। একেবারে বাল্যবিধবা হওয়া সত্ত্বেও ছেলেকে বড় মানুষ করার চিন্তায় তিনি আর দ্বিতীয় বার বিয়ের পীঁড়িতে বসেননি। ছেলের তারবিয়াতের ক্ষেত্রে তিনি একটি সুস্পষ্ট রূপরেখা তৈরি করেছিলেন। সে রূপরেখা ধরে তিনি দৃঢ় চিত্তে অব্যাহত গতিতে চলেছিলেন, কোন ক্লান্তি তাকে স্পর্শ করেনি। ছেলের তারবিয়াতের জন্য তিনি একাধারে অনেক মহৎ ও উঁচু বিষয় এবং শ্রেষ্ঠ ও উত্তম শিক্ষকমন্ডলী নির্বাচন করেছিলেন। যার মাধ্যমে ছেলে ইলমের দরিয়া থেকে তার উৎস খুঁজে পেয়েছিলেন এবং তৃপ্তি সহকারে তা আকণ্ঠ পান করেছিলেন। তারপর তার সেই তৃপ্তিপূর্ণ জ্ঞান দ্বারা সারা বিশ্বকে পরিতৃপ্ত করেছিলেন। ভূলোক-দ্যুলোকের মধ্যবর্তী সব জায়গায় তার সে জ্ঞান ছড়িয়ে পড়ে।

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (র.)-এর মায়ের ভূমিকা

‘আমার বয়স যখন দশ তখন আমার মা আমাকে কুরআনের হাফেয করে গড়ে তোলেন। ফজর সালাতের আগেই তিনি আমাকে জাগিয়ে দিতেন। বাগদাদের শীতের রাতগুলোতে তিনি আমার জন্য পানি গরম করে রাখতেন, আমার পোশাক পরিয়ে দিতেন। তারপর নিজের উড়না ও হিজাব পরে আমাকে সাথে করে মসজিদে নিয়ে যেতেন। মসজিদ ছিল আমাদের বাড়ি থেকে দূরে, আর রাস্তা থাকত অন্ধকার। সেজন্য তিনি প্রতিনিয়ত আমার সাথে এভাবে যাতায়াত করতেন’। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (র.) মায়ের প্রসঙ্গে তার অভিব্যক্তি এভাবেই প্রকাশ করতেন।

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (র.)-এর মায়ের নাম ছাফিয়া বিনতে মায়মূনা বিনতে আব্দুল মালেক। তার পিতার নাম মুহাম্মাদ বিন হাম্বল (র.)। তিনি মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে যৌবনকালেই মৃত্যুবরণ করেন। ইমাম সাহেবের মায়ের বয়স তখন ত্রিশের কম। তা সত্ত্বেও তিনি আর বিবাহে আগ্রহ প্রকাশ করেননি। পুত্রকে স্নেহ ও মায়া-মমতা দিয়ে বড় করে তোলার আকাঙ্ক্ষাই তাঁর মনে বড় হয়ে দেখা দেয়। ফলশ্রুতিতে তিনি মুমিনদের দুনিয়ায় তাওহীদবাদীদের বিশ্বে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আতের ইমাম হিসাবে তার ছেলে আহমাদ বিন হাম্বল (র.)-কে উপহার দিয়ে গেছেন। আর আল্লাহ ছিলেন তার ইচ্ছার পিছনে তাওফীক্বদাতা।

অর্থসঙ্কট থাকা সত্ত্বেও আহমাদ (র.)-এর মা ছেলের বিদ্যা শিক্ষার প্রতি খুবই আগ্রহী ছিলেন। তিনি কুরআন হেফয ও হস্তলিপি শেখার জন্য তাকে মক্তবে পাঠিয়ে দিতেন। ইমাম আহমাদ (র.) যখন ১৬ বছর বয়সে পদার্পণ করেন তখন তার মা তাকে ইলমে হাদীস অন্বেষণের উদ্দেশ্যে সফর করতে নির্দেশ দেন। যেখানে অধিকাংশ মা তাদের একমাত্র পুত্রধনকে নিজের আঁচলতলে আবদ্ধ রাখেন, ঘরের বাইরে যেতে দেন না, সেখানে এই মা তার একমাত্র পুত্রধনকে নিজের কাছে আটকে রাখেননি এবং ছেলের দৃঢ় ইচ্ছাকে তিনি থামিয়ে দেননি। তিনি বরং বিষয়টি আল্লাহর নিকট ন্যস্ত করেছেন এবং বিদ্যা অন্বেষণে ইখলাছ ও তাক্বওয়া অবলম্বনের জন্য ছেলেকে অছিয়ত করছেন।

ইমাম আহমাদ (র.) আল্লাহর অনুগ্রহে ও মায়ের তরবিয়তে শিষ্টাচারের এমন পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিলেন যে লোকে তাকে ঈর্ষার চোখে দেখতে শুরু করে। ইয়াতীম হয়েও তিনি যে গুণের অধিকারী হয়েছেন মাতা-পিতার ছত্রছায়ায় থেকেও বহু শিশুর সে সৌভাগ্য হয়নি। ছোট্ট মানুষ হওয়া সত্ত্বেও তিনি চেনা-পরিচিত নারী-পুরুষ সকলের ভরসার স্থল ছিলেন।

মা ছাফিয়া ছেলে আহমাদের মধ্যে ইলমের প্রতি ভালোবাসার চারা রোপণ করেছিলেন। সে চারা তার মনের মাঝে শক্তি সঞ্চয় ও জোরদার হ'তে থাকে। শারঈ বিদ্যার প্রতি তার মনের আকর্ষণ জয়যুক্ত হয় এবং সে বিদ্যার খেদমতে তিনি আজীবন অতিবাহিত করেন। ইমাম আহমাদ (র.) হাদীস অন্বেষণে কূফা, বছরা, মক্কা, মদীনা, ইয়ামন, শাম ও জাযিরা সফর করেন এবং প্রতিটি শহরের আলেমদের থেকে হাদীস লিপিবদ্ধ করেন।

এভাবেই মহীয়সী মা অভাব-অভিযোগ সত্ত্বেও ছেলেকে বিদ্যা শিখতে অনুপ্রেরণা যোগান এবং তাকে সাহায্য-সহযোগিতা করেন।

ইমাম বুখারী (র.)-এর মায়ের ভূমিকা

ইমাম বুখারী (র.)-এর মায়ের কীর্তি ছেলের কীর্তির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। পিতার মৃত্যুর পর ইমাম বুখারী (র.) ইয়াতীম হিসাবে তার মায়ের কোলে লালিত-পালিত হন। তিনি তার তারবিয়াত ও শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করেন। ফলে মাত্র সাত বছর বয়সে তিনি কুরআন হেফয সম্পন্ন করেন।

ঐতিহাসিকগণ শিশুকালে ইমাম বুখারীর জীবনে এক বিস্ময়কর ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। একবার রোগাক্রান্ত হওয়ার দরুন তার দু'চোখের জ্যোতি নিভে গিয়েছিল। তিনি চোখে দেখতে পেতেন না। মায়ের মন এতে বড়ই ব্যথিত হয়। ছেলের দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবার জন্য তিনি আল্লাহর নিকটে বেশী বেশী সকাতর কান্নাকাটি ও দো'আ-খায়ের করতে থাকেন। একদিন স্বপ্নে তিনি ইব্রাহীম খলীল (আঃ)-কে দেখতে পান। তিনি তাকে ডেকে বললেন, হে মেয়ে! তোমার বেশী বেশী কান্নাকাটি বা দো'আর ফলে আল্লাহ তোমার ছেলের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন। এ কাহিনীর বর্ণনাকারী আহমাদ বিন ফযল বলখী বলেন, আমরা সকাল বেলা উঠে দেখি, মহান আল্লাহ তার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন। ইমাম বুখারীর দৃষ্টিশক্তি লোপ এবং মায়ের কাকুতি-মিনতি সহকারে আল্লাহর নিকট দো'আর মাধ্যমে তা ফিরে পাওয়া ঐ মায়ের কারামতের প্রকৃষ্ট দলীল।

পিতার মৃত্যুর ফলে ইমাম বুখারীর মাকে ছেলের লালন-পালনে ও শিক্ষা-দীক্ষায় একই সাথে পিতা ও মাতার ভূমিকা পালন করতে হয়েছে। তিনি সে দায়িত্ব অত্যন্ত সুন্দর ও সুচারুরূপে আঞ্জাম দিয়েছেন। তিনি তার জন্মস্থান বুখারাতে তার প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

বুখারার আলেমদের থেকে আরবী ভাষা, কুরআন মাজীদ হেফয ও হাদীছ হেফয সহ অন্যান্য জ্ঞান অর্জন সম্পন্ন হ'লে তিনি ছেলেকে নিয়ে মক্কায় রেখে আসেন ইলম শিক্ষার জন্য। তখন বয়স ছিল ১৬ বছর। ১৮ বছর বয়সকালে আমি ছাহাবী ও তাবেঈদের ঘটনাবলী ও বচনাদির উপর বই রচনায় প্রবৃত্ত হন। তিনি ইতিহাস বিষয়ে কিতাবুত তারিখ বইটি লিখেছিলেন চাঁদনী রাতগুলোতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কবরের পাশে বসে।

এক পর্যায়ে ইমাম বুখারী (র.) ইলমের জন্য ইরাক, শাম, মিশর প্রভৃতি দেশে গিয়েছেন এবং তথাকার মাশায়েখের থেকে হাদীছ গ্রহণ করেছেন। তার শায়েখ সংখ্যা ১০৮০ জন। এভাবে ইলমের জগতে তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।
তিনি চমৎকার সব বই লিখেছেন, যার শিরোভাগে রয়েছে 'সহীহ বুখারী', 'আল-আদাবুল মুফরাদ' ।

হয়তো মা ছেলের সফলতা অর্জন পর্যন্ত বেঁচে থাকলে তার শ্রেষ্ঠত্বে তিনি অভিভূত হতেন। ছেলেকে উত্তমরূপে গড়ে তোলার এ কাজ সুচারুরূপে শক্তপোক্তভাবে আঞ্জাম দিতে সকল মা পারেন না। কেবল সেই খাঁটি মনের অধিকারী মুখলিছ মা-ই তা পারেন, যাকে আল্লাহ তা'আলা যথার্থ পথ বাতলে দেন।

ইমাম আওকাস (র.)-এর মায়ের ভূমিকা

কাজিয়ে মক্কা মোহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান আল আওকাস (র.)-এর ঘটনা অত্যন্ত আশ্চর্যজনক। তার ঘাড়- শরীরের ভেতরে ঢুকে ছিলো। কাঁধদয় মাথার উপরে উঠে ছিলো। বেঁটে বা বামন আকৃতির ছিলেন তিনি। চেহারাও তেমন সুন্দর ছিলো না। তার মা অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ও আলেমা ছিলেন। তার এই সন্তানের ব্যাপারে তিনি খুব চিন্তা করতেন। একবার তাকে তিনি বললেন,

يا بني أتكون في قوم إلا كنت المضحوك منه المسخور به فعليك بطلب العلم فإنه يرفعك

বেটা! তুমি যেখানেই যাবে মানুষ তোমাকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করবে। সুতরাং তুমি ইলম অর্জন করো, ইলম তোমাকে সম্মানিত করবে।

অন্য একটি বর্ণনায় ইমাম আওকাস রহ. বলেন যে, আমার আম্মা অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ছিলেন। তিনি আমাকে বললেন-

يا بني إنك خلقت خلقة لا تصلح معها لمعاشرة الفتيان فعليك بالدين فإنه يتم النقيصة ويرفع الخسيسة فنفعني الله بقولها فتعلمت الفقه فصرت قاضيا

বেটা! তোমার শরীরের গঠনটাই এমন যে, তুমি অন্য যুবকদের সাথে মিশতে পারবে না। তাই তুমি ইলম অর্জন কর, তাহলে ইলম এই ত্রুটির পরিপুরক হয়ে যাবে এবং তোমার লাঞ্ছনা দূর করে দেবে।

আল্লাহ তাআলা তার এই কথার প্রভাব আমার উপর ফেলেছিলেন, যার কারণে আজ আমি ফিকহ শিক্ষা করেছি এবং কাজি হয়েছি।

ইসলাম প্রচার-প্রসারে নারীর ভূমিকা

ইসলাম ধর্ম প্রচার ও প্রসারে পুরুষদের পাশাপাশি নারীদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। হজরত রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম নবুওয়াত প্রাপ্তির পর ঈমানহারা মানুষের নিকট তাওহীদের দাওয়াত পৌঁছান। তাঁর ডাকে যে সব বোধ-বিবেক সম্পন্ন মানুষ সাড়া দেন তারা সবাই কিন্তু পুরুষ নন। অগণিত মহিলা সাহাবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন। লাব্বাইক! লাব্বাইক! বলে তাঁর প্রতিটি কাজে সমর্থন জানিয়ে ছিলেন। পুরুষদের পাশাপাশি মহিলাগণও ইসলাম প্রচারে পূর্ণ উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সহযোগিতা করেন।

ইসলামের দাওয়াত

মুসলিম নারীরা নিজ নিজ স্বামী, ভৃত্য, দাসী, গোলাম, আত্মীয়স্বজন, সাক্ষাৎপ্রার্থী ও বন্ধুবান্ধবদের ইসলাম গ্রহণে উৎসাহ দিতেন। এ রকম মহিলা সাহাবী দু-এক জন নয় অগণিত। ইতিহাসে তাঁরা অমর হয়ে আছেন, থাকবেন চিরকাল। তাদের পথ অনুসরণ করে এর পরের প্রজন্মেরও অনেক নারী দাওয়াতি কাজে অসামান্য ভূমিকা রেখে গেছেন।
অল্প কয়েকজন মহীয়সীর দাওয়াতি কাজের নজির উপস্থাপন করা হলো:

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর ভূমিকা

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রথম স্ত্রী খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু আনহা তো দ্বীনের কাজে মাল ও জান সবই বিলিয়ে দিয়েছিলেন আর হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা দাওয়াতী কাজ করেছিলেন ইসলামী বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে। তিনি ছিলেন নবীর স্ত্রীদের মধ্যে অধিক স্মৃতিধর এবং বুদ্ধিমতী। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দাঈ ইলাল্লাহর সাহচর্য আয়েশা (রা.)-কে তৈরি করেছে সমগ্র মানবজাতির কাছে আদর্শ হিসেবে। তার জ্ঞানের পরিধি ও ব্যাপকতা ছিল সুবিস্তৃত। শুধু উম্মুল মু'মিনীনদের মধ্যেই নয় বরং তৎকালীন সমগ্র নারী জাতির ওপর এবং খ্যাতনামা কিছু সংখ্যক সাহাবা ছাড়া সব সাহাবার ওপরই তার জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব-মর্যাদা ছিল অনস্বীকার্য।

তিনি ছিলেন অন্যান্য বিবিগণের মাঝে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে সর্বাদিক প্রিয়। এ কারণে পালাক্রমে যেদিন হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ঘরে থাকতেন, সেদিন সাহাবায়ে কেরাম হযরতের কাছে হাদিয়া উপহার বেশি পাঠাতেন। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশার ঘরে ও তাঁর কোলে ওফাত লাভ করেন। সেই ঘরেই তিনি সমাহিত হন। সে ঘরই এখন রওযা আকদাস হিসেবে দুনিয়ার মুসলমানদের কাছে সবচে প্রিয় স্থান।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অধিক সাহচর্য পাওয়ার কারণে এবং তার জ্ঞানের সুক্ষদর্শিতার ফলে আয়শা (রা.) হাদিস বিষয়ে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং কুরআন অবতরণ, নাযিলের প্রেক্ষাপট এবং অন্তর্নিহিত তাৎপর্য সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানও লাভ করেন। হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসগুলোতে মানবজীবনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ স্থান লাভ করেছে। বিশেষত নারী জীবনের অনেক খুঁটিনাটি বিষয়ে মুসলিম নারী সমাজ তার বর্ণিত হাদীসের মাধ্যমে অবহিত হয়েছেন ও উপকৃত হয়েছেন।

তাঁর সবচেয়ে বড় অবদান ছিল তিনি ছিলেন নবীজির মনের সান্ত্বনা। কোনো ব্যস্ততা বা আধ্যাত্মিক ভাবের তন্ময়তায় যখন নবীজির মন ভারি হয়ে যেত তখন মনের সান্ত্বনা খুঁজে হযরত আয়েশাকে ডেকে বলতেন: কাল্লিমীনী ইয়া হুমাইরা। 'হে হুমায়রা তুমি আমার সাথে কথা বল, আমার মন হালকা করো।' নবুয়তের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে একজন মহিলার এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার দৃষ্টান্ত আর কি হতে পারে? বর্ণিত আছে, নবীজি যখন একই

বিছানায় একই চাদরের নিচে হযরত আয়েশার ঘরে বিশ্রাম নিতেন তখনও তার উপর ওহী নাযিল হত।

দানশীলতা দাঈর অন্যতম গুণাবলী। তিনি তাঁর দানশীলতার মাধ্যমে মানুষের দুঃখ-কষ্টকে দূর করার চেষ্টা করতেন। কেননা, ব্যক্তিগত ও সামাজিক প্রয়োজনে সহযোগিতা পেলে মানুষ তার কথা শুনতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। আয়েশা (রা.)-এর দানশীলতার বহু ঘটনা হাদীস ও সীরাত গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে। উরওয়া (রহ.) বলেন, একবার আয়েশা (রা.) তার সামনে সত্তর হাজার দিরহাম একসাথে আল্লাহর রাস্তায় দান করে চাদরের কোনা ঝেড়ে ফেলেন। আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা.) আয়েশা (রা.)-এর নিকট এক লাখ দিরহাম পাঠালে সব তিনি দান করে দেন। সেদিন তিনি রোযাদার ছিলেন, অথচ ইফতারের সময় কিছুই ছিল না। দাসীকে বললেন, আগে কেন স্মরণ করিয়ে দাওনি। তার ন্যায় এরূপ দানশীলতার দৃষ্টান্ত খুবই বিরল।

হযরত আয়েশা (রা.) এর প্রচুর কবিতা মুখস্থ ছিল। অর্থাৎ সাহিত্য চর্চায় তিনি অগ্রণি ছিলেন। এছাড়া তিনি রোগীদের চিকিৎসা করতেন। মানুষ চিনতে তার মেধা ও প্রজ্ঞা ছিল অত্যন্ত প্রখর। তিনি ইসলামের প্রথম শ্রেণীর আলেম ও ফকীহ ছিলেন। সাহাবীদের মধ্যে যে ৭ জন ফিকাহশাস্ত্রে শিরোমণি ছিলেন, হযরত আয়েশা রা. তাদের অন্যতম। সেই ৭ জন ছিলেন হযরত উমর (রা.), হযরত আলী (রা.), হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা.), হযরত আয়েশা (রা.), হযরত যায়দ ইবনে সাবেত (রা.), হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)। বাকী ১৩৩ বা ১৩৯ জন ফকীহ সাহাবীর অবস্থান এই ৭ জনের পরে। হযরত আয়েশা (রা.) হতে দুই হাজার দুইশ দশটি হাদীস বর্ণিত। হযরতের জীবদ্দশায় ও ওফাতের পরে নানা ঘটনা প্রবাহে হযরত আয়েশা (রা.) মূখ্য ভূমিকা পালন করেন।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) ছিলেন এমন ব্যক্তিত্ব যাঁর ব্যক্তিগত ও বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের অভিমত লক্ষ্য করুন:

মাশরুক বলেন, 'যাঁর হাতে আমার জীবন নিহিত তাঁর শপথ-আমি বড় বড় সাহাবীকে আয়েশা (রা.)-এর কাছে ফারায়েজ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে দেখেছি।'

ইমাম যুহরী বলেন, 'সকল পুরুষ ও নারীর এলেম একত্র করা হলে হযরত আয়েশা রা.-এর এলেম হবে তাঁদের সবার চেয়ে বেশী।'

হযরত আবু মুসা আশয়ারী বলেন, 'সাহাবী হিসাবে আমাদের সামনে এমন কোনো কঠিন বিষয় উপস্থিত হয়নি যা হযরত আয়েশাকে জিজ্ঞেস করে তাঁর কাছে জানতে পারিনি।'

ওরওয়া ইবনে যুবায়ের বলেন, 'ফিকহ্, তিব ও কবিতা সম্পর্কে হযরত আয়েশার চেয়ে বেশী জ্ঞানী কাউকে আমি দেখতে পাইনি।'

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফের পুত্র আবু সালমা বলেন, 'হযরত আয়েশার চেয়ে সুন্নাতে নববীর বড় আলেম, দ্বীনের সূক্ষ্ম তত্ত্বে বিশেষজ্ঞ, কালামে মজীদের আয়াতের শানে নুযুল ও ফারায়েয সম্পর্কে বেশী জ্ঞানের অধিকারী আর কাউকে দেখিনি।'

'আতা' ইবনে আবু রোবাহ বলেন, 'আয়েশা (রা.) ছিলেন সবচেয়ে বড় ফকীহ, সবচেয়ে উত্তম মানুষ এবং লোকদের মধ্যে সবচেয়ে বড় সুস্থ মতের অধিকারিণী।'

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রা.-এর জীবন ইতিহাস এত বিস্তৃত যে, স্বল্প কথায় ইসলামে দাওয়াতের ক্ষেত্রে তাঁর কৃতিত্বের কথা, জ্ঞান ও গুণের কথা আলোচনা করা অসম্ভব। আয়েশা (রা.) এমন এক বিস্ময়কর প্রতিভা, যার বর্ণনা ও মূল্যায়ন কোনো সংক্ষিপ্ত পরিসরে সম্ভব নয়। তিনি ছিলেন ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্রবিন্দু। বিশ্ব নারী জাতির মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ বিদুষী। ধর্মীয় ও পার্থিব উভয় প্রকার জ্ঞানের সমাহার ঘটেছিল তার মাঝে। এক কথায় তুলনাহীন এক দাঈ ইলাল্লাহ।

হজরত উম্মে সুলাইম রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর ভূমিকা

বলিষ্ঠ ঈমানের অলংকারে সজ্জিতা সুদীপ্তা এক নারী উম্মে সুলাইম রাদিয়াল্লাহু আনহা। নবুওয়াতের প্রাথমিক পর্যায়েই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। কিন্তু জীবন সাথী মালিক বিন নজর কিছুতেই ইসলাম গ্রহণ করল না। মালিক বিন নজরের সাথে উম্মে সুলাইমের দাম্পত্য জীবন এত মধুর ছিল যা সেই জামানায় কিংবদন্তীর মতো হয়ে দাঁড়িয়েছিল। উম্মে সুলাইম রাদিয়াল্লাহু আনহা জীবন সাথীকে জীবন দিয়েই ভালবাসতেন কিন্তু তাঁর ঈমান ছিল এত সুদৃঢ় যে, জীবন সাথীর প্রেম, দাম্পত্য জীবনের আকর্ষণ কিছুতেই তাঁকে সত্য পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। ইসলাম গ্রহণ করেই তিনি শিশু পুত্র আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে ধীরে ধীরে ইসলামের পাক কালিমা শিক্ষা দিতে থাকেন। জীবন সাথী মালিক বিন নজর এতে ভীষণ রাগান্বিত হতেন। চাপ দিয়ে ইসলাম থেকে সরানোর চেষ্টা করতেন। একদিন স্বামী মালেক দেখলেন তিনি আনাস কে কালেমা শিখাচ্ছেন। কালেমা শিখাতে দেখে প্রচণ্ডভাবে ক্ষেপে গেলেন মালেক। বললেন, তুমি নিজে তো বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করেছোই এখন বুঝি ছেলেকেও বদ-দ্বীন বানানোর চেষ্টা করছো! হজরত উম্মে সুলাইম (রা.) জবাবে বললেন, আমি চাচ্ছি তুমিও মুসলমান হয়ে যাও। মালেক ইসলাম গ্রহণ করেননি। শেষে রাগ করে নিজেই সরে যায় উম্মে সুলাইম রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর জীবন থেকে। উম্মে সুলাইম রাদিয়াল্লাহু আনহা জীবন সাথীকে খুবই ভালবাসতেন। কিন্তু ইসলামের চেয়ে বেশী নয়। তাই তিনি ধৈর্যের সাথে এই বিপদের মোকাবেলা করেন।

পুত্র আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বয়স যখন দশ বছর তখন তিনি একদিন পুত্রের হাত ধরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসেন এবং পুত্রকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে পেশ করেন। এর কিছু দিন পরেই আবু তালহা তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। আবু তালহা তখনও ইসলাম কবুল করেননি। উম্মে সুলাইম রাদিয়াল্লাহু আনহু শিরকের কারণে প্রথম স্বামীর প্রেমময় সম্পর্কের বিচ্ছেদ বেদনা সহ্য করেছেন। এখন তিনি অন্য একজন মুশরিককে কি করে বিয়ে করতে পারেন? তাই বিনয়ের সাথে তিনি এই প্রস্তাবকে প্রত্যাখান করেন। কিছুদিন পরেই আবু তালহা ইসলাম গ্রহণ করেন এবং উম্মে সুলাইম রাদিয়াল্লাহু আনহা-কে বিয়ের প্রস্তাব দেন। পুত্র আনাসের বয়স তখন ষোল বছর। উম্মে সুলাইম রাদিয়াল্লাহু আনহা আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ইসলাম গ্রহণে এত খুশী হয়েছিলেন যে, তিনি বলেন, 'আবু তালহার সাথে আমার বিয়ের মোহর হবে ইসলাম।' হযরত সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন, 'আমি কোনো মহিলার মোহর উম্মে সুলাইমের থেকে উত্তম ছিল বলে শুনিনি।' আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু উম্মে সুলাইম রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর দাওয়াতেই ঈমান আনেন। যখন আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু উম্মে সুলাইম

রাদিয়াল্লাহু আনহা-কে বিয়ের প্রস্তাব দেন তখন উম্মে সুলাইম রাদিয়াল্লাহু আনহা আবেগঘন কণ্ঠে বলেছিলেন, 'আমি তো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ঈমান এনেছি এবং সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহর রসূল। অবশ্য তোমাদের জন্য আফসোস যে, তোমরা পাথরের বা কাঠের মূর্তির পূজা করো, যা তোমাদের ভাল মন্দ কিছুই করতে পারে না।' এই কথাগুলো এমন হৃদয়গ্রাহী ভঙ্গিতে উচ্চারিত হয়, যাতে ইসলামের সত্যতা আবু তালহার কাছে প্রতিভাত হয় এবং কয়েকদিন চিন্তা করার পর তিনি মুসলমান হন।

আবু তালহা ছিলেন খুবই মামুলী ধরনের লোক। উম্মে সুলাইম রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর দাওয়াতে, উম্মে সুলাইম রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর সংস্পর্শে তিনি হন হযরত আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু; আশারে মুবাশ্বারাদের একজন।

হজরত উম্মে হাকিম রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর ভূমিকা

মক্কা বিজয়ের পর সবাইকে ক্ষমা করে দিলেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দশ জনকে ক্ষমা করেননি। তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছিল, কাবা ঘরের গিলাবের নিচে লুকালেও এদের হত্যা করা হবে। এদের মধ্যে একজন আবু জেহেলের পুত্র ইকরামা। উম্মে হাকাম পূর্ব থেকেই মনে মনে ইসলামের প্রতি দুর্বল ছিলেন, কিন্তু কাফের স্বামীর ভয়ে চুপ করে ছিলেন। মক্কা বিজয়ের পর তিনি প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করেন। এ দিকে মুসলমানদের মক্কা বিজয়ের পর ইকরামার পলায়ন করা ছাড়া আর গত্যন্তর ছিল না। উম্মে হাকাম জীবন সাথীকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। তিনি রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে যেয়ে ইকরামার জীবনের নিরাপত্তার আবেদন জানান। নবীজি তা মঞ্জুর করেন। উম্মে হাকাম রাদিয়াল্লাহু আনহা আবার বলেন, 'আমাকে একটি লিখিত নিরাপত্তা লিপি দিন।' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে তাই দেন। সেই লিখিত নিরাপত্তা-নামা হাতে নিয়ে উম্মে হাকাম রাদিয়াল্লাহু আনহা ইয়েমেনের পথে যাত্রা করেন।

উম্মে হাকাম রাদিয়াল্লাহু আনহা আগেই জানতেন ইকরামা ইয়ামেন যাবে। সেখান থেকে আরব সাগর পার হয়ে চলে যাবে দূর বিদেশে আর হারিয়ে যাবে তাঁর জীবন থেকে। দুনিয়ায় ও আখেরাতেও। তাই ইকরামাকে ফিরিয়ে আনার জন্য জীবনটাই বাজি ধরলেন উম্মে হাকাম রাদিয়াল্লাহু আনহা। ঘোড়া নিয়ে ছুটে চললেন। পাঁচ দিনের রাস্তা দু'দিনে অতিক্রম করলেন। ঘোড়াকে রাস্তায় এক ফোঁটা বিশ্রাম দেননি। অতিরিক্ত পরিশ্রমে ইয়েমেন পৌঁছেই ঘোড়াটি মারা যায়। কিন্তু হায়! যে আত্মীয় বাড়িতে ইকরামার আসার কথা ছিল সেখানে যেয়ে শুনলেন ইকরামা এসেছিল। রাতটা এখানে পার করেই প্রত্যূষে সে চলে গেছে সাগরের দিকে। উম্মে হাকাম রাদিয়াল্লাহু আনহা আর কাল বিলম্ব না করে ছুটে চললেন সাগর পানে। ইকরামা ততক্ষণে পৌঁছে গেছে সাগর পাড়ে। নৌকাও পেয়ে গেছে।

ইকরামা বলল, 'মাঝি, নৌকা ছাড়।' কিন্তু মাঝি বলল, 'আপনি এত অস্থির হচ্ছেন কেন? আর দু'একজন যাত্রী আসুক।' 'না মাঝি, তুমি বুঝতে পারছ না, মুসলমানেরা মক্কা দখল করে নিয়েছে। কাবা'র সব দেবদেবীর মূর্তি ভেঙে চুরমার করে ফেলা হয়েছে। আমি সারা জীবন এদের বিরোধিতা করেছি। আমাকে ধরতে পারলে আমার আর উপায় নেই।' মাঝি মুসলমান, মৃদু হেসে বললেন, 'আপনি আল্লাহর রাসূলের ভয়ে আল্লাহর জমীন ছেড়ে কোথায় যাবেন?'

চমকে উঠল ইকরামা, 'তুমি মুসলমান?'

'হ্যাঁ, তাতে কি? মুসলমান কারো ক্ষতি করে না।'

তারপর দিগন্তের দিকে তাকিয়ে মাঝি আবার বললেন, 'এখনই নৌকা ছাড়ব। ঐ তো মনে হচ্ছে আর একজন যাত্রী আসছে।'

ইকরামা এবার ব্যকুল হয়ে উঠল, 'তুমি তাড়াতাড়ি নৌকা ছাড় মাঝি, এ লোক নিশ্চয়ই আমাকে ধরার জন্য আসছে। আমি তোমাকে তিন গুণ ভাড়া দিয়ে দেব।' মাঝি বলেলন, 'থামুন। মনে তো হচ্ছে অশ্বারোহী একজন নারী। আপনি তো বীর পুরুষ! হাতে তরবারিও আছে। একজন নারীকে এত ভয় পাওয়ার কি আছে?' ততক্ষণে অশ্বারোহিণী আরো কাছে চলে এসেছে। ইকরামা চিনতে পারল উম্মে হাকাম রাদিয়াল্লাহু আনহা-কে। উম্মে হাকাম রাদিয়াল্লাহু আনহা কাছে এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর লিখিত নিরাপত্তানামা দেখিয়ে বলল, 'চল, মক্কায় ফিরে চল।' ইকরামা তার পরও একটু ইতস্তত করছে দেখে মাঝি বলেলন, 'আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকে নিরাপত্তা দেন তার তো কোন ভয় থাকতে পারে না বন্ধু। তুমি ফিরে যাও তোমার দেশে।'

উম্মে হাকাম রাদিয়াল্লাহু আনহা, ইকরামা এবার ফিরে এল ধীর গতিতে। প্রথমে ইয়েমেনে সেই আত্মীয়ের বাড়ি। রাতে থাকার সময় এক ঘরে থাকতে অস্বীকার করলেন উম্মে হাকাম রাদিয়াল্লাহু আনহা। ইকরামা কারণ জানতে চাইলে দীপ্ত কণ্ঠে বললন, 'আমি মুসলমান আর তুমি এখনও মুশরেক। তোমার সাথে আমার বিবাহ বন্ধন আছে কিনা আমি জানি না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুমতি ছাড়া তোমার সাথে আমি একত্রে বসবাস করতে পারব না।'

অবাক হলেও ইকরামা চুপ করে থাকল এই সিদ্ধান্তে। পরদিন তাঁরা পৌঁছলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে। ইকরামা তওবা করে মুসলমান হলুেন। পেছনের সকল পাপ থেকে পরিশুদ্ধ হলেন। হয়ে গেলেন হযরত ইকরামা রাদিয়াল্লাহু আনহু। এ সময় উম্মে হাকাম রাদিয়াল্লাহু আনহা জিজ্ঞেস করলেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাদের বিবাহ সম্পর্ক কি ঠিক আছে?' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেলন, 'হ্যাঁ, ঠিক আছে।' অত্যন্ত স্পষ্টভাষী ও সৎ সাহসের অধিকারিণী ছিলেন এই নারী।

প্রাণপ্রিয় জীবন সাথীকে ফিরিয়ে আনার জন্য জীবনের মায়া পরিত্যাগ করে ছুটে গিয়েছেন দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে, অথচ ইসলামী শরিয়তে অনুমোদন আছে কিনা সেই ভয়ে তিনি তাঁর সাথে একান্তে বসবাসে রাজী হননি। যে ইকরামা ছিল ইসলামের জঘন্য শত্রু, এই নারীর প্রভাবে সেই ইকরামা ইসলামের জন্যই প্রাণ দিলেন। শহীদ হলেন।

সাফনাহ বিন্তে হাতিম তাঈ রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর ভূমিকা

আদী ইবনে হাতিম তাঈ রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলাম গ্রহণ করেন তার ছোট বোন সাফনাহ বিন্তে হাতিম তাঈ রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর দাওয়াত, উৎসাহ ও প্রেরণায়। আরবের প্রসিদ্ধ দাতা হাতিম তাঈ ইয়ামেনের তাঈ গোত্রের সর্দার ছিলেন। তিনি নিজের গোত্রসহ খৃস্ট ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুয়ত প্রাপ্তির কিছু দিন পূর্বেই তিনি ইন্তেকাল করেন। তার কন্যা হযরত সাফনাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা বাপের মতোই নির্ভীক ও দানশীলা মহিলা ছিলেন।

ইয়েমেনের লোকেরা দীর্ঘদিন থেকে মুসলমানদের সাথে শত্রুতা করে আসছিল। নবম হিজরতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নেতৃত্বে একটি ছোট বাহিনী বনু তাঈতে প্রেরণ করেন। আক্রমণের কথা শুনে তাঈ গোত্রের তৎকালীন সর্দার আদী ইবনে হাতিম পরিবার-পরিজন নিয়ে সিরিয়ায় চলে যান এবং জোশিয়াহ নামক পল্লীতে বসবাস শুরু করেন। যাওয়ার সময় তাড়াহুড়া করাতে ছোট বোনকে সাথে নিতে পারেননি। বোন সাফনাহ মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়ে মদীনায় আসেন।

সাফনাহ ছিলেন অত্যন্ত সৎ সাহসের অধিকারিণী ও বুদ্ধিমতী। তিনি মোটেও ভীত হলেন না, কান্নাকাটি করলেন না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বন্দীদের দেখতে আসলেন তখন সাফনাহ এগিয়ে গিয়ে আদবের সাথে বলেলন, হে কুরাইশ সর্দার! আমি বন্ধু-বান্ধবহীন ও সহায়হীন। আমার ওপর রহম করুন। পিতার স্নেহের ছায়া আমার ওপর থেকে উঠে গেছে। আমি আমার পিতার বড় আদরের দুলালী ছিলাম। আমাকে ফেলে আমার ভাই পালিয়ে গেছে। আমার পিতা বনু তাঈ-এর সর্দার ছিলেন। তিনি ক্ষুধার্তদের আহার করাতেন, এতীমদের অভিভাবকত্ব নিতেন, অভাবগ্রস্তদের অভাব দূর করতেন, মজলুমদের সাহায্য করতেন, জুলুমের মূল উৎপাটন করতেন। কোনো ভিক্ষুককে খালি হাতে যেতে দিতেন না। আমি সেই হাতিম তাঈ-এর কন্যা। আমি কোনোদিন কোনো মানুষের কাছে অনুগ্রহ চাইনি। আপনি ভাল মনে করলে আমাকে আজাদ করে দিতে পারেন। আমাকে যিনি মুক্ত করাবেন তিনি নেই। এজন্য আপনি নিজেই আমার ওপর রহম করুন। আল্লাহ আপনার ওপর ইহসান করবেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফনাহর কথা মনোযোগ সহকারে শুনে বললেন, 'হে নারী! তোমার পিতার যে গুণাবলী তুমি বর্ণনা করেছ তাতো মুসলমানের গুণাবলী। যদি তোমার পিতা জীবিত থাকতেন তাহলে আমরা তার সাথে ভালো আচরণ করতাম।'

এরপর তিনি সাহাবাদের নির্দেশ দিলেন, 'এই মহিলাকে আজাদ করে দাও। সে একজন সম্ভ্রান্ত ও উত্তম চরিত্রের পিতার সন্তান। কোন সম্ভ্রান্ত মানুষ অপমানিত হলে, কোন বিত্তবান ব্যক্তি অভাবগ্রস্ত হলে তার প্রতি ইহসান করো।'

সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম তৎক্ষণাৎ সাফনাহকে বন্ধনমুক্ত করে দিলেন। কিন্তু তিনি একই স্থানে দাঁড়িয়ে রইলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আরো কিছু বলবে?

সাফনাহ আবেগের সাথে আরজ করলেন, 'হে দয়ালু ব্যক্তি, আমি যে পিতার কন্যা তিনি কওমকে মুসিবতে রেখে নিজে সুখের নিদ্রা যাওয়া মোটেও পছন্দ করতেন না। আমি তার মেয়ে হয়ে কি করে কওমকে ফেলে যেতে পারি? আপনি আমার ওপর দয়া করেছেন, আমার কওমের ওপরও দয়া করুন। আল্লাহ আপনাকে পুরস্কৃত করবেন।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফনাহর কথা শুনে খুব প্রভাবিত হলেন এবং তাঈ গোত্রের সকল কয়েদীকে মুক্ত করে দিলেন। সাফনাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা জানতেন তার ভাই জোশিয়ায় আছে। ভাই আদী ইবনে হাতিম তাড়াহুড়ার মধ্যে বোনকে ফেলে এসেছিলেন ঠিকই, কিন্তু এরপর অত্যন্ত মনোকষ্টের মধ্যে দিনাতিপাত করছিলেন। আদীর ভাই বোনের সাক্ষাত কিভাবে হলো তা আদীর ভাষাতে এরূপ, 'জোশিয়ায় একদিন আমাদের গৃহের সামনে একটি উট এসে থামল। হাওদার ওপর একজন নেকাব আবৃতা মহিলা বসে ছিলেন। আমার সন্দেহ হলো আমার বোন মনে হয়। কিন্তু তা কি করে হবে? তাকে তো মুসলমানেরা গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেছে। সে এ রকম জাঁকজমকের সাথে কি করে আসতে পারে? ঠিক সেই সময় হাওদার পর্দা উঠল। সঙ্গে সঙ্গে আমার কানে এল, 'হে জালিম, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী, তোমার ওপর থুতু নিক্ষেপ করি। নিজের পরিবার-পরিজন নিয়ে এসেছ আর পিতার মেয়েকে শত্রুর হাতে ছেড়ে এসেছ। তাঈ বংশের কলংক তুমি!'

সহোদরার কথা শুনে আমি খুবই লজ্জিত হলাম। নিজের ভুল স্বীকার কররাম, ক্ষমা চাইলাম। বোনকে ফিরে পাওয়ার আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলাম। কিছুক্ষণ আরাম- বিশ্রামের পর আমি সাফনাহকে বললাম, 'বোন, তুমি তো খুব হুশিয়ার আর বুদ্ধিমতী। তুমি সেই কুরাইশের সাথে মোলাকাত করেছ। তুমি আমাকে সিদ্ধান্ত দাও কি করব।' বোনটি জবাব দিল, 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তুমি তাঁর সাথে সাক্ষাত কর। যদি তিনি নবী হন তাহলে তাঁর সংগে সাক্ষাতের জন্য অগ্রগামী হওয়া মর্যাদা ও সৌভাগ্যের ব্যাপার। আর যদি বাদশাহ হন

তাহলেও ইয়ামানের কেউ কিছু করতে পারবে না এবং আগুয়ান হয়ে সাক্ষাত করাতে তোমার মান-মর্যাদা বৃদ্ধি পেতে পারে।'

সাফনাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর পরামর্শ অনুযায়ী আদী ইবনে হাতেম তাঈ মদীনায় পৌঁছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট উপস্থিত হলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। সাফনাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা তো আগেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কেমন সৌভাগ্যবতী, বুদ্ধিমতী, প্রত্যুৎপন্নমতি মহিলা যাঁর উসিলায় গোটা তাঈ গোত্র ও আদী ইবনে হাতিম রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মত বিচক্ষণ ব্যক্তি ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় পেলেন!

নাম না-জানা এক বেদুঈন কন্যার দাওয়াতী কাজ

এবার নাম না-জানা এক সাহাবীর কথা উল্লেখ করা যাক। তিনি তৎকালীন সম্ভ্রান্ত বংশের কেউ ছিলেন না। তিনি ছিলেন যাযাবর এক বেদুঈন কন্যা। ফেরি করে প্রসাধনী বিক্রি করতেন যার কারণে সম্ভ্রান্ত কুরাইশদের বাড়ির অভ্যন্তরেও তিনি যেতে পারতেন। তিনি বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রসাধনী ও সুগন্ধী বিক্রি করতেন, সেই সাথে মহিলাদের কাছে হৃদয়গ্রাহী ভাষায় ইসলামের দাওয়াত দিতেন। আর এভাবেই কুবাইশদের কঠিন প্রহরা ভেদ করে তাদের গৃহাভ্যন্তরে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে যায়। বেশ কিছু কুরাইশ মহিলা ইসলাম গ্রহণ করে। হুদায়বিয়ার সন্ধির পর কিছু মহিলা পালিয়ে স্বামী, সন্তান, সংসার, নিরাপত্তা সব ত্যাগ করে মক্কা থেকে মদীনায় চলে যান। এ ঘটনায় কুরাইশরা দিশেহারা হয়ে পড়ে। কিভাবে তাদের নারীদের কাছে এই দাওয়াত পৌঁছাল তার অনুসন্ধান করতে থাকে। কিছু দিনের মধ্যেই কুরাইশ সরদারদের কাছে বিষয়টি জানাজানি হয়ে যায়। একদিন কুরাইশদের পাষণ্ড নেতারা তাঁর সব পণ্যদ্রব্য ছিনিয়ে নিয়ে ফেলে দেয়। তাঁকে ভীষণভাবে মার-ধর করে, তারপর একটি উটের সাথে বেঁধে উটটিকে মরুভূমির দিকে তাড়িয়ে দেয়। উটটি মরুভূমির দিকে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াতে থাকে। তিনি বলেন, আমি জীবনের আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম, তবু চিৎকার করে আল্লাহর সাহায্য চাচ্ছিলাম। মহান আল্লাহ আমাকে রহম করলেন। কিছু রহমদীল মানুষের মাধ্যমে আমাকে সাহায্য করলেন। মদীনাগামী একটি কাফেলা আমাকে বহনকারী উটটিকে ধরে ফেলে এবং আমাকে উদ্ধার করে ফাতেমা বিনতে খাত্তাব (রা.)-এর হাতে সোপর্দ করেন।

তাবেয়ী যুগে ইসলাম প্রচারে মুসলিম নারীদের ভূমিকা

মুসলিম বিশ্বের উপর বড় দুটি ফেতনা এবং ঝড় এসেছে, যা তার ভিত্তি মূলে আঘাত করেছে। একটিকে সামলে নিয়ে ইসলাম আবার পথ চলেছে আর অন্যটি প্রতিরোধ করার মতো শক্তি, সামর্থ্য অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। প্রথমটি তাতারী ফিতনা দ্বিতীয়টি পশ্চিমা আগ্রাসন যা শিল্পবিপ্লবের পরে শুরু হয়।

তাবেয়ী যুগে আব্বাসীয় খিলাফতের সময় তাতারীরা মুসলিমদের সবকিছুই ধ্বংস করেছিল। ইসলামের ইতিহাসে মুসলিম বিশ্বের উপর যত বিপদ ও দুর্যোগ নেমে এসেছে তার মধ্যে তাতারী হামলাই ছিলো সবচেয়ে ভয়াবহ ও মর্মন্তুদ। তাতারীরা পূর্ব দিক থেকে পঙ্গপালের মত ধেয়ে এসেছিলো এবং সমগ্র মুসলিম জাহান ছেয়ে গিয়েছিলো।

হিজরী সপ্তম শতকে আব্বাসি খেলাফতের বাহিরে খাওয়ারিযম শাহী সালতানাত ছিলো খুবই প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী। সুলতান আলাউদ্দিন মুহাম্মাদ খাওয়ারিযম শাহ ছিলেন সৎ,দীনদার, বীর ও দৃঢ়চেতা শাসক। তা সত্বেও এই সাম্রাজ্যও তাতারীদের গতিরোধ করতে সক্ষম হয়নি। ফলে প্রাচ্য ভুখন্ডে তাতারীদের প্রতিরোধ করার মতো তখন আর কোন শক্তি ছিলো না। ইরান ও তুর্কিস্তান তছনছ করার পরে তাতারীরা 'দারুল খিলাফত' বাগদাদের দিকে শ্যেনদৃষ্টিতে তাকায় এবং ৬৫৬ হিজরীতে চেঙ্গিস খানের পৌত্র হালাকু খান বাগদাদ আক্রমণ করে বসে।

ঐতিহাসিকগণ বাগদাদ ধ্বংসের ইতিহাস লিখতে গিয়ে মনোবেদনা ও হৃদয়-যন্ত্রণা চেপে রাখতে পারেননি। ইবন কাসির লেখেন, ৪০ দিন পর্যন্ত বাগদাদে গণহত্যা ও ধ্বংসের রাজত্ব চলে। নগর-উদ্যান, যা পৃথিবীর সুন্দরতম ও সমৃদ্ধতম নগর ছিলো, এমন ধ্বংস ও বিরান হয় যে, ওলিতেগলিতে লাশের স্তুপ পড়ে থাকে।
ইতিহাস সাক্ষী যে এই দুর্ধর্ষ বর্বর তাতারী জাতি ইসলাম গ্রহণ করেছে মুসলিম নারীদের দাওয়াত ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়। চেংগিস খানের নাতী হালাকু খান যখন বাগদাদ আক্রমণ করে তখন বাগদাদের খলিফা ও আমীর-ওমরা ছিল আরাম-আয়েশ ও অবৈধ ভোগ-বিলাসে লিপ্ত। এমন সময় ঝড়ের তাণ্ডব নিয়ে নাযিল হয় হালাকু খান। বাগদাদের ওপর বয়ে যায় প্রচন্ড ধ্বংসলীলা। বিশ লাখ মানুষের মধ্যে চার লাখ কোনোমতে জান নিয়ে পালাতে সক্ষম হয়। দজলার পানি রক্তে রঙিন হয়ে যায়। পাঠাগার, মাদ্রাসা, বাড়ি-ঘর সব আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। বছরের পর বছর ধরে যারা শিয়া-সুন্নী নিয়ে বিতর্ক করে একে অপরকে কাফের বানাতে ব্যস্ত ছিল সেই ওমরা ও ওলামাদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়।

খিলাফতে আব্বাসিয়ার শেষ বংশধরকে সহজভাবে হত্যা না করে হাতির পায়ের তলায় পিষ্ট করা হয়। তারপর হালাকু খান ফিরে যাওয়ার আগে দজলা নদীর বাঁধ ভেঙে দিয়ে যায়। সাথে করে নিয়ে যায় অজস্র ধন-সম্পদ, হিরা-জহরত আর বাগদাদের কয়েক সহস্র অপূর্ব সুন্দরী মুসলিম নারী।

এই নারীরা ইসলামের অবক্ষয়ের মধ্যে লালিত-পালিত হলেও ইসলামের শিক্ষা থেকে তখনো একেবারে দূরে সরে যায়নি। তাই তো তারা শীলাদেবীদের মতো আত্মহত্যার পথ বেছে না নিয়ে সবর করেছে এবং হেকমতের সাথে পরিস্থিতির মোকাবেলা করেছে। তাতারীদের ঘরে-ঘরে দাসী হিসেবে তারা গিয়ে থেমে থাকেনি বরং দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করতে থাকে। তাতারীদের সন্তানদের উপরে মেহনত চালিয়েছে, তাতারীদের কাছে তুলে ধরেছে ইসলামের সৌন্দর্য; তাতারীদের মধ্যে ইসলাম গ্রহণের ধারা শুরু হয়। ইসলাম গ্রহণ করে চেংগিস খানের পরবর্তী বংশধররা এবং মহান আল্লাহতালার ফজল-করম, অনুগ্রহ-অনুকম্পায় এক সময় সমস্ত তাতারী জাতি ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আগমণ করেন। বিজয়ী হয়ে পরাজিতের ধর্ম গ্রহণের নজির বিশ্ব-ইতিহাসে এটাই প্রথম।

যুগ পরিবর্তনের অস্ত্র এই নারীমসাজ। নারীরাই ছিলো মূল নিয়ামক এদের ইসলামে প্রবেশে। যে চেংগিস খান বলত, 'তোমরা আল্লাহর গযবকে ভয় করো, তাই না? আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর গযব হয়ে এসেছি।' তাদেরই পরবর্তী মুসলিম রূপ মোঘল বংশ। যাদের হাত এক সময় মুসলিমদের রক্তে রঞ্জিত হয় তাদের হাতেই ‘তাসবিহ’ শোভা পায়।

ইসলামের জন্য অবর্ণনীয় ত্যাগ স্বীকার

ইসলামের জন্য পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের ত্যাগ-তিতিক্ষা কোন অংশে কম ছিল না। ইতিহাস খুললে দেখা যাবে ইসলামের জন্য শত শত নারীর আত্মত্যাগে ভরপুর ইতিহাসের পাতা। ইসলামের অনুসারীদের ওপর কঠিন থেকে কঠিনতর দুর্যোগের সময় অতিবাহিত হয়েছে। এমন কোনো ধরনের নির্যাতন নেই, যা তাদের ওপর চালানো হয়নি। পুরুষ সাহাবাগণের সাথে মহিলা সাহাবাগণকেও অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট ও জুলুম- অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে।

হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা

আল্লাহর পথে সংগ্রাম শুধু জীবন দিয়ে হয় না। এখানে জীবনের সাথে মালও অপরিহার্য। আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে বলেছেন-

لن تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مما تُحبُّونَ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيم ٌ

'তোমরা নেকী অর্জন করতে পারো না, যতক্ষণ না তোমাদের প্রিয় বস্তুগুলোকে আল্লাহর পথে ব্যয় করো। আর তোমরা যা ব্যয় করবে আল্লাহ তা বেখবর থাকবেন না।' (সূরা আল ইমরান: আয়াত ৯২)

খাদিজা (রা) ইসলাম গ্রহণের পর তার সকল ধন-সম্পদ তাবলীগে দ্বীনের লক্ষ্যে ওয়াকফ করেন। আল্লাহ তাকে যে প্রচুর ঐশ্বর্য দান করেছিলেন, তা তিনি বিলিয়ে দিয়েছিলেন আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠা করার জন্য। নিজেকে সম্পদের অধিকারী মনে করলে খাদিজা (রা) এ বিরাট ত্যাগের দৃষ্টান্ত দুনিয়ায় রেখে যেতে পারতেন কি না তাতে সন্দেহ রয়েছে। তিনি কখনো নিজেকে বহুকষ্টে অর্জিত বিপুল ঐশ্বর্যের মালিক মনে করতেন না। তার ঈমান ছিল প্রগাঢ়। তাইতো তিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন আসমান ও জমিনের মালিক একমাত্র আল্লাহ এবং যাবতীয় অধিকার শুধু তাঁর। মানুষ শুধু আমানতদার হিসেবে উপার্জিত সম্পদ ব্যয় করে যাবে। সম্পদের যথেচ্ছা খরচের এক বিন্দু স্বাধীনতাও তার নেই। খাদিজা (রা) নত মস্তকে মেনে নিলেন সম্পদ ব্যয় করার আসমানি নীতি। তিনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশ জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অক্ষরে অক্ষরে পালন করে গেছেন। তাই আদর্শের প্রতি শুধু বিশ্বাস নয়, মুখে শুধু 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ উচ্চারণই নয়, নবীর উপস্থাপিত আদর্শের রূপায়ণের জন্য অকৃপণ হস্তে

নিজের অঢেল সম্পদ ব্যয় করে আরবের ধনীশ্রেষ্ঠা এ মহিলাটি সব যুগের আদর্শবাদীদের জন্য এক উদাহরণ স্থাপন করে গেছেন।

তিনি ইসলামের দাওয়াতের পথেও সর্বাবস্থায় ধৈর্যধারণ করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পাশে ছিলেন।
রাসূল ব্যবসা-বাণিজ্য ছেড়ে আল্লাহর ইবাদত এবং ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। সংসারের সব আয় বন্ধ হয়ে যায়। সেই সাথে বাড়তে থাকে খাদিজার দুঃশ্চিন্তা। তিনি ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে সব প্রতিকূল অবস্থার মোকাবিলা করেন। যখনই কোনো অবাঞ্ছিত অবস্থার সৃষ্টি হতো, কেউ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করত ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করত, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মর্মাহত হতেন। কিন্তু খাদিজা (রা)-এর কাছে গেলেই আল্লাহর ইচ্ছায় তার মনঃকষ্ট দূর হয়ে যেত। খাদিজা (রা) তার দুঃখকে হালকা করে দিতেন। তার দাওয়াতকে সম্পূর্ণ সত্য বলে স্বীকৃতি দিতেন এবং মানুষের আচরণকে যাতে তিনি হালকাভাবে গ্রহণ করেন, সেজন্য অনুপ্রাণিত করতেন।

নবুয়্যতের ৭ম বছরে মুহাররম মাসে কুরাইশরা মুসলমানদের বয়কট করে। তারা শিয়াবে আবু তালিবে আশ্রয় গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে খাদিজা (রা)-ও সেখানে অন্তরিন হন। প্রায় তিনটি বছর বনী হাশিম দারুণ দুর্ভিক্ষের মাঝে অতিবাহিত করে। গাছের পাতা ছাড়া জীবন ধারণের আর কোনো ব্যবস্থা তাদের ছিল না। স্বামীর সাথে খাদিজা (রা)-ও হাসিমুখে সে কষ্ট সহ্য করেন।

আসমা বিনতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহা

হিজরতের আগে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ঘরে তাশরীফ আনলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বললেন, আবু বকর! আমি একটু একা থাকতে চাচ্ছি। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমার ঘরে আমার স্ত্রী আর দুই কন্যা ছাড়া আর কেউ নেই। তাদের দ্বারা কোনো কথা বাহিরে যাওয়ার আশংকা নেই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বললেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে হিজরতের হুকুম হয়েছে। হিজরতের কথা শুনে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মেয়ে হজরত আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা হিজরতের পথের পাথেয় তৈরী করতে মগ্ন হয়ে গেলেন। তিনি তার চাদর ছিঁড়ে দু টুকরো করে একটি গাট্টি বেঁধে সফর সামগ্রী গুছিয়ে দিলেন। তার পর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে সঙ্গে নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরতের পথে বেরিয়ে পড়লেন। হজরত আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন একজন মহিলা তারপরও আমরা তাকে পিতার দ্বীনি বিষয়ে একজন উত্তম সহযোগী হিসাবে দেখতে পাই।

সফরে বের হওয়ার আগে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর স্ত্রীকে বললেন, তুমি আমার জন্য খাবার তৈরী করে দিবে। গোলাম ফাহির রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বললেন, তুমি ছাগল চরাবে এবং ছাগল চরানোর বাহানা করে 'গারে ছুরে'-ছুর গুহায়- আমাদেরকে দুধপান করাবে। ছেলে আব্দুর রহমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বললেন, তুমি সারাদিন মক্কার কুরাইশদের খোঁজ-খবর নিবে এবং রাতে গুহায় এসে আমাদেরকে বিস্তারিত জানাবে। মেয়ে আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা-কে বললেন, তুমি ছোট মানুষ তোমাকে কেউ সন্দেহ করবে না। তুমি গুহায় আমাদের কাছে খাবার পৌছে দিবে। আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, আব্বা আমি অবশ্যই খাবার পৌছাবো।

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সফরে বের হওয়ার পর তার পিতা আবু কুহাফা আসেন। তিনি তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি। তিনি দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। ঘরে এসে জিজ্ঞেস করলেন, আবু বকর কি চলে গেছে? ছেলে-মেয়েরা বললো, হ্যাঁ তিনি চলে গেছেন। পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের জন্য কি কিছু রেখে গেছে?

হজরত আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন বিচক্ষণ ও জ্ঞানী। তিনি একটি কাপড়ের থলেতে কতগুলো পাথর একত্রিত করে বললেন, দাদাজী! একটু হাত দিয়ে দেখো এই থলেতে বাবা

আমাদের জন্য অনেক কিছু রেখে গেছেন। আবু কুহাফা হাত দিয়ে মনে করলেন থলেতে অনেক টাকা পয়সা রেখে গেছেন আবু বকর। তাই আবু কুহাফা আশ্বস্ত হলেন। তার চিন্তা কিছুটা লাঘব হলো।

গভীর চিন্তা ও উপলব্ধির বিষয়! আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা ছোট্ট এক কিশোরী। দাদাকে কী চমৎকার সান্ত্বনা দিলেন! হিজরতের মতো দ্বীনের এত উঁচু একটি বিষয়ে তার কী অসাধারণ ভূমিকা!

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কথা মতো প্রথম দিন আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা গুহায় খাবার পৌঁছালেন। দ্বিতীয় দিন যখন খাবার দিতে গেলেন তখন তাঁকে খুব বিষণ্ন মনে হলো, চেহারা কেমন যেনো মলিন হয়ে আছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আসমা! আজ তোমার মন খারাপ কেনো? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথায় আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহু কেঁদে ফেললেন। বললেন, হে আল্লাহর হাবীব! গতকাল আপনাদেরকে খাবার দিয়ে ফেরার পথে রাস্তায় আবু জেহেলের সঙ্গে দেখা হয়। সে আমাকে বলে, এই আবু বকরের মেয়ে। তুমি জানো তোমার নবী কোথায়? আমি সত্য কথা বলি, হ্যাঁ আমি জানি। এ কথা বলার পর সে আমার চুল আঁকড়ে ধরে বলে, তাড়াতাড়ি বল নবী কোথায়? আমি বললাম, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথায় এ ব্যাপারে আমি কিছুই বলবো না। সে আমাকে বলে, যদি না বলো তা হলে আমি তোমাকে কঠিন শাস্তি দিবো। আমি বলি, তোমার যা খুশি করতে পারো তবে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথায় আমি তা বলবো না। আমার কথা শুনে সে আমাকে অনেক জোরে থাপ্পড় মারে, ফলে আমি মাটিতে লুটিয়ে পড়ি। আমার কপাল থেকে রক্ত বের হতে থাকে। আমার চোখ দিয়ে পানি পড়তে থাকে। এর পর সে আমার মাথার চুল ধরে সোজা দাঁড় করিয়ে বলে, তোকে আরো অনেক মারবো। বল! তোর নবী কোথায়? আমি কেঁদে কেঁদে বলি, আবু জেহেল! আমার জীবন তো তোর হাতে দিয়ে দিয়েছি। কিন্তু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে তোর হাতে দিবো না। আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর এ সব কথা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আবু বকর আমি সবার অনুগ্রহের বদলা দুনিয়ায় দিয়ে দেবো কিন্তু তোমার অনুগ্রহের বদলা কিয়ামতের দিন স্বয়ং আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন দিবেন।

সুবহানাল্লাহ! হিজরতের সফলতার পিছনে এক কিশোরী কি অসাধারণ ভূমিকাই না রেখেছেন।

উম্মু সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা

ইসলাম গ্রহণ করার পর উম্মু সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা-কে অবনীয় কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। স্বামী আবদুল্লাহ বিন আবুল আসাদের সঙ্গে তিনি রিসালাতে মুহাম্মদীর শুরুতেই ইসলাম কবুল করেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশে হাবশায় হিজরত করেন। সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে তারা মক্কা নগরীতে বসবাস শুরু করেন। মক্কার সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির গুরুতর অবনতি ঘটাতে অন্যান্য মুসলমানদের মতো তারাও মদীনায় হিজরত করতে মনস্থ করেন। কিন্তু মক্কার কাফেরগণ তাদের দেশত্যাগ করতে দিতে চাইল না। তাই উম্মু সালামা (রা.)-এর মদীনায় হিজরতের যাত্রা ছিল অত্যন্ত বন্ধুর ও হৃদয়বিদারক।

মদীনায় হিজরতকালে উম্মু সালামা (রা) যে করুণ পরিস্থিতির শিকার হয়েছিলেন, তা তারই ভাষ্যে ঐতিহাসিক ইবনুল আছীর স্বীয় গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। উম্মে সালামা (রা.) বলেন, ‘আবু সালামা (রা.) মদীনায় হিজরতের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তার কাছে ছিল তখন একটি মাত্র উট। তিনি সেই উটের পিঠে আমাকে ও ছেলে সালামাকে বসিয়ে দেন। তারপর নিজে উটের লাগাম ধরে যাত্রা শুরু করেন। আমার পিতৃবংশ বনু মুগীরার লোকেরা আমাকে বাধা দিয়ে বলল, 'এরকম খারাপ অবস্থায় আমরা আমাদের মেয়েকে যেতে দেবো না।' আমাকে তারা ছিনিয়ে নিল। ইতোমধ্যে স্বামীর খান্দান তথা বনু আব্দিল আসাদের লোকেরা এসে পুত্র সালামাকে তাদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়। তারা বনু মুগীরাকে বলল, তোমরা যদি তোমাদের মেয়েকে তার স্বামীর সাথে যেতে বাধা দাও, তাহলে আমরাও এ সন্তানকে মায়ের সাথে যেতে দেবো না। এভাবে আমি সন্তান ও স্বামী হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম। শোকে-দুঃখে আমার অবস্থা কাহিল। হিজরতের হুকুম হয়েছিল বিধায় আবু সালামা মদীনায় চলে যান। মক্কায় আমি একা পড়ে যাই। প্রত্যহ সকালে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে পড়তাম এবং আবতাহ উপত্যকায় একটি টিলার ওপর বসে সন্ধ্যা অবধি ক্রন্দন করতাম। প্রায় সাত-আট দিন এই অবস্থায় কাটে।

এরই মধ্যে একদা আমাদের শুভানুধ্যায়ী বনু মুগীরার জনৈক ব্যক্তি আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমার এ দুরবস্থা দেখে তিনি ভীষণ দুঃখ পেলেন। বনু মুগীরার লোকদেরকে একত্র করে বললেন, কেন আপনারা এ অসহায় মেয়েটিকে মুক্তি দিচ্ছেন না? তাকে মুক্তি দিন। তার একথাগুলো খুব প্রভাব ফেলে। গোত্রীয় লোকদের অন্তরে দয়ার উদ্রেক হলো। ফলে তারা আমাকে স্বামীর কাছে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করল। এ সংবাদ শুনে আব্দুল

আসাদও আমার সন্তানকে ফিরিয়ে দিল। আমি সন্তানকে কোলে নিয়ে উটের পিঠে আরোহণ করে মদীনার উদ্দেশ্যে একাকী রওনা হলাম।'

পরে উসমান ইবনে আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু এর সহযোগিতায় তিনি তার স্বামীর কাছে মদিনায় পৌঁছেন।

তৎকালীন সময়ে চারিদিক থেকে মুসলমানরা নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার হচ্ছিল এবং তাদের দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনার কোন অন্ত ছিল না। হিজরাতের সময় উম্মু সালামাকে যে দুর্ভোগ পেহাতে হয় এ তারই কিছু অংশমাত্র। পরবর্তীকালে হিজরাতের প্রসঙ্গ উঠলেই তিনি বলতেনঃ 'ইসলামের জন্য আবু সালামার পরিবারকে যে দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে, আহলে বাইতের আর কেউ তেমন পোহায়েছে কিনা তা আমার জানা নেই।

যয়নাব বিনতে রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বড় কন্যা। মাতা ছিলেন খাদিজাতুল কুবরা (রা.)। রিসালাতের সূর্য মক্কার আসমানে উদিত হলে যয়নাব (রা.) বিনা দ্বিধায় ইসলাম কবুল করে সাবেকুনাল আউয়ালুন তথা সর্বাগ্রে অগ্রগামীদের সারিতে শামিল হন। স্বামী আবুল আস তখন ইসলাম গ্রহণ করেননি। স্বামী আবুল আসের ভালোবাসা তার ইসলাম গ্রহণের পথে বাধা হতে পারেনি।

স্বামী আবুল আসের প্রতি গভীর ভালোবাসা থাকার পরও যয়নাব (রা.) শুধু ইসলামের জন্য তাকে রেখেই মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেন।
আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মেয়ে যয়নাব কিনানার সাথে মক্কা থেকে মদীনার উদ্দেশ্যে বের হলো। মক্কাবাসীরা তাদের পিছু ধাওয়া করল। হাব্বার ইবনুল আসওয়াদ সর্বপ্রথম যয়নাব (রা.)-কে ধরে ফেলল। সে যয়নাবের উটটি তীরবিদ্ধ করলে সে পড়ে গিয়ে আঘাত পেল। সে সন্তানসম্ভবা ছিল। এই আঘাতে তার গর্ভের সন্তান নষ্ট হয়ে যায়। অতঃপর বনু হাশিম ও বনু উমাইয়্যা তাকে নিয়ে বিবাদ শুরু করে দিলো। অবশেষে সে হিন্দা বিনত উতবার নিকট থাকতে লাগল। হিন্দা প্রায়ই তাকে বলত, তোমার এ বিপদ তোমার বাবার জন্যই হয়েছে।
উটের পিঠ থেকে ফেলে দেওয়ায় তিনি যে আঘাত পান, আমরণ সেখানে ব্যথা অনুভব করতেন এবং সেই ব্যথায় শেষ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করেন। এজন্য তাকে শহীদ মনে করা হতো।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায়ই বলতেন, 'সে ছিল আমার সবচেয়ে ভালো মেয়ে, আমাকে ভালোবাসার কারণেই তাকে কষ্ট পেতে হয়েছে।'

ইমাম আয-যাহাবী বলেন, 'যয়নাব হলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মেয়ে এবং তার হিজরতকারী সায়্যিদাত বোনদের মধ্যে সবার বড়।’

উম্মু শুরাইক রাদিয়াল্লাহু আনহা

উম্মু শুরাইক (রা.) প্রাথমিক পর্যায়ে ইসলাম কবুল করেন। নিজে ইসলাম গ্রহণ করেই চুপচাপ বসে থাকলেন না। বরং অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে কুরাইশ মহিলাদেরকেও ইসলামের দাওয়াত প্রদান শুরু করলেন।

উম্মু শুরাইক (রা.) ইসলাম গ্রহণ করলে মুশরিক আত্মীয়স্বজনেরা তাকে প্রখর রোদে দাঁড় করিয়ে দিত। তারপর তারা রুটির সঙ্গে তাকে মধু খাওয়াতো। ফলে তার শরীর খুবই গরম হতো। তাকে পানি দেওয়া হতো না। এমনিভাবে তিনদিন অতিবাহিত হওয়ার পর মুশরিকরা তাকে নতুন দ্বীন পরিত্যাগের কথা বলত। তিনদিন ও তিনরাতের নির্যাতনে তিনি অনেকটা জ্ঞানহীন হয়ে পড়তেন। মুশরিকদের কথার অর্থ তিনি বুঝতে পারতেন না। যখন তারা আসমানের দিকে ইঙ্গিত করত তখন তিনি বুঝতে পারতেন যে, তারা তাওহীদ অস্বীকার করার কথা বলেছে। তৎক্ষণাৎ তিনি বলে উঠতেন, 'আল্লাহর কসম! আমি তো ঐ বিশ্বাসের ওপরই রয়েছি।'

জুনাইরা রুমিয়্যা রাদিয়াল্লাহু আনহা

হজরত জুনাইরা রুমিয়্যা (রা.) ছিলেন বনু মাখজুমের দাসী। ইসলাম গ্রহণের পর কাফের মুশরিকগণ তাঁকে নির্যাতনের নতুন ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নেয়। একবার আবু জেহেল তাঁকে এতো বেশী মারধর করে যে, তিনি দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন। তাঁর এ অবস্থা দেখে মুশরিকরা বলে লাত-মানাত (কাফেরদের দুটি মূর্তির নাম) তোমার দৃষ্টিশক্তি নিয়ে গেছে। হজরত জুনাইরা (রা.) কাফেরদের কথায় লাফিয়ে ওঠেন, সেজদায় মাথা নত করে আল্লাহকে বলেন, হে আল্লাহ! লাত-মানাত তো পাথরের তৈরী মূর্তি। তারা তো জানেও না, কে তাদের পূজা করছে? তুমি তো শোন ও দেখো, আমার কোনো অস্তিত্ব ছিলো না তুমি অস্তিত্ব দিয়েছো, তুমি দৃষ্টিশক্তি দিয়েছো, তুমিই নিয়ে নিয়েছো, আবার তুমি চাইলে দিয়েও দিতে পারো। হে মা'বুদ! তুমি আমাকে মুশরিক-বেঈমানদের সামনে অপমানিত করো না। এই দু'আ করে হজরত জুনাইরা (রা.) ঘর থেকে বের হওয়ার আগেই আল্লাহ তা'আলা তাঁর দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে দেন। আল্লামা ইবনে হিশাম (র.) লিখেন, হজরত আবু বকর (রা.) তাঁকে ক্রয় করে স্বাধীন করে দেন।

লুবাইনা রাদিয়াল্লাহু আনহা

লুবাইনা (রা.) ছিলেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অন্যতম সাহাবী। প্রথম জীবনে তিনি একজন দাসী ছিলেন। আবু বকর তাকে কিনে নিয়ে মুক্ত করে দেন। তিনি উমর ইবনুল খাত্তাবের দাসী ছিলেন। তখনও উমর ইসলাম গ্রহণ করেননি।

ইসলামের শুরুর দিকে কুরাইশরা নিম্নবর্গের মুসলমানদেরকে তাদের ধর্মবিশ্বাস ত্যাগ করার প্রয়াসে নিপীড়নের একটি ইচ্ছাকৃত কৌশল শুরু করে। ইসলাম গ্রহণ করার কারণে দাসী লুবাইনা (রা.)-কে তার মনিব উমর মারতে মারতে ক্লান্ত হয়ে থেমে যেতেন এবং বলতেন, 'তোমার প্রতি দয়া ও করুণাবশত থেমে যাইনি, ক্লান্ত হয়ে থেমেছি।' লুবাইনা (রা)- ও ছাড়ার পাত্রী নন। তিনি বলতেন, 'আপনি ইসলাম গ্রহণ না করলে আল্লাহও আপনাকে এমন শাস্তি দেবেন।'

একদিন আবু বকর (রা.) পাশ দিয়ে চলে গেলেন যখন উমর লুবাইনাকে শাস্তি দিচ্ছিলেন। আবু বকর (রা.) তখন উমরের কাছ থেকে লুবায়নাকে কিনে নেন এবং তাকে মুক্ত করেন ।

জিহাদের ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা

তা'লীম, তাবলীগ, ইবাদত, রিয়াজত আর নানা ত্যাগ ও কুরবানীর পাশাপাশি জিহাদের ময়দানেও মুসলিম নারীগণ অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছেন। আল্লাহর হিজরত-নুসরাত ও শাহাদাতের যে অনন্য দৃষ্টান্ত তাঁরা স্থাপন করেছেন তার উদাহরণ কেবল তাঁরাই। আর মৃত্যুর ওপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে তো তাঁদের জন্য মহা পুরস্কার আছেই। জিহাদের ময়দানে মুজাহিদদের পানি পান করানো থেকে দিয়ে অস্ত্র এগিয়ে দেওয়া, চিকিৎসা দেওয়া, প্রেরণা দেওয়া, সন্তানদের প্রেরণ করাসহ কী না করেছেন তারা।

রণাঙ্গনে মুসলিম নারীর বীরত্ব

এমন অনেক নারী ছিলেন যারা স্বশরীরে বীরত্বের সাথে রণাঙ্গনে লড়ে সাহসিকতার অনন্য স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁদের বীরত্ব ও উদ্দীপনা দেখে বড় বড় ধীর পুরুষেরাও বিস্মিত হয়েছেন। নিম্নে তাঁদের কয়েকটি ঘটনা আলোকপাত করা হলো-

উহুদ বীরাঙ্গনা উম্মে উমারা রাদিয়াল্লাহু আনহা এর বীরত্ব

হিজরতের তৃতীয় বছর উহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তিনি উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। যতক্ষণ মুসলমানগণ বিজয়ী ছিলেন ততক্ষণ তিনি তাঁদেরকে পাত্র ভরে ভরে পানি পান করান। আকস্মিক যখন মুসলমানদের ওপর অনাকাঙ্ক্ষিত পরাজয় নেমে এলো তখন তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে চলে যান এবং তাঁকে আগলে রেখে অস্ত্র হাতে দাঁড়িয়ে যান। যখন কাফেরগণ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর আক্রমণ করতে চেষ্টা করতো তিনি তখন তা প্রতিহত করতেন। ওই সময়টা কতো ভয়ংকর ও ঝুঁকিপূর্ণ ছিলো তার কল্পনাও কঠিন। বড় বড় বীর বাহাদুরদের পা-ও তখন পিছলে যাচ্ছিলো অথচ তখন উম্মে উমারা (রা.)-এর মতো একজন নারী ইস্পাত কঠিন দৃঢ় মনোবল নিয়ে আঘাতের পর আঘাত সয়ে অবিশ্রান্ত লড়ে চলছিলেন।

বর্ণিত আছে, যুদ্ধের এক পর্যায়ে এক কাফের সৈনিক তাঁর মাথায় আঘাত করতে চাইলে তিনি হাতের ঢাল দিয়ে তা প্রতিরোধ করেন এবং ওই সৈনিকের ঘোড়ার পায়ে এমন জোরে আঘাত করেন যে, তৎক্ষণাৎ ঘোড়া ও আরোহী জমিনে লুটিয়ে পড়ে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দৃশ্য দেখছিলেন। তিনি উম্মে উমারা (রা.)-এর ছেলেকে ডাক দিয়ে বললেন, আব্দুল্লাহ! তোমার মাকে সাহায্য করো! ছেলে দ্রুত ছুটে এসে তরবারি দিয়ে কাফের সৈনিককে এক আঘাতে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিলেন। ইতোমধ্যে অন্য এক কাফের এসে 'আব্দুল্লাহ (রা.)-এর বাম বাহুতে আঘাত করে পালিয়ে যায়। হজরত উম্মে উমারা (রা.) আপন ছেলের আঘাতপ্রাপ্ত স্থানে ব্যান্ডেজ করে দিয়ে বললেন, 'বাবা! ছুটে যাও এবং যতক্ষণ দেহে প্রাণ আছে ততক্ষণ লড়ে চলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রাণোৎসর্গী ঈমানী চেতনা দেখে বললেন, “হে উম্মে উমারা! আল্লাহ তোমাকে যে শক্তি দিয়েছেন তা তো অন্য করো মাঝে দেখি না।" এ কথা বলতে না বলতে ওই কাফের সৈনিক, যে 'আব্দুল্লাহ (রা.)কে আহত করেছিলো সে আবার হামলা করতে উদ্যত হলো। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মে উমারা (রা.)-কে বললেন, উম্মে উমারা! মোকাবিলা করো, সে ওই হতভাগা কাফের, যে 'আব্দুল্লাহকে আহত করেছে। হজরত উম্মে উমারা (রা.) ক্রোধান্বিত হয়ে তেজস্বী বেগে তার দিকে দ্রুত ছুটে গেলেন। শক্ত হাতে তরবারি দিয়ে এমন আঘাত করলেন যে, কাফের দ্বি খণ্ডিত হয়ে জমিনে লুটিয়ে পড়লো। বিশ্ব জাহানের নেতা, আল্লাহর বন্ধু, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা দেখে মৃদু হাসলেন। বললেন, উম্মে উমারা। তুমি তো তোমার ছেলের পরিপূর্ণ প্রতিশোধ নিলে!

যুদ্ধের আরেক পর্যায়ে এক অভাগা কাফের সৈনিক হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি পাথর নিক্ষেপ করলো। যার ফলে তাঁর দাঁত মোবারক শহীদ হয়ে গেলো। ইতোমধ্যে বিন কুমিয়্যা নামক এক কাফের আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে পৌছে গেলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাথা মোবারকে তরবারি দিয়ে এমন জোরে আঘাত করলো যে, তরবারির দুটি কপাট তাঁর মাথায় বিদ্ধ হয়ে গেলো। হজরত উম্মে উমারা (রা.) বিদ্যুৎ গতিতে এগিয়ে তা প্রতিরোধ করলেন। প্রতিরোধ করতে গিয়ে নিজের কাঁধে আঘাত লাগে এবং তিনি গর্তে পড়ে যান। তখন ইবনে কুমিয়্যাকে তিনিও তরবারি দিয়ে আঘাত করেন কিন্তু তার পরনে লোহার পোশাক থাকায় তরবারি ফসকে যায় এবং সে পালিয়ে যায়। হজরত উম্মে উমারা (রা.)-এর কাঁধের আহত স্থান থেকে রক্তের স্রোত বইতে থাকে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কাঁধে ব্যান্ডেজ করিয়ে দিয়ে কোনো এক বীর সাহাবীকে ডাক দিয়ে বলেন, আল্লাহর শপথ উম্মে উমারা আজ বীরত্বে তোমাদের সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে।

উম্মে উমারা (রা.) আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমার মা-বাবা আপনার প্রতি উৎসর্গ হোন। আমার জন্য দু'আ করবেন আমি যেনো জান্নাতে আপনার সঙ্গে থাকতে পারি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে আল্লাহর দরবারে তার জন্য দু'আ করেন এবং উচ্চস্বরে ঘোষণা করেন, হে আল্লাহ! তুমি তাকে জান্নাতে আমার সঙ্গী করে দিও। এ কথা শুনে উম্মে উমারা (রা.) বলতে লাগলেন, এখন দুনিয়াতে আমার আর কোনো চিন্তা নেই, দুনিয়ার কোনো বিপদ ও মসিবত আমি আর তোয়াক্কা করি না।

যুদ্ধের পর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মে উমারা (রা.)-এর খবর না নিয়ে ঘরে ফিরে যাননি। উহুদের যুদ্ধে হজরত উম্মে উমারা (রা.) শরীরের ১২টি স্থানে আঘাত প্রাপ্ত হন। আল্লামা ইবনে সা'আদ লিখেন, উহুদের যুদ্ধ ছাড়াও তিনি বাইয়াতে রিদওয়ান, খাইবার, হুনাইনসহ অনেক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

হুনাইনের যুদ্ধেও তিনি অসাধারণ বীরত্বের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। রক্তক্ষয়ী এ যুদ্ধে যখন হাজার হাজার মুসলিম মুজাহিদের পা পিছলে যাচ্ছিলো তখন মাত্র একশত মুসলমান দৃঢ় পায়ে মোকাবিলা করছিলেন। আর তাঁদের এক বীর সাহসী রণসঙ্গীনী ছিলেন উম্মে উমারা (রা.)। তিনি এ যুদ্ধে এক কাফের অশ্বারোহী সৈনিককে জাহান্নামে প্রেরণের সৌভাগ্য অর্জন করেন।

ইয়ামামার যুদ্ধ- যা নবুওয়াতের মিথ্যা দাবীদার মুসাইলামাতুল কাজ্জাবের বিরুদ্ধে সংঘটিত হয়েছিলো। এ যুদ্ধেও তিনি অংশগ্রহণ করে সাফল্যের স্বর্ণখচিত আসন দখল করেন। এ যুদ্ধে তাঁর এক হাত কাটা যায়। হাত কেটে যাওয়ার পর তিনি আর কোনো যুদ্ধে অংশ নিতে পারেননি। উহুদের বীরত্ব আর সাহসিকতার কারণে ইতিহাসে তিনি উহুদ বীরাঙ্গনা হিসেবে পরিচিত হয়ে আছেন।

হজরত সাফিয়্যা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর বাহাদুরি

হজরত সাফিয়্যা (রা.) ছিলেন রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ফুফু ও হজরত হামযাহ (রা.)-এর বোন। তিনি উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, মুজাহিদদের পানি পান করাবেন ও আহতদের সেবা-যত্ন করবেন বলে। এক ভুলের কারণে যখন মুসলিম বাহিনীর ওপর সাময়িক পরাজয় নেমে এলো আর মুসলিম মুজাহিদগণ পিছু হটতে লাগলেন, তখন হজরত সাফিয়্যা (রা.) বর্শা হাতে নিয়ে মুজাহিদদের মুখের দিকে ছুঁড়তে লাগলেন এবং তাদেরকে এ বলে লজ্জা দিতে লাগলেন যে, তোমরা আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে রেখে পালিয়ে যাচ্ছো!

মুজাহিদদের পিছু হটার সুযোগে হজরত আবু সুফিয়ান (রা.)-এর স্ত্রী হিন্দা শাহাদাত বরণকারী হজরত হামযাহ (রা.)-এর নাক, কান এবং অন্যান্য অঙ্গ কেটে ফেলে। পরে হজরত সাফিয়্যা (রা.) আপন ভাইয়ের লাশ দেখতে আসলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ছেলে হজরত জুবায়ের (রা.)-কে বললেন, তাকে লাশের পাশে যেতে দিও না। ছেলে তাকে লাশের পাশে যেতে বারণ করলে তিনি বললেন, আমি বুঝতে পেরেছি, আমার ভাইয়ের নাক, কান ইত্যাদি কেটে ফেলেছে। তবে আমি ধৈর্য ধরলাম এটা তো আল্লাহর রাস্তায় হয়েছে, আল্লাহই এর বদলা দিবেন। অবশেষে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে লাশের পাশে যাওয়ার অনুমতি দিলে তিনি লাশ দেখে বলেন- ইন্নালিল্লাহি ও ইন্না ইলাইহি রাজিউন এবং এক অসাধারণ ধৈর্যশক্তির প্রমাণ দেন।

হজরত সাফিয়্যা (রা.) খন্দকের যুদ্ধেও অংশ নিয়েছিলেন। সে যুদ্ধেরও স্মরণীয় একটি কীর্তি আছে তাঁর। খন্দকের যুদ্ধে এক পাশ দিয়ে আরবের কাফের- মুশরিকগণ এবং অপর পাশ দিয়ে বনী কুরাইজার লোকেরা কেল্লা থেকে বেরিয়ে মদীনার মুসলমানদের তাঁবুর পাশে হীনচক্রান্ত আঁটতে থাকে। ইয়াহুদীগণ মুসলমানদের মধ্যে অস্থিরতা ও নিরাশা ছড়িয়ে দিতে আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলো তখন।

হজরত সাফিয়্যা (রা.) ও হজরত হাসান বিন সাবেত (রা.) একই কিল্লায় অবস্থান করছিলেন। হাসান বিন সাবেত (রা.)-এর ওপর নারী ও শিশুদের নিরাপত্তার দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছিলো। একবার এক ইয়াহুদীকে মুসলমানদের কেল্লার চার পাশে ঘোরাফেরা করতে দেখে হজরত সাফিয়্যা (রা.)-এর সন্দেহ সৃষ্টি হয়। তিনি হজরত হাসান বিন সাবিত (রা.) কে বললেন, এই লোকের চলাফেরা আমার কাছে সন্দেহজনক মনে হচ্ছে। হতে পারে এই লোক আমাদের অভ্যন্তরীণ খবর অর্থাৎ আমাদের এই কিল্লায় যে কোনো পুরুষ নেই তা বাহিরের ইয়াহুদীদের কাছে প্রচার করে দিবে। তাই আপনি তাকে হত্যা করে ফেলুন। হজরত হাসান বিন সাবিত (রা.) বললেন, আমি তো বৃদ্ধ ও দুর্বল মানুষ। আমার পক্ষে এটা সম্ভবপর নয়। এ কথা শুনে হজরত সাফিয়্যা (রা.) তাঁবুর একটি কাঠ হাতে নিয়ে কেল্লা থেকে বেরিয়ে গেলেন এবং ইয়াহুদীকে আঘাতে আঘাতে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিলেন। এরপর তিনি ওই ইয়াহুদীর মাথা কেটে কেল্লার দেয়াল টপকিয়ে কেল্লার ওপাশে অবস্থানরত ইয়াহুদীদের দিকে নিক্ষেপ করে দিলেন। এ কাণ্ড দেখে ইয়াহুদীরা নিশ্চিত হয়ে গেলো যে, কেল্লার অভ্যন্তরে মুসলিম বাহিনী অবস্থান করছেন। এরূপ দূরদর্শীতা, সাহসিকতা ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে হজরত সাফিয়্যা (রা.) মুসলমানদেরকে ইয়াহুদীদের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত থেকে উদ্ধার করেন। হজরত সাফিয়্যা (রা.) বলেন, যুদ্ধের পরে যখন রাসূল (সা.)কে এই কারগুজারী শোনানো হলো তখন তিনি এমনভাবে হাসেন যে, আমি তাঁর দাঁতের শেষ ভাগ পর্যন্ত দেখতে পাই।

খোওয়াইলা বিনতে আযর (রা.)-এর বীরত্ব

রোমানদের বিরুদ্ধে এক যুদ্ধে হজরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) রণসংগীত ও ঈমানদীপ্ত তারানা গেয়ে দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছিলেন। আকস্মিক দেখতে পান একটি লাল ঘোড়ায় চড়ে একজন রণসৈনিক ঝকঝকে বল্লম হাতে এগিয়ে চলছেন। তার পদচারণাই বলে দিচ্ছে যে, নিশ্চিত সে কোনো রণকৌশলী বীর বাহাদুর। তার লৌহবর্মের ওপর কালো পোষাক আচ্ছাদিত, সমস্ত শরীর ও চেহারা ঢাকা, সবুজ পাগাড়ী দিয়ে শক্তভাবে কোমর বেঁধে সে সম্মুখ সমরে বীরদর্পে ছুটছে আর ছুটছে। হজরত খালেদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) সিদ্ধান্ত নিলেন, যেভাবে হোক তার সাথে মিলিত হবেন। তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ আমি দেখলাম, সে এক অসাধারণ সাহসী বীর। সবাই তার পিছনে ছুটছে।

মুসলিম বাহিনী যখন কাফেরদের কাছাকাছি পৌছালো তখন দেখলাম সে রোমানদের ওপর এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়লো যেমন বাজপাখি চড়ুই পাখির ওপর আক্রমণ করে। তার প্রথম আক্রমণই শত্রুবাহিনীতে পরাজয়ের ঘণ্টা বাজিয়ে দেয় এবং রণাঙ্গনে লাশের স্তূপ পড়ে যায়। সে এগোতে এগোতে রোমান বাহিনীর মধ্যে চলে যায়। সে দুর্বার আক্রমণ করে যখন ফিরছিলো তখন তার খুনরাঙ্গা তরবারি ঝলমল করছিলো। সে সুনিশ্চিত শাহাদাতের সুতীব্র বাসনা নিয়ে নিজেকে কাফের সৈনিকদের মধ্যখানে ঠেলে দিয়েছিলো। ফলে সে দিন অসংখ্য কাফের তার তরবারির আঘাতে প্রাণ হারায়। তাঁর বীরত্ব ও সাহসিকতা দেখে মুসলিম মুজাহিদদের অনেকেই ধরে নিয়েছিলেন যে, নিশ্চিত সে খলিদ বিন ওয়ালিদ হবে। হজরত রাফে বিন আমের (রা.) বিস্মিত হয়ে হজরত খালেদ বিন ওয়ালিদ (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, কে এই বীর যোদ্ধা? তিনি বললেন, আমিও জানি না কে সে। আমিও তো অবাক হয়ে দেখছি তাঁর কাণ্ড।

এরপর শুরু হয় সম্মিলিত আক্রমণ। হজরত খালেদ (রা.) ছিলেন সবার সমনে। তিনি দেখলেন ওই সৈনিক রোমানদের বেষ্টনী থেকে ঘূর্ণায়মান অগ্নিশিখার ন্যায় বেরিয়ে এলো। সে রক্তে রঞ্জিত। তার ঘোড়া ঘর্মাক্ত। রোমান সৈনিকগণ তার ওপর আক্রমণ করতে এলে সে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করছে। তাই সে বিচ্ছিন্ন ভাবে লড়াই করে যাচ্ছে। হজরত খালেদ বিন ওয়ালিদ (রা.) নিরাপত্তা দিয়ে তাঁকে মুসলিম বাহিনীর মধ্যে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন। তাকে দেখে মনে হলো রক্তে রঞ্জিত টকটকে লাল গোলাপের একটি পাপড়ি। হজরত খালিদ (রা.) তাকে বললেন, তুমি তো আল্লাহর শত্রুদের ওপর তোমার রাগ খুব ঝাড়লে এবং আল্লাহর পথে মরণপণ লড়াই করলে। আচ্ছা তোমার পরিচয় কী? সে কিছুই না বলে আবার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলো। হজরত খালেদ বিন ওয়ালিদ (রা.) আবার বললেন, হে আল্লাহর

গোলাম! তুমি তো আমাকে এবং সমস্ত মুসলিম বাহিনীকে অস্থিরতার মধ্যে ফেলে দিয়েছো। এতো বড় বীর বাহাদুর তুমি কে? বারবার আবেদনের প্রেক্ষিতে সে নারী কণ্ঠে বলতে লাগলো, বেয়াদবী নিবেন না। আমি শুধুই লজ্জার কারণে আমার পরিচয় গোপন রাখতে চেয়েছিলাম। আমি কোনো পুরুষ নই আমি এক নারী। আমার মনের ব্যথা আমাকে রণাঙ্গনে নিয়ে এসেছে।

খালেদ বিন ওয়ালিদ (রা.) আবার বললেন, কে তুমি? তিনি বললেন, আমি যিরারের বোন খোওয়াইলা বিনতে আযর। আমার ভাইয়ের গ্রেফতারির সংবাদ আমাকে তা করতে বাধ্য করেছে যা আপনারা দেখলেন। ভাইয়ের ওপর বিপদ আসলে বোনেরা কাজে আসে। হজরত খালিদ (রা.) এ কথা শুনে অনেক কাঁদলেন এবং বললেন সম্মিলিতভাবে আক্রমণ করতে হবে।

হজরত খোওয়াইলা (রা.)-এর অবস্থা ছিলো এমন যে, আক্রমণ করে করে রোমান সৈনিকদের মধ্যখানে পৌছে যেতেন। যুদ্ধের এক পর্যায়ে মুসলিমরা যখন পিছু হটছিলেন খোওয়াইলা বিনতে আযর (রা.) তখন কবিতা পড়ছিলেন-

یاهار با عن نسوه ثقات
لهن جمال و لهن بنات
تسلمهم طرا إلى الهيئات
تملك نواصيهم مع البنات
علاج سوء فسق عتات
بيان منا اعظم الشتات

অর্থ: তোমরা তোমাদের গর্ভধারিনী, পরমা সুন্দরী ও বিশ্বস্ত নারীদেরকে রেখে কোথায় পলায়ন করছো! তোমরা তাদেরকে শত্রুর হাতে তুলে দিচ্ছো। জঙ্গি কাফের ও অনধিকার চর্চাকারীরা তো তোমাদের স্ত্রী ও কন্যাদের মালিক হয়ে যাবে। আমরা তো তোমাদের থেকে চিরদিনের তরে পৃথক হয়ে যাবো।

খোওয়াইলা (রা.) এই কবিতা আবৃত্তি করে করে পিছু হটা মুসলমানদেরকে প্রেরণা দিচ্ছিলেন।

হজরত উম্মে আবান (রা.)-এর বাহাদুরী

রোমানদের সঙ্গে যুদ্ধের সময় কাফেরদের তীর-বল্লমের আঘাতে অসংখ্য মুসলিম মুজাহিদ আহত হয়েছিলেন। হজরত আবান বিন সাঈদ (রা.)ও আহত হন এবং পরে তিনি শাহাদাত আঙ্গুলি উঁচু করে কালেমায়ে শাহাদাত পড়তে পড়তে নিজের প্রাণ আল্লাহর কাছে সঁপে দেন। এই যুদ্ধের মাত্র কদিন আগে তিনি বিয়ে করেছিলেন। তার স্ত্রীর হাত তখনও মেহেদীর রঙ্গে রঙ্গীন ছিলো।

তার স্ত্রীর নাম ছিলো উম্মে আবান (রা.)। তিনি ছিলেন একটি অভিজাত বংশের অভিজাত নারী। তিনি পদাতিক যুদ্ধে বিশেষভাবে দক্ষ ছিলেন। তিনি যখন সংবাদ পেলেন যে, তার স্বামী শহীদ হয়েছেন তখন সঙ্গে সঙ্গে লাশের পাশে ছুটে এসে বললেন, তোমার শাহাদাত শুভ হোক। তুমি ওই আল্লাহর কাছে চলে গেছো যিনি আমাদেরকে একত্রিত করেছিলেন আবার তিনিই পৃথক করে দিয়েছেন। আল্লাহর কসম আমিও এমনভাবে জিহাদ করবো যাতে তোমার কাছে পৌঁছে যেতে পারি। কেননা তুমিও আমাকে ভালো করে দেখ নাই আর আমিও তোমাকে ভালো করে দেখি নাই। আমি আর অন্য কারো সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াকে নিজের জন্য হারাম করে নিয়েছি। আমি আমার জীবনকে আল্লাহর পথে উৎসর্গ করলাম।

এরপর উম্মে আবান (রা.) সরাসরি তাঁবুতে এসে অস্ত্র হাতে উঠিয়ে নিলেন; সমস্ত শরীর কাপড় দিয়ে ঢেকে খোলা তরবারি হাতে ময়দানের দিকে ছুটলেন। লোকদের জিজ্ঞেস করলেন, আমার স্বামী শত্রু কেল্লার কোন ফটকে শাহাদাত বরণ করেছেন? মুজাহিদগণ বললেন, 'তোমা' নামক ফটকে শাহাদাত বরণ করেছেন এবং 'তোমা' নামক কাফের সেনাপতি তাকে হত্যা করেছে। উম্মে আবান (রা.) সেখানে পৌঁছে অত্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করলেন।

'তোমা' ফটকের সামনে এক খৃষ্টান সৈনিক ক্রুশ হাতে প্রার্থনা করছিলো, তিনি তার ওপর তীর ছুঁড়লে সে সেখানেই লুটিয়ে পড়ে। ক্রুশও জমিনে ছিটকে পড়ে। মুসলমানগণ ক্রুশ ছিটকে পড়তে দেখে দ্রুত এগুচ্ছিলেন যাতে তা ছিনিয়ে নিতে পারেন। (শত্রুপক্ষ ক্রুশ ছিনিয়ে নিলে তৎকালীন খৃষ্টানদের আত্মমর্যাদায় লাগতো)। 'তোমা' নামক খৃষ্টান সেনাপতি যখন দেখলো, ক্রুশ জমিনে পড়ে আছে আর মুসলমানগণ তা নিতে এগিয়ে আসছে তখন সে মুসলমানদের মোকাবিলার জন্য বিশাল এক সৈন্য বাহিনী নিয়ে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়লো যাতে ক্রুশ উদ্ধার করে নিয়ে যেতে পারে। মুসলমানগণ হজরত শারজিল বিন হাসনা (রা.)-এর হাতে ক্রুশ দিয়ে নিজেরা কাফেরদের মোকাবিলায় লড়তে লাগলেন। বর্ণিত আছে যে,

মুসলমানদের বিশাল এক জামা'আত কাফেরদের মধ্যে ঢুকে যান এবং প্রাণপণে লড়তে থাকেন।

'তোমা' ডানে-বামে লক্ষ করছিলো যে ক্রুশ কার হাতে। হজরত শারজিল (রা.)-এর হাতে ক্রুশ দেখে তার ওপর ক্ষুধার্ত হায়নার ন্যায় ঝাঁপিয়ে পড়লো। শারজিল (রা.) 'তোমা'র আকস্মিক হামলায় হতভম্ব হয়ে ক্রুশ জমিনে ছুড়ে মেরে তিনিও তরবারি হাতে নিয়ে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কাফেরগণ শারজিল (রা.)-এর পিছু নিলো। উম্মে আবান (রা.) এই অবস্থা দেখে দ্রুত কাছে ছুটে এলেন। দেখলেন 'তোমা' তার পাশে অবস্থান করছে। উম্মে আবান (রা.) 'তোমা' কে লক্ষ করে একটি তীর নিক্ষেপ করলেন এবং পড়লেন-

بسم الله وعلى بركة رسول الله

তীর সোজা 'তোমা' সেনাপতির নাকে বিদ্ধ হলো এবং সে চেঁচাতে চেঁচাতে পলায়ন করলো। উম্মে আবান আরেকটি তীর নিক্ষেপ করতে চাইলেন কিন্তু রোমান সৈনিকগণ মধ্যখানে চলে এলো। মুজাহিদগণ রোমানদের মোকাবিলা করে উম্মে আবানকে রক্ষা করলেন। উম্মে আবান (রা.) আরেক কাফেরকে লক্ষ করে আরেকটি তীর নিক্ষেপ করলেন; সে সেখানেই লুটিয়ে পড়লো। তিনি বরাবর তীর ছুড়তে লাগলেন এবং এই কবিতা পড়তে লাগলেন।

ام ابان فطلبي بثارك
صولى عليهم صولة المتادارك

অর্থ: হে উম্মে আবান! অবশ্যই তোমার প্রতিশোধ নিবো এবং রোমানদের ওপর এমনভাবে আক্রমণ করবো যাতে আমার উদ্দেশ্য অর্জন হয়।

হিন্দা (রা.)-এর সাহসিকতা

রোমানদের সঙ্গে জিহাদের সময় তারা মুজাহিদদের ওপর উপর্যপুরি হামলা করতে থাকে। এক পর্যায়ে মুসলমানগণ পিছু হটতে বাধ্য হয়ে পড়েন। যে সব মুসলমান পিছু হটেছেন নারীগণ তাদেরকে চিৎকার করে তিরস্কার করছিলেন। তাদেরকে লজ্জা দিচ্ছিলেন। তখন সেখানে যে সব নারী ছিলেন তাদের অন্যতম খোওয়াইলা বিনতে আজর, খোওয়াইলা বিনতে সালাবা, সালমা বিনতে হাশিম, নাম বিনতে কানাস, হিন্দা বিনতে উতবা, লুবনা বিনতে যারির (রা.)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তারা লাঠি হাতে নিয়ে পুরুষদেরকে রণাঙ্গনে ফিরিয়ে দিচ্ছিলেন। ফলে মুসলমানগণ আবার ঘুরে দাঁড়ান।

হজরত আবু সুফিয়ান (রা.)-এর স্ত্রী হজরত হিন্দা (রা.) লাঠি হাতে সবার আগে ছুটে গেলেন। তাঁর পিছনে ছুটলেন মুহাজিরদের নারীগণ। হিন্দা (রা.) উহুদের দিবসে যে কবিতাটি পড়েছিলেন সেটি পড়ছিলেন-

نحن بنات طارق نمشي على النمارق
إن تقبلوا نعانق أو تدبروا نفارق

আমরা তারকার কন্যা
শয্যার পরে আমাদের পথ চলা
যদি সম্মুখে যাও, হও বিজয়ী
তোমাদের হব সহচরী
আর যদি শত্রু দেখে পালাও
আমরা ছেড়ে যাবো তোমাদের।

দুর্ভাগ্য যে তখন আবু সুফিয়ান (রা.)ও পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পলায়ন করছিলেন। হিন্দা (রা.) তাঁকে দেখে বললেন, হে রণসন্তান! কোথায় পলায়ন করছো? ফিরে যাও প্রয়োজনে নিজের জীবন দিয়েও আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিপক্ষে যে সব লড়াই করেছো তার কাফফারা দিয়ে এসো। এ কথা শুনে আবু সুফিয়ান (রা.) ঘুরে দাঁড়ালেন। তাঁর সঙ্গে অন্যান্য লোকেরাও ফিরে গেলেন। সমস্ত নারীরাও তাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। এক নারী এক কাফের সৈনিককে ধাওয়া করলে সে তার ঘোড়াসহ জমিনে লুটিয়ে পড়ে। এর পর তিনি বলেন, "মুসলমানদের সঙ্গে আল্লাহর সাহায্যের অর্থ এই।”

ইয়ারমুকের যুদ্ধে নারীদের বীরত্ব

ইয়ারমুকের যুদ্ধ। অস্ত্রের ঝনঝনানিতে প্রকম্পিত আকাশ-বাতাস। কাঁপছে পায়ের তলের মাটি, নিথর গাছপালা। তখন মুসলমানগণ রণক্লান্ত। কিন্তু থামছে না কাফের প্রতিপক্ষ। কেউ কেউ পলায়ন করতে উদ্যত হচ্ছে। প্রতিকূল এ সময় নারীরা আর বসে থাকলেন না। কোলের বাচ্চাদেরকে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন ময়দানে। যারা পলায়ন করছিলো তাদেরকে ফিরিয়ে দিচ্ছিলেন। কেউ কেউ কাফেরদের মুকাবিলায় রণাঙ্গনে লড়ছিলেন, আবার কেউ রেগে গিয়ে পলায়নকারী মুসলিমদের ওপর আঘাত করছিলেন। ফলে মুসলমানগণ আবার শক্ত হয়ে ময়দানে চলে আসেন। শুরু হয় যুদ্ধ। পুরুষদের পাশাপাশি নারীরাও লড়ছিলেন।

রোমানদের আক্রমণের এক পর্যায়ে লাখমে যুজান ও খাওলানের নারীরা পিছপা হয়ে যান কিন্তু খোওয়াইলা, উম্মে হাকিম, লুবনা এবং সালমা (রাদিয়াল্লাহু আনহুন্না) অবিরাম লড়ে চলেন। তারা পলায়নকারী নারীদের তিরস্কার করে বলছিলেন, তোমরা সরে যাও! তোমরা আমাদেরকে এলোমেলো করে দিলে। তাদের তিরস্কারে নারীরা আবার ফিরে এলো। প্রাণপণে লড়লো। হজরত হিন্দা, উম্মে হাকিম, খোওয়াইলা (রাদিয়াল্লাহু আনহুন্না) লড়ছিলেন আর বলছিলেন, হে আরবী মায়েদের কন্যারা! তোমাদের কি হলো তোমরা এই কাফেরদের থেকে পলায়ন করছো! এগিয়ে এসো আক্রমণ করো। হজরত আসমা বিনতে আবু বকর (রা.) হজরত জুবায়ের (রা.)-এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করে চলছিলেন।

এই যুদ্ধে সাহসী, পুণ্যবতী-সতিসাধ্বি নারীগণ আবার প্রমাণ দিলেন যে শরীয়তের পরিপূর্ণ অনুসরণ করে নারীরাও রণাঙ্গনে লড়তে জানে। তারাও শাহাদাতের মর্যাদা অর্জন করতে পারে। দ্বীনি বিষয়ে নারীরা পিছিয়ে নয়।

জিহাদের ময়দানে উম্মে হাকিম (রা.)-এর অসাধারণ কৃতিত্ব

হজরত উম্মে হাকিম (রা.) তাঁর স্বামী হজরত ইকরামা (রা.)-এর সঙ্গে ইয়ারমুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি এ যুদ্ধে অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করেন। যুদ্ধে হজরত ইকরামা (রা.) শাহাদাত বরণ করেন।

ইকরামার ইন্তেকালের পর উম্মে হাকিম (রা.) হজরত খালিদ বিন সায়ীদ (রা.)-এর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। স্বামীর বাড়িতে যাওয়ার আগেই দক্ষিণ দামেশক থেকে কাফেরদের বিরুদ্ধে একটি যুদ্ধের সংবাদ আসলে উম্মে হাকিম (রা.) হজরত খালিদ বিন সায়ীদ (রা.) কে বলেন, আমার ইচ্ছে হলো, এই যুদ্ধে কাফেরদের সঙ্গে লড়াই করার পর আপনার কাছে আসবো। হজরত খালিদ (রা.) বললেন, আমার আশা আমি এই যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করবো। অবশ্য খালিদ (রা.)-এর প্রস্তাবে যুদ্ধের আগেই তাদের বাসর হয়। বাসর রাতের পরের দিন সকাল বেলা খালিদ (রা.) ওয়ালীমা সম্পন্ন করেন। ওয়ালীমা শেষ হতে না হতে রোমান সৈনিকগণ রণাঙ্গনে এসে পৌঁছালে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায়। হজরত খালিদ (রা.) বীরদর্পে লড়াই করেন। আল্লাহ তাঁর মনের আশা পূর্ণ করে দেন। তিনি শত্রুর হাতে শহীদ হয়ে যান।

খালিদ (রা.)-এর শাহাদাতের পর উম্মে হাকিম (রা.) ঐ তাঁবুর একটি খুঁটি হাতে উঠিয়ে নেন, যে তাঁবুতে তাদের বাসর সম্পন্ন হয়েছিলো। সাহসিকতার সঙ্গে তাঁবুর সামান্য একটি কাঠ নিয়ে ছুটে যান বীর বাহাদুরদের মোকাবিলায়। রণাঙ্গনে প্রাণপণ লড়ে যে ঝলক দেখিয়েছেন তাতে অবাক হয়েছেন অনেক পুরুষও। তিনি শুধু এই কাঠ দিয়েই সাতজন কাফেরকে হত্যা করেন। এ যুদ্ধেও মুসলমানদের বিজয় হয়।

জিহাদের ময়দানে হাবিবা বিনতে হাশিম (রা.)-এর বীরত্ব

হাবিবা বিনতে হাশিম (রা.) ছিলেন ইসলামের বীর সিপাহসালার হাশিম বিন উতবা (রা.)-এর কন্যা। ষোল বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হলেও কয়েক বছর পরই তিনি বিধবা হয়ে যান। তিনি জীবনের বাকী সময়টুকু ইসলামের জন্য উৎসর্গ করে দেন। অসংখ্য যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। অধিকাংশ যুদ্ধে তিনি বীরত্বের স্বাক্ষর রাখেন। একবার ইরানের অগ্নিপূজারীরা সিদ্ধান্ত নিলো যে, যেভাবেই হোক ইরানের ইসলামী হুকুমত ধ্বংস করে দিতে হবে। যেই কথা সেই কাজ। যুদ্ধের ডাক দেয় তারা। মুসলিম মুজাহিদদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন হাবিবা (রা.)-এর বাবা হাশিম বিন উতবা (রা.)। পিতার সাথে বীর বাহাদুরের মতো লড়ছিলেন হাবীবা (রা.)ও।

যুদ্ধের সময় তিনি বারবার এই আওয়াজ তুলছিলেন, "হে পুরুষগণ! সারিবদ্ধ হয়ে এগিয়ে চলো, বিজয় তোমাদের সামনে।" তাঁর এ আওয়াজ মুজাহিদদের উদ্দীপ্ত করে। তিনি নিজে এমন বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করেন যে, ইরানী সৈনিকদের মধ্যে কঠিন আতংক ছড়িয়ে পড়ে। লড়াই করতে করতে এক সময় তিনি ঘোড়া থেকে মাটিতে পড়ে আহত হয়ে যান। তাকে আহত অবস্থায় দেখে বাবা হাশিম বিন উতবা (রা.) বলছিলেন, একটু বিশ্রাম নিয়ে নাও মা! কিন্তু তিনি বাবার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। বাবার বারবার আবেদনের প্রেক্ষিতে তিনি বলে ওঠেন-

"আব্বাজান! আমাকে শাহাদাতের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত করো না। আমার স্বামীর ইন্তেকালের পর আমার শুধু এই আশাটুকু বাকী রয়েছে যে ইসলামের জন্য লড়তে লড়তে শহীদ হবো এবং আমার স্বামীর সাথে গিয়ে মিলিত হবো।"

এই যুদ্ধে মুসলমানগণ বিজয়ী হন। পরবর্তীতে আরমেনিয়ার যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেন। আরমেনিয়ার যুদ্ধেও দ্রুত বিজয় অর্জন হয়। এই যুদ্ধের প্রেক্ষিতে বলখ শহরে কাফেরগণ মুসলমানদের সাথে যুদ্ধের জন্য একত্রিত হয়। সংবাদ পেয়ে পিতা হাশিম বিন উতবা (রা.) তাঁকে নিয়ে বলখ শহরে রওয়ানা করেন। সেখানেও অবিরাম লড়াই হয় এবং মুসলমানদের বিজয় অর্জিত হয়।

এই যুদ্ধের পর তিনি ফারগানার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। সেখানে তাঁর সাথে মাত্র চারশত মুজাহিদ ছিলেন। সেই যুদ্ধ খুবই কঠিন ও রক্তক্ষয়ী ছিলো। বড় বড় বীর বাহাদুরদের পা-ও সেখানে পিছলে যাচ্ছিলো। তিনি অত্যন্ত ধৈর্য, সাহসিকতা ও কৌশলের সাথে এই যুদ্ধে লড়াই করেন।

সন্তানকে জিহাদে প্রেরণে মায়েদের উৎসাহ প্রদান

ইসলামের ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকালে এ রকম অসংখ্য ধৈর্যশীল, সাহসী ও ত্যাগী মায়ের দেখা মিলবে যারা তাঁদের বুকের সন্তানকে দুলহানের সাজে সাজিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থাপন করেছেন এবং সন্তানকে বলেছেন, হে আমার বুকের মানিক! যদি তুমি যুদ্ধের ময়দান থেকে ফিরে এসো তাহলে আমি যে তোমাকে দুধ পান করিয়েছি তা স্বীকার করবো না। আঘাতে আঘাতে বিপর্যস্ত হয়ে যাবে, শহীদ হবে তবুও রণাঙ্গন থেকে মুখ ফিরাবে না। তুমি যদি শহীদ হয়ে যাও তাহলে আমি গর্ব করবো আর যদি ফিরে এসো, কাপুরুষতা দেখাও তা হলে আমি লজ্জিত হবো। এরকম কতিপয় মায়ের উদাহরণ পেশ করা হলো-

হজরত খানসা বিনতে আমের (রা.)-এর জিহাদী প্রেরণা

হজরত উমর (রা.)-এর খেলাফতকালীন অনুষ্ঠিত যুদ্ধসমূহের মধ্যে কাদিসিয়ার যুদ্ধ অন্যতম। এই যুদ্ধ একদিকে যেমন ছিলো ভয়াবহ অপরদিকে ছিলো ব্যাপক অর্থবহ। এই যুদ্ধে ইরানের বাদশাহ তার দুইলক্ষ সৈনিককে মুসলমানদের মুকাবিলার জন্য প্রেরণ করে। অপরদিকে মুসলিম মুজাহিদদের সংখ্যা ছিলো ত্রিশ- চল্লিশ হাজার এর মধ্যে। কাদিসিয়ার যুদ্ধে কোনো কোনো মুসলিম মুজাহিদদের সঙ্গে তাদের পরিবার পরিজনেরাও অংশ নেন। এ সুযোগে নিজের চার ছেলের সঙ্গে যুদ্ধ বহরে আসেন এক দুর্বল-অসুস্থ নারী। তাঁর নাম হজরত খানসা বিনতে আমের (রা.)। এশার নামাজের পর তিনি তাঁর চার ছেলেকে ডেকে সামনে নিয়ে বসেন। তিনি তাদেরকে উৎসাহ ও উদ্দীপনামূলক যে ভাষণটি দান করেন, ইতিহাসে তা সংরক্ষিত হয়েছে। নিচে তার কিছু অংশ তুলে ধরা হলো-

يَا بُنِيَّ إِنَّكُمْ أَسْلَمْتُمْ طَائِعِينَ، وَهَاجَرْتُمْ مُخْتَارِينَ، وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِنَّكُمْ لَبَنُو رَجُلٍ وَاحِدٍ، كَمَا أَنَّكُمْ بَنُو امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ، مَا خُنْتُ أَبَاكُمْ، وَلَا فَضَحْتُ خَالَكُمْ، وَلَا هَجَّنْتُ حَسَبَكُمْ، وَلَا غَيَّرْتُ نَسَبَكُمْ، وَقَدْ تَعْلَمُونَ مَا أَعَدَّ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الثَّوَابِ الْجَزِيلِ فِي حَرْبِ الْكَافِرِينَ، وَاعْلَمُوا أَنَّ الدَّارَ الْبَاقِيَةَ خَيْرٌ مِنَ الدَّارِ الْفَانِيَةِ، وَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، فَإِذَا أَصْبَحْتُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ سَالِمِينَ، فَاغْدُوا إِلَى قِتَالِ عَدُوِّكُمْ مُسْتَبْصِرِينَ، وَبِاللَّهِ عَلَى أَعْدَائِهِ مُسْتَنْصِرِينَ

"আমার প্রিয় সন্তানগণ! তোমরা আনুগত্য সহকারে ইসলাম গ্রহণ করেছো এবং স্বেচ্ছায় হিজরত করেছো। সেই আল্লাহর নামের কসম, যিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। নিশ্চয় তোমরা একজন পুরুষেরই সন্তান, যেমন তোমরা একজন নারীর সন্তান। আমি তোমাদের পিতার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করিনি, তোমাদের মাতুল কুলকেও লজ্জায় ফেলিনি এবং

তোমাদের বংশ ও মান-মর্যাদায় কোনো রকম কলঙ্ক লেপনও করিনি। তোমরা জানো, কাফিরদের বিপক্ষে জিহাদে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের জন্য কত বড় সওয়াব নির্ধারণ করে রেখেছেন। তোমরা এ কথাটি ভালো রকম জেনে নাও যে, ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবনের চেয়ে পরকালের অনন্ত জীবন উত্তম। মহামহিম আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! ধৈর্য ধারণ করো এবং কাফিরদের মোকাবিলায় দৃঢ়তা অবলম্বন করো। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাকো যাতে তোমরা তোমাদের উদ্দেশ্য লাভে সমর্থ হতে পার।' আগামীকাল সকালে তোমরা শত্রু নিধনে দূরদর্শিতার সাথে ঝাঁপিয়ে পড়বে। আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তার সাহায্য কামনা করবে।"

তাঁর কথার পর চার ছেলে বলে ওঠলেন, হে আমাদের আম্মাজান! ইনশাআল্লাহ! আমরা আপনার নির্দেশ পূর্ণরূপে পালন করবো। আপনি আমাদেরকে সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় দৃঢ় ও মজবুত পাবেন। সকালে ময়দানে পৌঁছে চার ভাই কবিতার কিছু লাইন আবৃতি করতে করতে ঘোড়া নিয়ে সবার আগে ছুটে যান। তখন হজরত খানসা (রা.)-এর চেহারায় বিস্ময়কর সাহসিকতার ছাপ দেখা যাচ্ছিলো। তিনি ছেলেদেরকে যুদ্ধের ময়দানে পাঠিয়ে আল্লাহর দরবারে বলছিলেন-

"হে আল্লাহ! জিহাদের জন্য আমার এই সামান্য কিছু উপকরণ ছিলো আমি সবটুকু তোমার হাওয়ালা করলাম, তুমি কবুল করে নাও।"

চার ভাই ময়দানে এমন বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করেন যে, কাফেরদের কেটে টুকরো টুকরো করছিলেন। অবশেষে শত্রুদের হাতেই তাঁরা শাহাদাত বরণ করেন। তাদের মা হজরত খানসা (রা.) সন্তানদের শাহাদাতের সংবাদ পেয়ে সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন এবং বললেন-

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي شَرَّفَنِي بِقَتْلِهِمْ، وَأَرْجُو رَبِّي أَنْ يَجْمَعَنِي بِهِمْ فِي مُسْتَقَرِّ رَحْمَتِهِ

"ঐ আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি যিনি আমার সন্তানদেরকে শাহাদাতের মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। আল্লাহর কাছে আশা কিয়ামতের দিন যেনো এই শহীদদের সঙ্গে তাঁর রহমতের ছায়াতলে আমাকে জায়গা দান করেন।"
ত্যাগ, ধৈর্য, তুষ্টিতে হজরত খানসা (রা.)-এর তুলনা তিনি নিজেই।

আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (রা.)-কে মায়ের উৎসাহ প্রদান

আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (রা.)-এর মায়ের নাম আসমা বিনতে আবুবকর ছিদ্দীক (রা.)। পুত্র আবদুল্লাহকে জীবনের শেষ সাক্ষাতের সময় তিনি যে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা, চারিত্রিক বল ও ঈমানী দৃঢ়তার সাথে সত্য ও ন্যায়ের পথে অবিচল থেকে শাহাদাতের পিয়ালা পান করার উৎসাহ-উদ্দীপনা দিয়েছিলেন, ইতিহাসের পাতায় তা চির অম্লান হয়ে আছে।

মারওয়ান ইবন হাকামের ইন্তেকালের সময় বনু উমাইয়্যার রাজত্ব কেবলমাত্র সিরিয়াতেই সীমাবদ্ধ ছিল। সিরিয়ার বাইরে সমগ্র ইসলামী বিশ্ব ছিল আব্দুল্লাহ (রা.)-এর তত্ত্বাবধানে। কিন্তু আব্দুল মালিক ইবন মারওয়ান সিংহাসনে আরোহণ করেই একের পর এক তাদের হারানো এলাকা পুনরুদ্ধার করতে শুরু করেন। এরূপ একদিন হিযাজের ওপর সৈন্য পরিচালনা করার সময় ও সুযোগ এসে যায়। হাজ্জাজ বিজয়ের সাথে অগ্রসর হচ্ছিল। ৭৩ হিজরীতে তার হাতে মক্কা অবরোধ এমন কঠোরতর পর্যায়ে পৌঁছাল যে, আব্দুল্লাহ (রা.)-এর সহচরগণ তার দল ত্যাগ করে হাজ্জাজের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতে লাগল।

তখন আব্দুল্লাহ (রা.) তার মাতার নিকট গিয়ে বললেন, 'মাত্র কয়েকজন সৈন্য আমার নিকট রয়েছে। এমতাবস্থায় আমি আত্মসমর্পণ করলে তাদের নিরাপত্তা লাভ করা যাবে। এখন আপনি আমকে কী পরামর্শ দেন?'
আসমা (রা.) একটু উচ্চস্বরে বলেন, 'ব্যাপারটি একান্তই তোমার নিজের। আর তুমি তোমার নিজের সম্পর্কে বেশি জানো। যদি তোমার দৃঢ় প্রত্যয় থাকে যে, তুমি হকের ওপর আছো এবং মানুষকে হকের দিকে আহ্বান করছো তাহলে যারা তোমার পতাকা তলে থেকে শাহাদাত বরণ করেছে, তাদের মতো তুমিও অটল থাকো। আর যদি তুমি দুনিয়ার সুখ-সম্পদের প্রত্যাশী হয়ে থাকো, তাহলে তুমি একজন নিকৃষ্টতম মানুষ। তুমি নিজেকে এবং তোমার লোকদের ধ্বংস করছো। পুরুষের মতো যুদ্ধ করো এবং জীবনের ভয়ে কোনো অপমানকে সহ্য কোরো না। অবমাননাকর জীবনের চেয়ে সম্মানের সাথে তরবারির আঘাত খেয়ে মৃত্যুবরণ করা শ্রেয়। তুমি শহীদ হলে আমি খুশি হবো। তুমি যদি এই ভেবে থাকো- তুমি একা হয়ে গেছো এবং আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই, তাহলে এই কর্মপদ্ধতি কোনো সম্মানীয় ব্যক্তির নয়। তুমি কত দিন বেঁচে থাকবে? একটি সুনাম ও সুখ্যাতি নিয়ে মরো। তাহলে আমি সান্ত্বনা খুঁজে পাব।'

তিনি বললেন, 'আমি সবকিছু দ্বীনের জন্যই করেছি। কিন্তু আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে, আমি নিহত হলে সিরিয়াবাসী আমার লাশের অবমাননা করবে।' আসমা (রা.) বললেন, 'নিহত

হওয়ার পর মানুষের ভয়ের কিছু নেই। যবেহ করা ছাগলের চামড়া ছেলার সময় সে কষ্ট পায় না।'

তারপর তিনি আকাশের দিকে মুখ উঠিয়ে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বলেন, 'ইলাহি! তুমি ভালো করেই জানো যে, আমি আমার মাকে যা কিছু বলেছি, তা কেবল তাকে সান্ত্বনা দানের জন্য। যাতে তিনি আমার অবস্থা দেখে কষ্ট না পান।'

আসমা (রা.) বলেন-

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَكَ عَلَى مَا يُحِبُّ وَأُحِبُّ

'সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর, যিনি তাঁর ও আমার পছন্দনীয় কাজের ওপর তোমাকে অটল রেখেছেন। আমার ছেলে, আমি আশা করি তোমার ব্যাপারে আমার ধৈর্য হবে অতুলনীয়। তুমি আমার সামনে নিহত হলে, তা হবে আমার সাওয়াবের উপলক্ষ্য। আর তুমি বিজয়ী হলে, তা হবে আমার জন্য আনন্দের বিষয়।'

বিদায় বেলায় ছেলেকে জড়িয়ে ধরতে গিয়ে আবার দূরে ঠেলে দিলেন। ছেলের বর্ম পরিধান করতে দেখে বললেন, আবদুল্লাহ, এ কী করছ তুমি? তিনি বললেন, 'আম্মা, এ তো আমার বর্ম।' আসমা (রা.) বললেন, 'বেটা, যারা শাহাদাতের অভিলাষী, এ তাদের পোশাক নয়।'

আবদুল্লাহ বললেন, 'মা আপনাকে খুশি করা ও আপনার হৃদয়ে প্রশান্তি দানের উদ্দেশ্যে আমি এ পোশাক পরেছি।

আসমা বললেন, 'হে আল্লাহ, আমি তাকে আপনারই নিকট সোপর্দ করেছি। তার জন্য আপনি যে ফয়সালা করবেন, তাতেই আমি রাজি। এর বিনিময়ে আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের প্রতিদান দান করুন।'

মা আসমা (রা.)-এর কথাগুলো আবদুল্লাহ (রা.)-এর অন্তরে প্রশান্তি বয়ে আনে। তিনি চলে যান এবং অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে যুদ্ধ করে শহীদ হন। মৃত্যুর পূর্বে তার মুখ থেকে নিচের চরণ দুটি উচ্চারিত হচ্ছিল-

أَسْمَاءُ يَا أَسْمَاءُ لا تَبْكِينِي ... لَمْ يَبْقَ إِلَّا حَسَبِي وَدِينِي وَصَارِمٌ لَاثَتْ بِهِ يَمِينِي

'আমার মা আসমা! আমি নিহত হলে আমার জন্য কাঁদবেন না। আমার আভিজাত্য ও আমার দ্বীনদারি ছাড়া আমার কিছুই অবশিষ্ট নেই। আর অবশিষ্ট আছে একখানি ধারালো তরবারি, যা দিয়ে আঘাত করতে করতে আমার ডান হাত দুর্বল হয়ে গেছে।'

সেদিন সূর্য অস্ত যাওয়ার আগেই আবদুল্লাহ (রা.) তার মহাপ্রভুর সাথে মিলিত হন।

আহমদ শাহ আবদালীর মায়ের জিহাদী প্রেরণা

আফগান শাসক আহমদ শাহ আবদালীর মা ছিলেন অত্যন্ত পুণ্যবান ও সতীসাধ্বি নারী। তাঁর অন্তর ছিলো দ্বীনের ভালোবাসায় পরিপূর্ণ। মারাঠিরা হিন্দুস্তান দখলের পর তারা যখন আফগানিস্তান পর্যন্ত তাদের সাম্রাজ্য বিস্তার করে তখন আহমদ শাহ আবদালী একটি বৈঠক ডাকেন। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় যে শত্রুকে প্রতিহত করতে কান্দাহার নামক স্থানে একটি কিল্লা স্থাপন করা হবে। তখনও বৈঠক চলছিলো, এমন সময় ভিতর থেকে ডাক আসে আহমদ শাহ আবদালীর প্রতি।

আহমদ শাহ ওঠে ভিতরে গিয়ে দেখেন তাঁর মা রাগে কাঁপছেন। তিনি তাকে দেখে আরেকটু বেশী ক্ষেপে ওঠলেন। আহমদ শাহ পেরেশান হয়ে গেলেন, তিনি মাকে জিজ্ঞেস করলেন, মা! সব কিছুই তো ঠিক ছিলো হঠাৎ কি হলো। তিনি রেগেমেগে বললেন-

"আমি কি তোর মতো সন্তান এ জন্য জন্ম দিয়েছি। তোকে কি এ জন্য দুধপান করিয়েছি! তোকে কি এ জন্য লালন-পালন করেছি যে, তুই হিন্দুস্তানের মারাঠিদের ভয়ে কেল্লায় আত্মরক্ষা করবি। তোর তো এটা করা উচিত ছিলো যে, তুই হিন্দুস্তানে গিয়ে মারাঠিদের কোমর ভেঙ্গে দিয়ে আসবি।"

আহমদ শাহ মাথা নিচু করে বললেন, আম্মা! আমি ক্ষমা চাচ্ছি। ইন শা আল্লাহ! আমি তোমার ইচ্ছে পুরা করবো।

এরপর আহমদ শাহ মারাঠিদের সঙ্গে লড়াইয়ের জন্য হিন্দুস্তানের পথে রওয়ানা করেন। তাদের সঙ্গে বেশ কয়েকটি যুদ্ধ করেন। সর্বশেষ পানিপথের যুদ্ধে এমনভাবে মারাঠিদের কোমর ভেঙ্গে দেন যে তারা আর দাঁড়াতে পারে নাই।

হজরত সাইয়্যিদ আহমদ শহীদ (র.)-এর মায়ের ঘটনা

এ রকম খুব কম মা-ই আছেন যারা আপন সন্তানকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেন। একবার সাইয়্যিদ আহমদ শহীদ (র.) জিহাদের ময়দানে যেতে চাইলে তার মামা যেতে দিলেন না। মা নামাজ পড়ছিলেন আর সাইয়্যিদ সাহেব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন; মা সালাম ফিরিয়ে মামাকে বললেন, 'ভাই অবশ্যই সাইয়্যিদ আহমদের প্রতি তোমার মায়া আছে তবে আমার চেয়ে বেশী নয়। এটা বাধা দেওয়ার বিষয় নয়। যাও আহমদ! আল্লাহর নাম নিয়ে যাও! কিন্তু পলায়ন করো না, যদি পলায়ন করো তাহলো কখনও তোমার চেহারা দেখবো না।'

মাওলানা মুহাম্মদ আলী জওহর (র.)-এর ঘটনা

মাওলানা মুহাম্মদ আলী জওহর ও মাওলানা শওকত আলী ছিলেন আপন দুই ভাই। তাদের মা ছিলেন নকশবন্দী তরীকায় বাইয়াত। ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনের সময় তিনি তার উভয় ছেলেকে স্বাধীনতার আন্দোলন করে শহীদ হওয়ার জন্য বের করে দেন-

কবি বলেন-

بولی اماں محمد علی کی
جان بیٹا خلافت پہ دے دو

অর্থ: মুহাম্মদ আলীর মা বললেন, ছেলে হে! প্রাণ বিলিয়ে দাও খিলাফতের তরে।

ইসলামে নারীর ইলমী ভূমিকা

ইসলামের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীদের যেমন ভূমিকা রয়েছে ইলমের ক্ষেত্রেও রয়েছে নারীদের অভাবনীয় ভূমিকা। ইসলাম ও মুসলমানদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো প্রতি যুগেই ধর্মীয় জ্ঞান ও ধর্মীয় কাজে পুরুষদের সাথে নারীরাও সমানভাবে অংশগ্রহণ করে এসেছে। শিক্ষা-দীক্ষা ও ধর্মের প্রচার-প্রসারে পুরুষদের সমান খেদমত মহিলারাও আজাম দিয়েছে। মহিলা সাহাবীগণ দ্বীনি জ্ঞান অন্বেষণের জন্য উন্মুখ হয়ে থাকতেন।

নবীযুগে নারীদের শিক্ষা-দীক্ষা

নবীযুগেও নারীদের দ্বীনি শিক্ষার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা ছিলো। তারা নবীজীর দরবারে পুরুষদের মত সরাসরি উপস্থিত হতেন না বরং ভিন্ন ব্যবস্থায় তাদেরকে শেখানো হতো। পুরুষ সাহাবীগণ ঘরের নারী ও শিশুদের কুরআন শেখাতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলা সাহাবীদের মাঝে আলাদাভাবে তাশরিফ নিয়ে যেতেন এবং তাদেরকে শেখাতেন, উৎসাহ দিতেন ওয়াজ-নসীহত করতেন।

মহিলা সাহাবীদের কোনো মাসআলা-মাসায়েল জানার প্রয়োজন হলে কিংবা কোনো বিষয়ে সন্দেহ দেখা দিলে তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছ থেকে জেনে নিতেন। কেউ কেউ হযরত আয়েশা (রা.) বা হযরত উম্মে সালামা (রা.)-এর মাধ্যমে জেনে নিতেন। আবার বয়োবৃদ্ধ ও আত্মীয় মহিলাগণ সরাসরিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করে নিতেন।

পুরুষ সাহাবীদের মত মহিলা সাহাবীদের মাঝেও আলেম, ফাযেল, ফকীহ মুহাদ্দিস, ও দীনি ইল্মে বুৎপত্তি লাভকারী অনেক মহিলা ছিলেন। হযরত আয়েশা (রা.) ফকীহুল উম্মত ছিলেন। হযরত উম্মে সালামা (রা.) ফকীহ ও মুফতী ছিলেন। হযরত যায়নাব বিনতে আবু সালামাহ (রা.) অর্থাৎ হযরত উম্মে সালামা (রা.)-এর আগের স্বামীর ঔরসজাত এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পালিত কন্যা। তার সম্পর্কে আছে যে-

وكانت من أفقه نساء أهل زمانها

"তিনি তার সময়ের নারীদের মাঝে সব চেয়ে বড় ফকীহ ছিলেন"।

তাবেয়ী হযরত আবু রাফে রহ. বলেন, মদীনার কোনো মহিলা ফকীহ বলতে আমি হযরত যায়নাব বিনতে আবু সালামাকেই বুঝি।”
হযরত উম্মে আবু দারদা আল কুবরা (রা.) অত্যন্ত ইবাদতগুজার, বুদ্ধিমতি, ও বহুবিধ জ্ঞানের অধিকারী একজন ফকীহ সাহাবী ছিলেন।

অনেক মহিলা সাহাবী লেখা-পড়া জানতেন। উম্মুল মুমিনীনদের মাঝে হযরত আয়েশা (রা.) ও হযরত উম্মে সালামা (রা.) পড়তে জানতেন। আর হযরত হাফসা (রা.) পড়তে জানতেন, লিখতেও জানতেন। হযরত শিফা বিনতে আবদুল্লাহ আদাবিয়্যাহ লিখতে জানতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তুমি হাফসাকে যেমন ফোড়া-ফুসকা

ভালো হওয়ার তদবির শিখিয়েছ তেমনি হাতের লেখাও শিখিয়ে দাও। হযরত উম্মে কুলসুম বিনতে উকবা (রা.) এবং হযরত কারীমা বিনতে মিকদাদ (রা.)-ও লিখতে জানতেন।

মহিলা আলেমা সাহাবীগণ যদিও পুরুষ আলেম সাহাবীদের মত হাদীসের দরসের আয়োজন করেননি কিন্তু তাদের থেকেও হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ফিকহী মাসায়েল ও ফতওয়া বর্ণিত হয়েছে।

মহিলা সাহাবীদের মাঝে অনেক কবিও ছিলেন। যাদের কবিতা বিভিন্ন কিতাবে পাওয়া যায়।

এই সব নারী সাহাবীদের অনুসরণ করে পরবর্তী যুগের মুসলিস নারীরাও ব্যাপকভাবে হাদীস, ফেকাহ, কবিতা, সাহিত্যসহ বহুবিধ জ্ঞানার্জনের পথে অগ্রসর হয়েছেন। পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে বড় বড় অবদান রেখেছেন। ঘরের ভেতরে, বাইরে, সর্বক্ষেত্রে, যুগে যুগে নিজেদের নাম ও কর্মের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

ইলমে কুরআনে নারী

কুরআন-সুন্নাহর প্রচার-প্রসার ও সংরক্ষণে নারীদের মেহনত ও কুরবানী, ত্যাগ ও মুজাহাদা কালোত্তীর্ণ হয়ে আছে। ঈমান আর ইহসানের সর্বোচ্চ শিখরে যেমন ছিলো তাদের পদচারণা তেমনি আল্লাহর শাশ্বত বাণী কুরআন হেফজকরণ, কুরআনের ব্যখ্যা-বিশ্লেষণ, তরজমা-তাহকীক, কুরআনের সংরক্ষণ ও কুরআনের ওপর আমলে যাদের তুলনা শুধু তারা নিজেরাই। নারীদের মধ্যে এ রকম অনেকেই ছিলেন যারা কুরআনের খিদমতকে নিজের জীবনের লক্ষ্য বানিয়ে নিয়েছিলেন। এ রকম অসংখ্য হাফেজা, কারীয়া, মুফাসসিরা ছিলেন যারা আপন যুগের মর্যাদাপূর্ণ শ্রেষ্ঠ আসনে সমাসীন হয়েছিলেন। নিম্নে তাদের ক'জনের আলোচনা পেশ করা হলো:

উম্মুল মুমিনীন হজরত আয়েশা (রা.)-এর মেধাবী ছাত্রীদের অন্যতম হাফসা বিনতে শিরিন (র.)। তাঁর উপনাম ছিলো উম্মে হুজাইল। হজরত আয়েশা (রা.)-এর ইলমী-আমলী ও আখলাকী গুণ সৌন্দর্যে অত্যন্ত প্রভাবান্বিত হন তিনি। ইবাদত, ফেকাহ ও ক্বেরাতে তিনি সর্বোচ্চ জ্ঞানের অধিকারিনী ছিলেন। তাঁকে তাবেয়ীদের সরদার খেতাবে ভূষিত করা হয়। হাফসা বিনতে শিরীন (র.) বারো বছর বয়সেই কুরআনে কারীম অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ হেফয করে ফেলেন। তিনি তাজবীদ ও ইলমে কেরাতের বিষয়েও দক্ষতা রাখতেন। হিশাম নামের একজন বর্ণনাকারী বলেন, যখন তার ভাই মোহাম্মাদ ইবনে শিরীন (র.) এর কোনো শাগরেদ ইলমে কেরাতের বিষয়ে কোনো সমস্যায় পড়তেন তখন তিনি তাকে বলতেন, যাও হাফসাকে জিজ্ঞেস কর; সে এটা কীভাবে পড়ে? হাফসা (র.) প্রতি রাতে অর্ধেক কুরআন তেলাওয়াত করতেন।

ফাতেমা নিশাপুরী (র.) প্রসিদ্ধ মুফাসসির ছিলেন। আধ্যাত্মিক জগতের সাম্রাজ্ঞী বলা হতো তাঁকে। কুরআনের তরজমা ও তাফসীরে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন তিনি। যে কেউ তাঁর তাফসীর শুনে আশ্চর্যান্বিত হতো। তাঁর যুগের প্রখ্যাত ওলী আওলীয়াগণও তাঁর কাছে থেকে তাসাউফ ও মারিফাতের ইলম অর্জন করেন। হজরত বায়েজিদ বুস্তামী ও যুননূন মিসরী (র.)- এর মতো বুযুর্গও তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন। বায়েজিদ বুস্তামী (র.) বলেন, আমি আমার সম্পূর্ণ জীবনে একজন পরিপূর্ণ নারী দেখেছি। তিনি হলেন, ফাতেমা নিশাপুরী (র.)। তাঁকে যে বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছি অবগত হয়েছি। ইবনে মুলুক নামের একজন বুযুর্গ তার সম্পর্কে বলেছেন যে, আমি তার মত বুযুর্গ মহিলা আর দেখিনি। একদিন আমি তার জ্ঞান সম্পর্কে বিস্ময় প্রকাশ করে হযরত যুননূন মিসরীকে জিজ্ঞেস করলাম যে, এই মহিলা কে? তিনি উত্তর করলেন, ইনি আল্লাহ তাআলার একজন প্রিয় ওলি এবং আমার শিক্ষিকা।

আমাতুল ওয়াহেদ বিনতে মাহামিলী (র.) একজন আলেমা, ফায়েলা, ফকীহা ও মুফতিয়াহ (র.) হওয়ার পাশাপাশি একজন হাফেজায়ে কুরআনও ছিলেন।

ইমাম যিয়াউদ্দীন মাকদিসী (র.)-এর বোন আসিয়া তার যুগের একজন অদ্বিতীয়া আবেদা, যাহেদা ও হাফেজায়ে কুরআন ছিলেন। এমনিভাবে তার স্ত্রী আসিয়া বিনতে মোহাম্মাদ ইবনে খালাফ মাকদাসিয়্যাহ কুরআনের আলেমা ছিলেন। উলুমে কুরআনের উপর তার দক্ষতার প্রসিদ্ধি ছিলো। ইলমে তাজবীদ ও ইলমে কেরাত সম্পর্কেও বিশেষ আগ্রহ রাখতেন।

ইমাম যাইনুদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনে ইবরাহীম কারী দামেশকী মিসরী (র.) অনেক বড় মাপের ফকীহ, মুফাসসির ও ওয়াওয়েজ ছিলেন। তার এইসব গুণ অর্জিত হয়েছিলো তার মায়ের দোয়ার বরকতে; যিনি নিজেও অত্যন্ত নেককার, কুরআনের হাফেযা ও মুফাসসিরা ছিলেন। নাসেহউদ্দীন নামের একজন বর্ণনাকারী বর্ণনা করেন যে, ইমাম যাইনুদ্দীন (র.) বলেছেন,

أنا أسعد بدعاء والدتي، كانت صالحة حافظة، تعرف التفسير
আমি আমার মায়ের দোয়ার বরকতে এই সৌভাগ্যের অধিকারী হয়েছি। আমার মা বড়ই নেককার, কুরআনের হাফেযা ও মুফাসসিরা ছিলেন।

ইমাম যাইনুদ্দীন (র.) বলেন, আমি যখন আমার মামা ইমাম শারাফুল ইসলাম আবদুল ওয়াহ্হাব (র.) থেকে তাফসীরের দরস গ্রহণ করে আমার মায়ের কাছে যেতাম তখন তিনি জিজ্ঞেস করতেন, আজ আমার ভাই কী তাফসীর করলেন? উত্তরে আমি যখন বলতাম যে, অমুক অমুক সূরা থেকে তাফসীর করেছেন। তখন তিনি জিজ্ঞেস করতেন, অমুকের বক্তব্য নকল করেছেন কি? অমুক আলোচনাটি কি করেছেন? আমি যখন বলতাম যে, করেননি। তখন তিনি নিজেই সেসব আলোচনা করে বলতেন এই এই জায়গাগুলো সে ছেড়ে দিয়েছে। তাঁর অবস্থা এই ছিলো যে-

كانت تحفظ كتاب " الجواهر " وهو ثلاثون مجلد، تأليف والدها الشيخ أبي الفرج، وأقعدت أربعين سنة في محرابها
তিনি তাঁর পিতার লিখিত ত্রিশ খণ্ডের তাফসীর গ্রন্থ আল জাওয়াহের মুখস্ত করে ফেলেছিলেন। তিনি একাধারে চল্লিশ বছর নিজের নিভৃত্য কক্ষে ইবাদতে কাটিয়েছেন।

মাইমূনা বিনতে আবু জাফার মাদানিয়্যাহ (র.) প্রসিদ্ধ কারি ও তাজবীদ বিশারদ ছিলেন। তিনি এই জ্ঞান অর্জন করেছিলেন তার বাবা থেকে। আর তার থেকে গ্রহণ করেছে অন্যরা।

ইমামুল কুররা ইবনে জাযারী (র.) নিজের কন্যা সালমা সম্পর্কে লিখেন যে, সে সাত কেরাতে কুরআন মুখস্ত করে শুনিয়েছে। দশ কেরাত সম্পর্কেও তার যথেষ্ট জ্ঞান ছিলো। সে ইলমে তাজবীদ সম্পর্কে এই পরিমান জানতো যে, সেইসময় কোনো কারী বা তাজবীদ বিশারদ তার সমপর্যায়েও আসতে পারতো না।

ইবনে তাগরিবারদী (র.) আন নুজুমুয যাহিরা গ্রন্থে লিখেন যে, খলিফা হারুনুর রশিদ (র.)-এর স্ত্রী যুবাইদা (র.)-এর মহলে হাজার দাসি কুরআন তেলাওয়াত করতেন। তাদের সম্মিলিত তেলাওয়াতের আওয়াজ মৌমাছির গুঞ্জনের মত শোনা যেতো।

মুসলিম নারীরা কুরআনের অনুলিপি তৈরীর খেদমতও আঞ্জাম দিয়েছে। ইবনে ফাইয়ায আখবারে কুরতুবায় লিখেছেন যে, কুরতুবা শহরের পূর্বাঞ্চলে প্রায় একশত সত্তর জন নারী 'কুফী' লিখন-পদ্ধতিতে কুরআনে কারীমের অনুলিপি তৈরী করতো। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, এই একটি অঞ্চলে যদি এতো জন নারী কুরআনের এই খেদমত আঞ্জাম দিয়ে থাকে তাহলে পুরে কুরতুবায় কত নারী এ কাজের আগ্রহ রাখতেন!

হিন্দুস্তানের মুঘল বাদশা শাহজাহানের নাতনি শাহজাদী শাদখানেম 'রায়হান' লিখন-পদ্ধতিতে নিখুঁতভাবে কুরআনের একটি অনুলিপি তৈরী করেছিলো। এই অনুলিপিটির শেষে 'রুকআ' লিখন-পদ্ধতিতে নিজের নাম ও বংশপরিচয় লেখা রয়েছে।

ইলমে হাদীসে নারী

ইসলাম ও মুসলমানদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, যখনই ইসলামী জ্ঞানের কোনো শাখায় কাজ করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, আল্লাহ আআলা তার উপযোগী করে বহু পুরুষ আলেম যেমন পাঠিয়েছেন, নারী আলেমদেরও বিরাট একটি দল তৈরী করে দিয়েছেন, যারা সফলতার সাথে ইলমের বিভিন্ন শাখায় দৃষ্টান্তমূলক খেদমত আঞ্জাম দিয়ে গেছেন।

হাদীস বর্ণনা এবং সংকলনে নারীদের ভূমিকা

হিজরী প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে সমগ্র ইসলামী জগতে হাদীস ও আসার বর্ণনা ও সংকলণের ধারাবাহিকতা শুরু হয়। তখন দ্বীনের প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করে বাইরের জগতের মত অন্দরমহল থেকেও সহযোগিতা গ্রহণ করা হয়। প্রতিটি ঘরে খুঁজে হাদীস সংকলন ও বিন্যাস করা হয়। নারীরা পরিবারের বৃদ্ধা সাহাবী ও তাবেয়ীদের কাছে থাকা হাদীসগুলো সংগ্রহ করে পুরুষদের কাছ বর্ণনা করেন। যেসব মুসলিম নারীর কাছে হাদীসের সংগ্রহ ছিলো, তাদের খুঁজে বের করে সেসব সংগ্রহগুলো একত্রিত করা হয়। যেমন হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযিয (র.) হযরত আবু বকর ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে হাযম (রা.)-কে বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন আমরাহ বিনতে আবদুর রহমান আনসাই (রা.)-এর সংগৃহীত হাদীসগুলো তাঁর থেকে সংগ্রহ করা হয়।

এ ছাড়াও নারীদের মধ্যে যাদের কাছে যে হাদীস সংরক্ষিত ছিলো তারা সে হাদীসগুলো পরিবারের অন্যদের কাছে বর্ণনা করেন। হযরত আমরাহ বিনতে আবদুর রহমান আনসারী (রা.) হাদীস বর্ণনা করেছেন উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.), নিজের বোন উম্মে হিশাম (রা.), হাবিবা বিনতে সাহল (রা.), এবং উম্মে হাবিবা ও হামনা বিনতে জাহাস (রা.), থেকে। আর তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন তাঁর আপন পুত্র আবুর রিজাল, ভাই মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান, নাতি হারেসা ইবনে আবুর রিজাল, ভাতিজাদ্বয় ইয়াহইয়া ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান ও আবু বকর ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান এবং তাদের পুত্র আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ।

ইমাম হাসান বসরী (র.)-এর মা খায়রাহ (র.) তাঁর মালকিন উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামা (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার থেকে বর্ণনা করেছেন তার দুই পুত্র হযরত হাসান বসরী ও হযরত সাঈদ বসরী (র.)।

সাফিয়্যাহ বিনতে উলাইবাহ আম্বারী (র.) তার দাদা হারমালাহ ইবনে আবদুল্লাহ আম্বারী ও দাদি কায়লাহ বিনতে মাখরামাহ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার থেকে বর্ণনা করেছেন তার নাতী আবদুল্লাহ ইবনে হাসসান আম্বারী (র.)।
রায়েতাহ ইবনে মুসলিম (র.) তার পিতা মুসলিম থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার থেকে বর্ণনা করেছেন তারই পুত্র আবদুল্লাহ ইবনে হারেস আম্বারী মাক্কী (র.)।
ফাতেমা বিনতে হুসাইন ইবনে আলী হাশেমী মাদানী (র.) হাদীস বর্ণনা করেন তার পিতা হযরত হুসাইন (রা.), ভাই আলী ইবনে হুসাইন (রা.) (যার অপর নাম যাইনুল আবেদীন), ফুফু হযরত যায়নাব বিনতে আলী এবং দাদী হযরত ফাতেমা (রা.) থেকে। তার থেকে বর্ণনা করেন তার সন্তান হযরত আবদুল্লাহ, ইবরাহীম ও উম্মে জাফর (র.)।
হুকাইমাহ বিনতে উমাইমাহ হাদীস বর্ণনা করেন তার মা উমাইমাহ বিনতে রুকাইকাহ (রা.) থেকে। আর তার থেকে বর্ণনা করেন তার ঘরের অন্যান্য সদস্যগণ।

আসমা বিনতে ইয়াযিদ কাইসী বসরী হাদীস বর্ণনা করেন তার চাচাতো ভাই আনাস (রা.) থেকে।
হুকাইমাহ বিনতে উমাইয়াহ ইবনে আখনাস হাদীস বর্ণনা করেন উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামাহ (রা.) থেকে। আর তার থেকে বর্ণনা করেন তার পুত্র ইয়াহইয়া ইবনে আবু সুফিয়ান আখনাসী (র.)।

উম্মে রায়েহ রবাব বিনতে সুলাই দব্বী বসরী (র.) হাদীস বর্ণনা করেন আপন চাচা সালমান ইবনে আমের দব্বী থেকে। আর তার থেকে বর্ণনা করেন হাফসা বিনতে সীরীন (র.)।

তামান্না বিনতে ওমর ইবনে ইবরাহীম ইবনে জামরী তায়্যিক্ষী (র.) হযরত আবুল মুযাফ্ফর আলী ইবনে আহমাদ কারখী থেকে, আর তার থেকে বর্ণনা করেন তার দুই পুত্র আহমাদ ইবনে আবু বকর ইবনে বান্দানীজী ও তামীম ইবনে আবু বকর ইবনে বান্দানীজী।

হাবাবাহ নামে একজন মুহাদ্দিসা মালেক ইবনে দাইগাম এর খালা ছিলেন। তিনি হযরত আলী (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তার থেকে বর্ণনা করেন তার ভাগিনা মালেক ইবনে দাইগাম (র.)।

উম্মে হুবাবাহ বিনতে হাইয়ান 'জঙ্গে জামালে' উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.) এর সাথে ছিলেন। তিনি উম্মুল মুমিনীন (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। আর তার থেকে বর্ণনা করেন তার ভাই মুকাতিল ইবনে হাইয়ান।

হুকাইমাহ নামের আরেকজন তাবেয়ী হযরত আয়েশা (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর তার থেকে বর্ণনা করেছেন তার মেয়ে উম্মে আসেম।

বুররাহ বিনতে রাফে উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালামাহ (রা.)-এর আজাদকৃত দাসী, তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন যায়নাব বিনতে জাহাশ (রা.) থেকে। আর তার থেকে বর্ণনা করেছেন তার ভাই আবদুল্লাহ।

উম্মে জানুব বিনতে নুমায়লাহ তার মা সুয়াইদাহ বিনতে জাবের থেকে হাদীস বর্ণনা করেন, আর তার থেকে বর্ণনা করেন মুহাম্মাদ ইবনে বাশশার বুনদার (র.)-এর উস্তায আবদুল হামীদ ইবনে আবদুল ওয়াহেদ।

উম্মে মক্কীয়্যাহ আমেনা বিনতে ইনান ইবনে হাসান উযরিইয়াহ মক্কীয়্যাহ আপন স্বামী শাইখ আবুল আব্বাস কাসতালানী এবং পুত্র আমীনুদ্দীন কাসতালানীকে তার থেকে হাদীস বর্ণনা করার অনুমতি দিয়েছেন।

উম্মে আবদুর রহমান জুরজানী থেকে তার স্বামী মুহাম্মাদ ইবনে আলী জুরজানী হাদীস বর্ণনা করেছেন।

উম্মে আমর বিনতে হাসসান বাগদাদী তার পিতা আবুল গদ হাসসান ইবনে যায়েদ ও স্বামী সাঈদ ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে কায়েস থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।

এ কয়েকটি উদাহরণ থেকেই এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে, প্রথম শতাব্দি থেকে শুরু করে পরবর্তী যুগপরম্পরায় মুসলিম মহিলাদের মাধ্যমে পরিবারের সদস্যদের কাছে থাকা হাদীস ও আসারগুলোর সংগ্রহ, সংকলন ও প্রচার-প্রসার কীভাবে হয়েছে। এই মহীয়সী নারীরা প্রকৃতই তাদের ঘরকে দারুল হাদীস ও দারুল ইলম তথা হাদীস ও ইলম চর্চার কেন্দ্র বানিয়ে রেখেছিলেন।

হাদীস অন্বেষণে নারীদের সফর

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস সংগ্রহের নেশায় মুহাদ্দিসগণের পদধূলিতে ইসলামী শহর ও নগরসমূহ বরকতময় হয়ে উঠেছে। প্রথম দিকে এইসব সফর হতো শুধু হাদীস ও আসার বর্ণনা ও সংকলণের উদ্দেশ্যে। পরবর্তীতে হাদীসের উন্নত সনদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যও এর সাথে যুক্ত হয়েছে। হাদীস সংগ্রহের জন্য পুরুষ মুহাদ্দিস ও রাবীগণের মত মহিলা মুহাদ্দিস ও রাবীগণও ঘর-বাড়ি ছেড়ে দেশে দেশে, দূরদূরান্তে সফর করেছেন এবং নিজেদের সাধ্য ও যোগ্যতা অনুযায়ী দারিদ্রতা ও পরদেশীর জীবনযাপন করেও ইলমেদীন অর্জন করেছেন।

উম্মে হুসাইন জুদআ বিনতে আহমাদ মাহমিয়্যাহ স্বদেশভূমী নিশাপুর ছেড়ে বাগদাদে চলে গিয়েছিলেন এবং সেখানকার শায়েখ ও মুহাদ্দিসদের থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। শায়েখ আবুল হাসান মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ শুরুতী বাগদাদী তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।

উম্মে আলী তাকিইয়াহ বিনতে আবুল ফারাজ গায়েস ইবনে আলী সূরী বাগদাদী মিসরে গিয়ে দীর্ঘকাল অবস্থান করেন এবং ইস্কান্দারিয়ায় ইমাম আবু তাহের আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ সিলাফী থেকে ইলম অর্জন করেন।

যুলাইখা বিনতে ইলিয়াস ইবনে ফারেস ইবনে ইসমাঈল আল ওয়ায়েজাহ গজনবী শহরের অধিবাসী ছিলেন। সেখান থেকে তিনি মক্কা মুকাররমায় যান এবং মক্কার উলামা ও মুহাদ্দিসদের থেকে হাদীস সংগ্রহ করে কয়েক বছর পবিত্র হারামের সান্নিধ্যে থেকে ফারেসের বিসাওয়াহ শহরে চলে যান। হারামের সান্নিধ্যে থেকে তিনি ইলম ও এবাদত দু'টি নেয়ামতই অর্জন করেন।

উম্মে মুহাম্মাদ যায়নাব বিনতে আহমাদ ইবনে ওমর রহ.-এর স্বদেশভূমি ছিলো বাইতুল মুকাদ্দাস। ইমাম শামসুদ্দীন যাহাবী তার উপাধী দিয়েছেন "আল মুআম্মারাতুর রাহেলাহ" কারণ তিনি দূর দূরান্তে সফর করে করে ইলম অর্জন ও হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে বিখ্যাত ছিলেন। পরবর্তীতে তার কাছেও দূর দূরান্ত থেকে হাদীস অন্বেষণকারীগণ আসতেন এবং তার থেকে হাদীস বর্ণনা করতেন। ৪২

আহলে ইলম ও মুহাদ্দিসদের নিকট হারামাইনের সফর খুব কাঙ্খিত একটি বিষয় ছিলো কারণ হজ আদায়ের পাশাপাশি স্থানীয় ও বহিরাগত উলামা ও মুহাদ্দিসীন থেকে ইলম অর্জন ও হাদীস বর্ণনার সুযোগও তারা পেয়ে যেতেন। এ ক্ষেত্রেও পুরুষদের মত মহিলা আলেম ও মুহাদ্দিসদের কৃতিত্বও দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। তারাও হারামাইনে অবস্থান গ্রহণ করে ইবাদতের পাশাপাশি ইলমের ময়দানে ইলম অর্জন ও দরস প্রদানের কাজে সরব ছিলেন।

আসমা বিনতে মুহাম্মাদ ইবনে সালেম (র.) বার বার হারামাইনে সফর করতেন এবং সেখানের উলামায়ে কেরাম থেকে ইলম অর্জন করতেন।

কারীমাহ বিনতে আহমাদ মারওয়াজিয়্যাহ (র.) খুরাসানের প্রসিদ্ধ শহর মারওয়া-র অধিবাসী ছিলেন। তিনি সারাজীবনের জন্য মক্কা মোকাররমায় চলে আসেন এবং দীর্ঘদিন সেখানে হাদীসের দরস দেন। খতীব বাগদাদী এই মক্কাতেই মাত্র পাঁচ দিনে বুখারী শরীফ তাকে শুনিয়ে খতম করে বর্ণনা করেন।

উম্মে মুহাম্মাদ হাদিয়্যাহ বিনতে আলী ইবনে আসকার আল হারাস মাকদেসী (র.) ইমাম যাবীদী থেকে হাদীস বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে তার দেশে সফর করেন।

আমাতুর রহমান সিততুল ফুকাহা বিনতে শায়েখ তাকিউদ্দীন (র.) শুধুমাত্র 'জুযউ ইবনে আরাফাহ' শোনার জন্য শায়েখ আবদুল হক রহ.-এর খেদমতে যান।

আয়েশা বিনতে মুহাম্মাদ হাররানিয়াহ (র.) ইমাম যইনুদ্দীন ইরাকী ও ইমাম বালখী (র.) থেকে হাদীস বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে তাদের পাঠদানকেন্দ্রে গমন করেন।

মারয়াম বিনতে আহমাদ বা'লাবাক্কাহ (র.) শায়েখ বাহাউদ্দীন (র.) এবং উম্মে মুহাম্মাদ শুহদাহ বিনতে কামালুদ্দীন (র.) শায়েখ কাশগরীর দরসে গিয়ে হাদীস বর্ণনা করেন।

শামসুদ্দোহা বিনতে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল জলীল (র.) আলেম, ইবাদতগুজার, দুনিয়াবিরাগী একজন মহিলা ছিলেন। তিনি শাইখুত্তরীকাহ আবুন নজীব সোহরাওয়ার্দী (র.)-এর খেদমতে থেকে তাসাওউফের দীক্ষা ও প্রশিক্ষণ লাভ করেন এবং পাশাপাশি বিভিন্ন মুহাদ্দিস থেকে হাদীস শোনেন।

এভাবে বহু নারী আলেম ও মুহাদ্দিস যুগের বড় ও প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসদের থেকে হাদীস শ্রবণ ও বর্ণনার উদ্দেশ্যে দূরদূরান্তে সফর করতেন। এখানে একটি বিষয় জেনে রাখা প্রয়োজন যে, এইসব ইলম অন্বেষণকারীনীদের শিক্ষাসফরগুলোতে তাদের যাবতীয় প্রয়োজন ও পরিপূর্ণ উপযোগিতা রক্ষা করেই হতো। সফরে মাহরাম ও পরিবারের দায়িত্বশীল পুরুষগণ থাকতেন।

ছাত্রীদের জন্য পৃথক পাঠকক্ষ ও পর্দা-ব্যবস্থা

এই সব ছাত্রী ও মুহাদ্দিসাদের জন্য শায়েখ ও মুহাদ্দিসদের শিক্ষালয়ে পৃথক জায়গা থাকতো, যেখানে বসে পুরষদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে পর্দার আড়াল থেকে শায়েখের দরস শুনতেন।

মুসলিম বিশ্বের পশ্চিম অংশের মহিলা আলেম ও মুহাদ্দিসদের মধ্যে হযরত উম্মে হানী আবুসিয়্যাহ (র.) ও তার বোন ফাতেমা আবুসিয়্যাহ (র.) সেখানকার প্রসিদ্ধ একটি ইলমী পরিবারের সদস্য ছিলেন এবং তারা উভয়েই ফকীহ ও মুফতী ছিলেন। তাদের সাথে শায়েখ যাওরাক (র.)-এর দাদি উম্মে বানীন (র.) ও আরো অনেক আলেম ও মুহাদ্দিস মহিলা শায়েখ আবদস (র.)-এর হাদীসের দরসে অংশগ্রহণ করতেন এবং 'কুরাবিয়্যিনের' অন্যান্য মাশায়েখদের মত তার ওখানেও মহিলাদের জন্য আলাদা বসার জায়গা ছিলো।
ঐতিহাসিকগণ লিখেন-

'এই সব সম্মানিতা মহিলাগণ এমন জায়গায় বসে পাঠ গ্রহণ করতেন, যে জায়গা আলাদাভাবে শুধু তাদের জন্যই নির্ধারিত থাকতো। আর 'কুরাবিয়্যিন' শহরে এমন পৃথক ব্যবস্থা অনেক ছিলো যেখানে বসে মহিলাগণ বড় বড় শায়েখ ও মুহাদ্দিসদের থেকে সহজেই পাঠ শুনতে পেতেন এবং পুরুষরা যে পাঠ শুনতেন মহিলরাও তা পুরোপুরি শুনতেন।'

নারীদের হাদীস বর্ণনার অনুমতি লাভ

ইলম অন্বেষণকারী ছাত্রী ও আলেমাদের ইলমী পিপাসা এবং ইলম অর্জনের জন্য তাদের সফরের কষ্টের কথা বিবেচনা করে মুহাদ্দিসগণ তাদের অনুপস্থিতিতেই নিজের পক্ষ থেকে হাদীস বর্ণনার অনুমতি দিয়ে পাঠাতেন। অনেক মুহাদ্দিস মহিলা মুহাদ্দিসা ও রাবীদেরকে এই পদ্ধতিতে অনুমতি প্রদান করে নিজের শাগরেদ হিসাবে গ্রহণ করে নিতেন। এরকম অনেক নারী মুহদ্দিসও এভাবে পুরুষ মুহাদ্দিসদের অনুমতিপত্র পাঠাতেন।
মুহাদ্দিসদের পক্ষ থেকে মুহাদ্দিসাদের হাদীস বর্ণনার অনুমতি লাভের কয়েকটি উদাহরণ-

শায়েখ সদরুদ্দীন তাওয়াস (র.)-এর কন্যা উম্মে মোহাম্মাদ আয়েশা দিমাশকিয়্যা (র.)-কে আবুল কাসেম ইবনে কুমাইরাহ ইবনে মাসলামাহ, মাক্কী ইবনে উলওয়ান, বাহাউদ্দীন যুহাইর, ইবনে যাইলাক, সুলাইমানী ও নূর ইবনে সাঈদ প্রমূখ মুহাদ্দিসগণ তাদের বর্ণনাসমূহ বর্ণনা করার অনুমতি দিয়েছেন।

উম্মে কামাল আয়েশা বিনতে কাজি শিহাবুদ্দীন আহমাদ ইবনে যাহিরাহ (র.)-কে মোহাম্মাদ ইবনে আলী কাত্রাওয়ানী, মোহাম্মাদ ইবনে ইয়াকুব ইবনে রাসসাস, কাজি নাসিরুদ্দীন মোহাম্মাদ ইবনে মোহাম্মাদ তিউনুসী মালেকী, আবুল হারাম মোহাম্মাদ ইবনে মোহাম্মাদ কলানেসী প্রমূখ মুহাদ্দিসগণ ছাড়াও আরো অনেক মুহাদ্দিস নিজেদের বর্ণনাসমূহ বর্ণনা করার অনুমতি দিয়েছেন।

উম্মে ইবরাহিম ফাতেমা বিনতে খতীব ইজ্জুদ্দীন ইবরাহিম ইবনে আবদুল্লাহ (র.) বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইবরাহিম ইবনে খলিল (র.)-এর সর্বশেষ শাগরেদ ছিলেন। তিনি মোহাম্মাদ ইবনে আবদুল কাদের, ইবনে আওয়াহ এবং খতীবে মারওয়া থেকেও বর্ণনার অনুমতিপ্রাপ্ত সর্বশেষ শাগরেদ।

আজিবাহ বিনতে হাফেয আবু বকর মোহাম্মাদ ইবনে আবু গালেব ইবনে আহমাদ ইবনে মারজুক বাকিদারী বাগদাদী রহ. মাসউদ সাকাফী (র.) ও আবু আবদুল্লাহ রুস্তমী (র.) প্রমূখ শায়েখদের থেকে বর্ণনার অনুমতিপ্রাপ্ত সর্বশেষ শাগরেদ ছিলেন।

উম্মে খায়ের জুয়াইরিয়্যাহ বিনতে কাজি যাইনুদ্দীন তবারিয়্যাহ মক্কীয়্যাহ রহ.-কে বিভিন্ন দেশ ও শহরের উলামা ও মুহাদ্দিসগণ নিজের বর্ণনাসমূহ বর্ণনার অনুমতি প্রদান করে ধন্য করেছেন। মিসর থেকে মোহাম্মাদ ইবনে কাম্মাহ, ইবনে আ'লী, দিমইয়াতী, আহমাদ ইবনে

কুশতুগদী, আবু নুআইম ইবনে ইসইরদী, আহমাদ ইবনে আলী মুসতাওলী প্রমূখ শায়েখগণ এবং দিমাশুক থেকে আহমাদ ইবনে আলী ইবনে জাযারীসহ আরো অনেক মুহাদ্দিস নিজেদের পক্ষ থেকে হাদীস বর্ণনার অনুমতি দিয়েছেন।

যায়নাব বিনতে যিয়াউদ্দীন মোহাম্মাদ ইবনে ওমর কুসতানিয়াহ মক্কীয়্যাহ রহ-কে বাগদাদ থেকে ইবরাহীম ইবনে খাইরুদ্দীন, আবু জাফার ইবনে সাঈদ, ফাদলুল্লাহ ইবনে আবদুর রাজ্জাক জিলী ও ইমাম রযিউদ্দীন হাসান সনআনী লাহোরী লিখিত অনুমতিপত্র পাঠিয়েছিলেন।

সিত্তুলকুল বিনতে ইমাম রযিউদ্দীন (র.)-কে মিসরের মুহাদ্দিসদের একটি জামাত হাদীস বর্ণনার অনুমতি দিয়েছেন। তাদের মধ্যে সায়্যেদা বিনতে মুসা ইবনে উসমান ও দিরবাস মারানীর কথা বিশেষভাবে উল্যেখযোগ্য।

উম্মে মুআইয়িদ যায়নাব বিনতে আবুল কাসেম আবদুল কাসেম আবদুর রহমান নিশাপুরী (র.) সম্পর্কে ইবনে খালকান (র.) লিখেছেন যে, তিনি অনেক বড় আলেমা ছিলেন। তিনি একদল আলেমের কাছ থেকে হাদীসের ইলম অর্জন করেছেন, কারো মজলিসে গিয়ে হাদীস শুনেছেন, কারো কাছ থেকে হাদীস বর্ণার অনুমতি পেয়েছেন। তাকে অনুমতি দানকারী আলেমদের মধ্যে হাফেয আবুল হাসান আবদুল গাফের ইবনে ইসমাঈল ফারেসী ও কাশশাফের লেখক আল্লামা মাহমুদ ইবনে ওমর যামাখশারী প্রমুখের মত বড় বড় হাফেয ও সাইয়েদগণ রয়েছেন।

সনদ প্রদানকারীনী

মহিলা মুহাদ্দিসদের মাঝেও এতো বড় বড় আলেম নারীরা ছিলেন যারা হাদীসের সনদের ক্ষেত্রে এমন বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন যে, বড় বড় উলামা ও মুহাদ্দিসগণও তাদের থেকে সনদ গ্রহণ করতেন। সেইসব সনদ দানকারীনীদের কয়েকজন হলেন-

উম্মে মোহাম্মাদ আসমা বিনতে মোহম্মাদ ইবনে সালেম ইবনে আবু মাওয়াহেব।

উম্মে মোহাম্মাদ ফাতেমা বিনতে ইবরাহীম ইবনে মাহমুদ বা'লিয়্যাহ (মুসনিদাতুশশাম)।

উম্মে আবদুল্লাহ যায়নাব বিনতে আহমাদ ইবনে আবদুর রহীম কুদসিয়্যাহ (মুসনিদাতুশশাম)।

কারীমা বিনতে আবদুল ওয়াহহাব ইবনে আলী ইবনে খিজির কুরাইশী যুবায়রিয়্যাহ (মুসনিদাতু মাক্কাহ)।

ফাতেমা বিনতে আহমাদ ইবনে কাসেম হারাজী (মুসনিদাতুল ওয়াকত)।

সিত্তুল উজারা বিনতে ওমর ইবনে আসআদ তানুখিয়্যাহ।

নারী মুহাদ্দিসদের উপাধি

পুরুষ আলেম ও মুহাদ্দিসদের মত নারী আলেম ও মুহাদ্দিসগণকেও বড় বড় দীনি ও ইলমী উপাধি দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছে। নীচে সেইসব মুসলিম মহিলাদের মধ্য থেকে কয়েকজনের নাম ও উপাধি উল্লেখ্য করা হলো যারা একেকজন ইল্মের বড় বড় ভাণ্ডার ছিলেন এবং দীন ও ইল্মের পথে তাদের নেত্রীত্ব মুসলিমজাহান স্বীকার করে নিয়েছে।

সিত্তুল আজনাস: মুওয়াফ্ফাকিয়্যাহ বিনতে আবদুল ওয়াহহাব ইবনে আতিক ইবনে ওয়ারদান।
সিত্তুল আহল: উম্মে আহমাদ বিনতে উলওয়ান ইবনে সাঈদ বা'লাবাব্দিয়্যাহ।
সিত্তুশশাম: খাতুন বিনতে নাজমুদ্দীন আইয়ূব ইবনে শাযী ইবনে মারওয়ান।

সিত্তুল আরব: উম্মে খায়ের বিনতে ইয়াহইয়া ইবনে কামায কিন্দিয়্যাহ দিমাশকিয়্যাহ।
সিত্তুল ফুকাহা: শারীফা বিনতে খতীব শারফুদ্দীন আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ দিমাশকিয়্যাহ।
সিত্তুল কুল: বিনতে ইমাম রযীউদ্দীন ইবরাহীম ইবনে মোহাম্মাদ তবারিয়্যাহ।
সিত্তুল মুলুক: ফাতেমা বিনতে আলী ইবনে আলী ইবনে আবু বাদার বাগদাদিয়্যাহ।
তাজুন্নেসা: বিনতে রুস্তম ইবনে আবু রজা ইবনে মোহাম্মাদ আসবাহানিয়্যাহ।
শারফুন্নেসা: আমাতুল্লাহ বিনতে আহমাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আলী আবনুসী।
ফাখরুন্নেসা: শুহদা বিনতে আহমাদ ইবনে ওমর ইবরিয়্যাহ বাগদাদিয়্যাহ।

যাইনুদ্দার: ওয়াজীহিয়্যাহ বিনতে আলী ইবনে ইয়াহইয়া আনসারিয়্যাহ বুসিরী।
শাজারাতুদ্দুর: উম্মে খলিল।
হুররাহ: উম্মে মুআয়্যিদ যায়নাব বিনতে আবুল কাসেম আবদুর রহমান শা'রিয়্যিাহ নিশাপুরী।
জালীলাহ: উম্মে ওমর খাদিজা বিনতে ওমর ইবনে আহমাদ ইবনে আদীম।
মুআল্লিমাহঃ গালেমাহ বিনতে মোহাম্মাদ উন্দুলুসিয়্যাহ।
শায়েখাহ: উম্মে আবদুল্লাহ হাবীবাহ বিনতে খতীব ইজ্জুদ্দীন ইবরাহীম মাকদিসিয়্যাহ।

উঁচু সনদের অধিকারী নারী মুহাদ্দিসগণ

মুহাদ্দিসগণ এই মর্যাদা লাভের জন্য দূরদূরান্তে সফর করতেন। উঁচু সনদের অধিকারী মুহাদ্দিসদের দরবারে ও পাঠদানকেন্দ্রে হাদীস অন্বেষণকারীদের প্রচুর ভিড় হতো। পুরুষ মুহাদ্দিসদের মত অনেক সৌভাগ্যবান নারী মুহাদ্দিসও এমন উঁচু সনদের অধিকারী ছিলেন। তাদের দুয়ারেও দূরদূরান্ত থেকে হাদীস অন্বেষণকারীরা এসে জমা হতেন। ফাতেমা বিনতে দাক্কাক রহ.-এর সম্পর্কে ইমাম যাহাবী (র.) লিখেন-

وكانت كبيرة القدر عالية الإسناد من عوابد زمانها

তিনি অত্যন্ত মর্যাদাশীলা ও সম্মানিতা মহিলা ছিলেন এবং উঁচু সনদের অধিকারিনী ছিলেন। তিনি সে যুগের আবেদা মহীয়সী মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

উম্মে মুআয়্যিদ যায়নাব শা'রিয়্যাহ নিশাপুরী সম্পর্কে লিখেন-

وانقطع بموتها إسناد عال

তার মৃত্যুতে উঁচু সনদের একটি ধারা বন্ধ হয়ে গেলো।

উম্মে মোহাম্মাদ যায়নাব বিনতে আহমাদ ইবনে ওমর মাকদেসী (র.) মুসনাদে দারেমী, মুসনাদে আবদ ইবনে হুমাইদ ও কিতাবুস সাকাফিয়্যাত এর উঁচু সনদের একক অধিকারীনী ছিলেন। যার কারণে হাদীস অন্বেষণকারীগণ এই কিতাবগুলোর বর্ণনার জন্য দূরদূরান্ত থেকে তার কাছে সফর করে আসতেন এবং তার থেকে এই কিতাবগুলোর সনদ গ্রহণ করতেন। তিনি নিজেও মিসর ও মদীনা মুনাওয়ারায় গিয়ে এই কিতাবগুলো বর্ণনা করেছেন।

হাদীসগ্রন্থের একক বর্ণনাকারী নারী

মুহাদ্দিসদের মত মুহাদ্দিসাগণও কিছু কিছু হাদীস ও কোনো কোনো কিতাব বর্ণনার ক্ষেত্রে যুগের একমাত্র বর্ণনাকারী ছিলেন। যারা এ ধরণের বিশেষত্বের অধিকারী ছিলেন হাদীস অন্বেষণকারীগণ বিশেষভাবে তাদের থেকে সেইসব বর্ণনা গ্রহণ করতেন।

মুসনিদাতুশশাম উম্মে আবদুল্লাহ যায়নাব বিনতে কামালুদ্দীন মাকদিসী (র.) এ ধরণের মুহাদ্দিসাদের একজন ছিলেন।

উম্মে মোহাম্মাদ আসমা বিনতে মোহাম্মাদ ইবনে সালেম (র.)-এরও এই গৌরব অর্জিত ছিলো।

আমাতুল হক বিনতে হাফেয আবু আলী হাসান ইবনে মোহাম্মাদ বাকরী (র.)-এর সম্পর্কে আল ইবার ফি খবারি মান গবার-এ লেখা হয়েছে-

وتفردت بعدة أجزاء

"তিনি কিছু 'জুয' এর একমাত্র বর্ণনাকারী ছিলেন।”

সাফিয়্যাহ বিনতে আবদুল ওয়াহ্হাব কুরাইশী সম্পর্কে লিখেন-

وتفردت في زمانها

তিনি অনেক বর্ণনার ক্ষেত্রে যুগের একমাত্র বর্ণনাকারী ছিলেন।

যায়নাব বিনতে খতীব ইয়াহইয়া ইবনে ইজ্জুদ্দীন ইবনে আবদুস সালাম সুলামী (র.) সম্পর্কে আছে-

روت الكثير وتفردت

"তিনি অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং অনেক বর্ণনায় তিনি একমাত্র বর্ণনাকারী ছিলেন।"

যায়নাব বিনতে আবদুল্লাহ ইবনে রযীউদ্দীন (র.) ও এই সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। তার সম্পর্কে লেখা হয়েছে-

وتفردت بأجزاء

"কিছু 'জুয' এর একমাত্র বর্ণনাকারী ছিলেন।"

উম্মে ফযল বীবী বিনতে আবদুস সামাদ হারসামিয়্যাহ হারাবিয়্যাহ (র.)-এর কাছে হাদীসের একটি সংক্ষিপ্ত সংগ্রহ ছিলো যা তার নামেই প্রসিদ্ধ ছিলো। তিনি সেগুলো আবদুর রহমান ইবনে আবু শুরাইহ থেকে বর্ণনা করেছিলেন।

শেষ শাগরেদ হওয়ার গৌরব

শায়েখ ও মুহাদ্দিসগণের ছাত্রদের মাঝে যে তার সর্বশেষ শাগরেদ হন তাঁর থেকেও উঁচু উঁচু সনদ পাওয়া যায়। এই জন্য হাদীস অন্বেষণকারীগণ তাদের থেকে হাদিসের রেওয়ায়াত সংগ্রহ করতেন। নারী মুহাদ্দিসদের মাঝেও অনেকে এরকম শেষ শাগরেদ হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন।

ফাতেমা বিনতে খতীব ইজ্জুদ্দীন ইবরাহীম মাকদিসিয়্যাহ (র.) শায়েখ ইবরাহীম ইবনে খলিল (র.)-এর শেষ শাগরেদ ছিলেন। তিনি ইবনে আবদুল কাদের, ইবনে সিররী, ইবনে আও্ওয়াহ ও খতীবে মারওয়া থেকেও অনুমতিপ্রাপ্ত হাদীস বর্ণনাকারী সর্বশেষ ব্যক্তি ছিলেন।

আজিবাহ বাকদারিয়্যাহ (র.)-এর আলোচনায় আছে যে, তিনি মাসউদ সাকাফী, রুস্তমী ও মুহাদ্দিসদের বড় একটি জামাত থেকে আনুমতিপ্রাপ্ত হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে সর্বশেষ ব্যক্তি ছিলেন।

উম্মে হানী আফিফা বিনতে আহমাদ ফারকানিয়্যাহ আসফাহানিয়্যাহ (র.) ইমাম আবু নুআঈম আসফাহানী (র.)-এর শাগরেদ আবদুল ওয়াহেদ আল আশাজ (র.) থেকে সর্বশেষ বর্ণনা করেছেন এবং তিনি তার সর্বশেষ শাগরেদ।

প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আবুল গানাইম মুসলিম ইবনে আহমাদ মাযিনী দিমাশকী (র.) থেকে সর্বশেষ বর্ণনাকারী দু'জন ব্যক্তি। একজন হলেন, ফাতেমা বিনতে সুলাইমান (র.) আরেকজন হলেন, আবুল ফুতুহ আগমাতী ইসকান্দারানী (র.)।

নারী মুহাদ্দিসদের দরসে ছাত্রদের ভীড়

নারী শায়েখ ও মুহাদ্দিসদের শিষ্যত্ব লাভের জন্য দূরদূরান্ত থেকে দলে দলে হাদীস অন্বেষণকারীগণ আগমন করতেন এবং তাদের থেকে হাদীস বর্ণনা করাকে নিজের সৌভাগ্যের বিষয় মনে করতেন। তাদের দরসেও শুধু ছাত্রীই নয় বরং হাদীসের ইমাম ও হাফেজগণও উপস্থিত হয়ে উপকৃত হতেন।

উম্মে মোহাম্মাদ ইবনে যায়নাব বিনতে আহমাদ ইবনে ওমর মাকদিসিয়্যাহ (র.) নব্বই বছর বয়স পর্যন্ত হাদীসের দরস প্রদান করেছেন। তার দরসে বিভিন্ন দেশের হাদীস অন্বেষণকারীরা উপস্থিত হয়ে হাদীসের সনদ লাভ করতেন। তিনিও অনেক অঞ্চলে গিয়ে হাদীসের দরস দিয়েছেন। ইমাম যাহাবী (র.) তার জীবনীতে লিখেছেন যে-

وارتحل إليها الطلبة. وحدثت بمصر، وبالمدينة النبوية

ইলম অন্বেষণকারীগণ তার কাছে যেতেন। তিনি নিজেও মিসর ও মদীনায় গিয়ে হাদীসের দরস দিয়েছেন।

উম্মে আহমাদ যায়নাব বিনতে মক্কী হারানিয়াহ চুরানব্বই বছর বয়স পর্যন্ত হাদীসের দরস দিয়েছেন। এই বয়সেও তার দরসে শিক্ষার্থীদের ভীড় লেগে থকতো। ইমাম যাহাবী রহ. লিখেন-

وازدحم عليها الطلبة

তার এখানে শিক্ষার্থীদের ভীড় লেগে থকতো।

উম্মে আবদুল্লাহ যায়নাব বিনতে কামালুদ্দীন আহমাদ ইবনে আবদুর রহীম মাকদিসিয়্যাহ (র.) 'মুসনিদাতুশ শাম' ছিলেন। তার সারা জীবন হাদীস বর্ণনা ও কুতুবে হাদীসের শিক্ষাদানে কেটেছে। তার দরসে শিক্ষার্থীদের অনেক ভীড় হতো। ইমাম যাহাবী রহ. লিখেন-

وتكاثروا عليها. وتفردت. وروت كتباً كباراً

তার এখানে শিক্ষার্থীদের খুব ভীড় থাকতো। তিনি অনেক হাদীসের একক বর্ণনাকারীনী ছিলেন। তিনি হাদীসের বড় বড় কিতাব বর্ণনা করেছেন।

ফাখরুন্নিসা শুহদা বিনতে আবু নসার আহমাদ ইবনে ফারাজ ইবনে ওমর আল ইবরী বাগদাদিয়াহ (র.) প্রায় একশত বছর বেঁচে ছিলেন। উচ্চতম সনদে অনেক হাদীস তার সংগ্রহে ছিলো। এ জন্য বড় বড় আইম্মায়ে হাদীস তার থেকে হাদীসের সনদ নিতেন। ইবনে খাল্লিকান (র.) লিখেন,

وكان لها المساع العالي ألحقت فيه الأصاغر بالأكابر
তার সংগ্রহে উঁচু সনদের কিছু হাদীস ছিলো। এর মাধ্যমে নেক উত্তরসূরীগণ নেক পূর্বসূরীদের সাথে মিলিত হয়েছেন।
অর্থাৎ তিনি হাদীস শুনেছেন পূর্ববর্তী বড় বড় ইমামে হাদীসদের থেকে আর তার থেকে শুনেছে তার ছাত্রবৃন্দ। অর্থাৎ পরোক্ষভাবে এই ছাত্রবৃন্দ পূর্ববর্তী ইমামদেরই ছাত্র হয়ে গেছে।

কারীমা বিনতে আহমাদ মারওয়াযিয়্যাহ কুশমিহানিয়াহ ইলমে হাদীসে অনেক বড় বিজ্ঞ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। সহীহ বুখারী-এর বর্ণনায় তার বিশেষ বিশেষত্ব ও প্রসিদ্ধি ছিলো। সেই যুগের বিখ্যাত ও নেত্রীস্থানীয় মুহাদ্দিসগণ তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করাকে নিজেদের জন্য সৌভাগ্যের বিষয় মনে করতেন। ইমাম ইবনুল জাওযী (র.) লিখেন-
وقرأ عليها الأئمة كالخطيب، وابن المطلب، والسمعاني، وأبي طالب الزيني
তার থেকে খতীব বাগদাদী, ইবনুল মুত্তালিব সামআনী ও আবু তালেব যায়নাবীদের মত ইমামগণ দরস নিয়েছেন।

খতিব বাগদাদী তার থেকে এভাবে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ৪৬৩ হি. হজের উদ্দেশ্যে যখন মক্কা মোকাররামায় যান তখন পাঁচ দিনে সহীহ বুখারী তাকে পড়ে শোনান।

নারীদের বিভিন্ন শহরে হাদীসের দরস

সাধারণত মহিলা শায়েখা ও মুহাদ্দিসাদের দরস নিজের আবাসস্থলেই সীমাবদ্ধ থাকতো। তবে অনেকেই ছিলেন যারা অন্যান্য স্থানে গিয়ে গিয়েও দরস প্রদান করেছন এবং দ্বীনি ইলমের প্রসার ব্যাপকতর করেছেন।

খুলদিয়্যাহ বিনতে জাফার ইবনে মোহাম্মাদ (র.) বাগদাদের অধিবাসীনী ছিলেন। একবার তিনি অনারব দেশে সফরের উদ্দেশ্যে বের হলেন। পথে দিনাওয়ার নামক স্থানে খতীব আবুল ফাতাহ মানসূর ইবনে রবীআ যুহরী (র.) তার থেকে হাদীস শ্রবণ করেন।

মুসনিদাতুল ওয়াকত সিত্তুল ওযারা বিনতে ওমর তানুখিয়াহ (র.) কয়েকবার মিসর ও দিমাশকে সহীহ বুখারী ও মুসনাদে শাফেয়ী-র দরস দিয়েছেন। যায়নাব বিনতে আহমাদ মাকদাসিয়্যাহ (র.) মিসর ও মদীনা মুনাওয়ারায় শিক্ষাদান করেছেন।

আমেনা বিনতে ইনান (র.) বাগদাদ ও মসুলে দরস কায়েম করে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাকিউদ্দীন ফাসী (র.) যায়নাব বিনতে কাজিয়ে মক্কা থেকে বদর নামক স্থানে হাদীস শ্রবণ করেছেন।

নারীদের থেকে নারীদের হাদীস সংগ্রহ

হিজরী প্রথম শতাব্দীতে যখন হাদীস বর্ণনা ও সংকলণের ধারাবাহিকতা শুরু হয় তখন থেকে নারীরাও একে অন্যের থেকে হাদীস সংগ্রহ করতে থাকে এবং তাদের সংগ্রহগুলো পুরুষদের কাছে পৌঁছতে থাকে। এই ধারাবাহিকতা পরবর্তী যুগেও চলতে থাকে। মহিলা শায়েখা ও মুহাদ্দিসাগণ নিজেদের মাঝে দীনি শিক্ষার বিস্তার ঘটাতে থাকেন ও হাদীসের দরস দিতে থাকেন।

যেমন উম্মে সুলাইমান উবাইয়াহ বিনতে নাফে (র.) (তিনি ছিলেন মুসআব ইবনে যুবায়ের (র.)-এর কন্যা সুকায়না এর দাসী) থেকে ওমর ইবনে মুসআব ইবনে যুবায়ের (র.)-এর কন্যা ফাতেমার দাসী তায়্যেবা হাদীস বর্ণনা করেন।

মুনাইয়াহ বিনতে উবাইদ ইবনে আবু বারযাহ (র.) বর্ণনা করেন তার দাদী থেকে, আর তার থেকে বর্ণনা করেন উম্মে আসওয়াদ (র.)।

উম্মে নাদরাহ (র.) হাদীস বর্ণনা করেন হযরত আয়েশা (রা.) থেকে, আর তার থেকে বর্ণনা করেন তাহিয়্যাহ রাসিবিয়্যাহ বসরিয়্যাহ (র.)।

উম্মে বানীন বিনতে ইয়ায আসলামিয়্যাহ (র.) তার বোন কুসাইমাহ বিনতে ইয়ায থেকে বর্ণনা করেন।

উম্মে ইয়াহইয়া হাবশাহ বিনতে আবদুল জাব্বার ইবনে ওয়ায়েল (র.) থেকে মাইমূনা বিনতে হুজও ইবনে আবদুল জাব্বার ইবনে ওয়ায়েল হাদীস বর্ণনা করেন। অর্থাৎ ভাতিজী ফুফুর শিষ্য হয়েছে।

হুকাইমাহ (র.) হাদীস বর্ণনা করেন হযরত আয়েশা (রা.) থেকে, আর তার থেকে বর্ণনা করেন তারই কন্যা উম্মে আসেম।

হাদীস শাস্ত্রে নারীদের রচনাবলি

মুসলিম নারীগণ ইলমে হাদীসের প্রচার প্রসারে শুধু হাদীসের রেওয়ায়েত ও দরসের মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিলেন না, বরং পুরুষদের মত তারাও এই বিষয়ে প্রচুর স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন ও ইসলামী গ্রন্থভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন। তারা নিজেদের বর্ণিত হাদীস ও আসার গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করেছেন। রিজালশাস্ত্রের উপর কিতাব লিখেছেন। হাদীসগ্রন্থের অনুলিপি তৈরী করেছন। হাদিসের শুদ্ধি যাচাই ও মূল কপির সাথে তুলনা করার বিষয়ে অনেকের বিশেষ দক্ষতা ও প্রসিদ্ধি ছিলো।

ইমাম যাহাবী (র.) আজিবাহ বিনতে হাফেজ মোহাম্মাদ ইবনে আবু গালেব বাকদারিয়াহ বাগদাদিয়াহ (র.) সম্পর্কে লিখেছেন যে, তিনি নিজের উস্তায ও শায়েখদের জীবনীর উপর দশ 'জুয' লিখেছেন।

উম্মে মোহাম্মাদ ফাতেমা খাতুন বিনতে মোহাম্মাদ খতিয়্যাহ আসফাহানিয়াহ (র.)-এর রচনা ও ও সংকলনের বিষয়ে বিশেষ পারদর্শিতা ছিলো। তিনি অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন। যেমন আররুমুয মিনাল কুনূয, পাঁচ খণ্ডে লিখিত। ইমাম তাকিউদ্দীন ফাসী (র.) তার সম্পর্কে লিখেন-

ولها طريق حسنة في الوعظ وتواليف حسنة كتابها الموسوم بالرموز من الكنوز يقارب خمس مجلدات

‘ওয়াজ-নসীহতের ক্ষেত্রে তার বিশেষ যোগ্যতা ছিলো। তিনি অনেক ভালো ভালো গ্রন্থ রচনা করেছন। তার কিতাবুররুমূয মিনাল কুনূয প্রায় পাঁচ খণ্ডে রচিত।’

উম্মে মোহাম্মাদ বিনতে ফাতেমা বিনতে নাফীসুদ্দীন মোহাম্মাদ বাহনাসিয়্যাহ মক্কীয়্যাহ (র.) ইলমে হাদীসসহ আরো নানাবিধ বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। ইমাম ফাসী (র.) লিখেন-

كتبت بحظها الكثير من الحديث والعلم

ইলমে হাদীস ও আরো বিভিন্ন বিষয়ে তার কলম অনেক কিছু লিখেছে।

খাদিজা বিনতে মোহাম্মাদ শাহজাহানিয়্যাহ বাগদাদিয়্যাহ (র.) নিজের উস্তায ইবনে মাইমুনের কিছু হাদীস ও বর্ণনা একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থে একত্রিত করেছেন।

কারীমা বিনতে আহমাদ মারওয়াযিয়্যাহ (র.)-এর গ্রন্থ সংশোধন, সম্পাদনা ও মূল কপির সাথে মিলিয়ে ঠিকঠাক করার বিষয়ে বিশেষ যোগ্যতা ছিলো। তিনি খুবই চিন্তাশীল ও মেধাবী মুহাদ্দিসা ছিলেন।

আয়েশা বিনতে উমারাহ ইবনে ইয়াহইয়া (র.) আফ্রিকার বিজ্জায়া নামক শহরের বাসিন্দা ছিলেন। তার চিঠি-পত্র খুবই সুন্দর হস্তাক্ষরে সাজানো গোছানো । তিনি আঠারো খণ্ডের একটি কিতাব নিজ হাতে অনুলিপি করেছিলেন। গাবরীনী বলেন-

وكان لها خط حسن رأيت كتاب الثعلبي بخطها في ثمانية عشر جزءا

তার হস্তাক্ষর খুবই সুন্দর ছিলো। তার নিজ হস্তাক্ষরে লেখা সালাবীর আঠারো 'জুয' এর একটি কিতাব আমি স্বচক্ষে দেখেছি।

উপরের এই কয়েকটি উদাহরণ থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, নারী আলেমা, ফাযেলাগণ রচনা, সংকলন, সম্পাদনা ও লিপি তৈরীর কাজেও নিজেদের কীর্তির সাক্ষর রেখে গেছেন।

নারী মুহাদ্দিসাদের গ্রন্থের উপর পরবর্তীদের কাজ

নারী মুহাদ্দিসাদের কিতাব ও বর্ণিত হাদীস, আসারের গ্রহণযোগ্যতার কারণে অনেক আলেম ও মুহাদ্দিস এগুলোর উপর বিভিন্ন ধরনের কাজ করেছেন। তাখরীজ তথা উদ্ধৃতি বের করে মূল পর্যন্ত পৌঁছা, নিজেদের বর্ণনাসমূহকে তাদের সাথে মেলানো ইত্যাদি।

ইমাম ফাসী (র.) উম্মে ফজল খাদিজা বিনতে তাকিউদ্দীন আলী ইবনে আবু বকর তাবারিয়্যাহ মক্কীয়্যাহ (র.)-এর সম্পর্কে লিখেন-

وخرج لها و حدثت

তার বর্ণিত হাদীসসমূহের তাখরীজ করা হয়েছে। তিনি হাদীসের দরস দিতেন'।

এমনিভাবে তিনি উম্মে আহমাদ রাইসাহ বিনতে আহমাদ ইবনে আবুবাকার মোহাম্মাদ তাবারিয়্যাহ মক্কীয়্যাহ (র.) সম্পর্কে লিখেন-

وخرج لها أيضا وحدثت

"তার হাদীসসমূহেরও তাখরীজ করা হয়েছে। তিনিও হাদীসের দরস দিতেন"।

ইলমে ফিকহে নারী

মুসলিম নারীগণ যেভাবে ইলমে কুরআন, ইলমে হাদীস অর্জনে অগ্রগামী অনুরূপ ফিকহ-ফাতাওয়ায়ও তাদের খেদমত চির স্মরণীয়। হাফেজ ইবনে কাইয়ুম (র.)-এরকম ২২ জন মহিলা সাহাবীর কথা উল্লেখ করেছেন, যারা ফিকহ ও ফাতাওয়ায় প্রসিদ্ধ ছিলেন, যাদের মাঝে নবীজির সম্মানিতা স্ত্রীগণও আছেন। তাদের মাঝে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা ফকিহুল উম্মাহ বা উম্মতের শ্রেষ্ঠ ফকিহা-এর উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। সাহাবীদের পরে তাবেয়ী এবং তাবেয়ীদের পরেও এ রকম অগণিত মুসলিম নারী ছিলেন যারা ফিকহ ও ফাতাওয়ায় বর্ণনাতীত খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। অসংখ্য ফকীহ নিজের উচ্চ মর্যাদা সত্ত্বেও তাদের কাছ থেকে মাসআলা-মাসায়িল শিক্ষা করেছেন।

শায়েখ আলাউদ্দীন হানাফি সমরকন্দী (র.)-এর কন্যা ফাতেমা (র.) অনেক বড় মাপের ফকীহা ছিলেন। তাঁর স্বামী শায়েখ আলাউদ্দীন কাসানী (র.) 'তুহফাতুল ফুকাহা' কিতাবের ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'আলবাদায়ি ও সানায়ি' লিখেন। এই কিতাব লেখার সময় স্বামীর কোনো ভুল

হয়ে গেলে ফাতেমা তা ঠিক করে দিতেন। ফাতাওয়াতে পিতা ও স্বামীর পাশাপাশি তার নিজের স্বাক্ষরও থাকতো। এ সম্পর্কে কিতাবে আছে-

أن الفتوى كانت تخرج من بيتها وعليها خطها وخط أبيها وزوجها

বিভিন্ন ফতোওয়ার উপর ফাতেমা, তার পিতা ও স্বামী তিন জনেরই স্বাক্ষর থাকতো।

আমাতুল ওয়াহিদা সিত্তিয়া বিনতে কাজী হোসাইন (র.) কুরআন শরীফ ও ফিকহের সব মাসআলা-মাসায়িল মুখস্থ করে নিয়েছিলেন। ফিকহে শাফেয়ীতে তিনি অর্জন করেছিলেন অসাধারণ পাণ্ডিত্য। তখন তাঁর চেয়ে বড় ফিকহে শাফেয়ীর কোনো আলেম ছিলেন না। তিনি শায়েখ আলী ইবনে আবু হোরাইরা (র.)-এর সাথে ফাতাওয়া দিতেন। ইমাম ইবনুল জাওযী (র.) তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন-

وكانت فاضلة عالمة من أحفظ الناس للفقه على مذهب الشافعي

তিনি অনেক বড় আলেমা, ফাযেলা ছিলেন এবং ফিকহে শাফেয়ীর বড় একজন হাফেযা ছিলেন।

উম্মে হানী ইউসিয়া, তার বোন ফাতেমা এবং শায়েখ যারওয়াকের দাদি ফকিহা উম্মে বানিন এই তিনজন ছিলেন মুফতি। তারা মসজিদে আকসার পশ্চিমাঞ্চলে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন।

উম্মে ঈসা বিনতে ইবরাহীম বিন ইসহাক বাগদাদী (র.) বাগদাদের বিশিষ্ট মুফতীয়া ছিলেন। খতিব বাগদাদী (র.) এবং আল্লামা ইবনে জাওজী (র.) তাঁকে ফাতাওয়া দেওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন। খতীব বাগদাদী তাঁর সম্পর্কে লিখেন,

كانت فاضلة عالمة تفتى في الفقه

তিনি একজন আলেমা, ফাযেলা ছিলেন এবং ফিকহী মাসআলার ব্যাপারে ফতোয়া দিতেন।

আমাতুর রহমান বিনতে শায়েখ তাকী উদ্দীন ফিকহ ও ফাতাওয়ায় বিশেষভাবে পারদর্শী ছিলেন। তাকে সিত্তুল ফুকাহা উপাধিতে স্মরণ করা হয়ে থাকে।

সাইয়েদ শরীফ আলাউদ্দীন আলী বিন খতিব শরফুদ্দীন-এর বোন শরীফা ফিকহ ও ফাতাওয়াতে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

উম্মে যায়নাব ফাতেমা বিনতে আব্বাস বাগদাদিয়াহ (র.) একজন শায়েখাহ, আলেমা, ফকীহা, দুনিয়াবিরাগী ও যুগের নারীদের মাঝে শ্রেষ্ঠ ছিলেন।

ফকীহ ইউসুফ ইবনে ইয়াহইয়া উন্দুলুসী (র.) -এর বোন ফাতেমা বিনতে ইয়াহইয়া উন্দুলুসিয়্যাহ কুরতুবিয়্যাহ (র.) একজন আলেমা, ফাযেলা ও অত্যন্ত পরহেযগার নারী হওয়ার পাশাপাশি একজন ফকিহাও ছিলেন। তার ভাইয়ের মত তিনিও এই বিষয়ে প্রসিদ্ধি রাখতেন। তার গ্রহণযোগ্যতার একটি বড় প্রমাণ হলো তার জানাযার নামাযে এতো অধিক লোকের সমাগম হয়েছিলো যে, ইতিপূর্বে তেমনটি আর দেখা যায়নি।

নারী সাহাবীদের মধ্যে ফকিহ ও মুহাদ্দিসগণ

ইসলাম ও মুসলমানদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো প্রতি যুগেই ধর্মীয় জ্ঞান ও ধর্মীয় কাজে পুরুষদের সাথে নারীরাও সমানভাবে অংশগ্রহণ করে এসেছে। শিক্ষা-দীক্ষা ও ধর্মের প্রচার-প্রসারে পুরুষদের সমান খেদমত মহিলারাও আঞ্জাম দিয়েছে। বিশেষত হাদীস ও ফিকহর ক্ষেত্রে।

ইমাম ইবনুল কায়্যিম (র.) এ'লামুল মুআক্কিঈন গ্রন্থে লিখেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবাদের মধ্যে যাদের থেকে ফিকহী মাসায়েল ও ফতোয়া বর্ণিত ও সংকলিত হয়েছে তাদের সংখ্যা একশ'র বেশি, এর মধ্যে নারীরাও ছিলো। ইবনুল কায়্যিম (র.) এরকম সাহাবাদের তিনটি স্তরে ভাগ করে প্রত্যেক স্তরের পুরুষ ফকিহ, মুফতীদের মত নারী ফকিহ ও মুফতীদের নামও উল্লেখ করেছেন।

প্রথম স্তরে তথা বেশি হাদীস বর্ণনাকারীদরে মধ্যে এমন সাতজন বড় বড় সাহাবী আছেন যাদের ফতোয়াগুলো যদি একত্রিত করা হয় তাহলে প্রত্যেকের বড় বড় কিতাব তৈরী হয়ে যেতে পারে। এই স্তরের উলামাদের মাঝে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)ও রয়েছেন। তিনি ছিলেন 'উম্মতের শ্রেষ্ঠ ফকিহ' উপাধিতে প্রসিদ্ধ। ফিকহ, হাদীস, ফারায়েয, আহকাম, হালাল-হারাম, চিকিৎসা ও কবিতা, মোটকথা বহু বিষয়ের জ্ঞানের আধার ছিলেন তিনি।

ইমাম যাহাবী (র.) তাযকিরাতুল হুফফায গ্রন্থে লিখেছেন,

من أكبر فقهاء الصحابة. كان فقهاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرجعون إليها. تفقه بها جماعة

‘হযরত আয়েশা (রা.) সর্বশ্রেষ্ঠ ফকিহ সাহাবীদের একজন ছিলেন। ফকিহ সাহাবীরা ফিকহী মাসআলা নিয়ে তার কাছে যেতেন। বড় একটি জামাত তার থেকে ফিকহ অর্জন করেছেন।’

ইমাম যুহরী (র.) আরো সংক্ষেপে বলেছেন-

لَوْ جُمِعَ عِلْمُ عَائِشَةَ إِلَى عِلْمِ جَمِيعِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِلْمِ جَمِيعِ النِّسَاءِ لَكَانَ عِلْمُ عَائِشَةَ أَفْضَلَ

'যদি নবীজীর সকল স্ত্রী এবং সকল মুসলিম মহিলাদের ইলম একত্রিত করা হয়, তবুও হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রা.-এর ইলম বেশি উত্তম হবে।'

দ্বিতীয় স্তরে তেরজন সাহাবীর নাম রয়েছে যাদের ফতোয়া সংকলিত হলে মাঝারি আকারের কিতাব হয়ে যাবে। তাঁদের মাঝে রয়েছেন উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামা (রা.)। হাদীস ও ফিকহে হযরত আয়েশা (রা.)-এর পর নারী সাহাবীদের মধ্যে তিনি সবচেয়ে বেশি ইলমের অধিকারী ছিলেন।

মাহমুদ ইবনে লাবীদ (র.)-এর বক্তব্য -

كان أزواج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْفَظْنَ مِنْ حَدِيثِ النَّبِيِّ كَثِيرًا وَلَا مِثْلًا لِعَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ

'সাধারণভাবেই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র স্ত্রীগণ তাঁর হাদীস অনেক বেশি মনে রাখতেন। কিন্তু হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রা. ও হযরত উম্মে সালামা রা. এ বিষয়ে সবচেয়ে এগিয়ে ছিলেন।'

তৃতীয় স্তরে বাকি সাহাবাদের নাম রয়েছে, তাদের প্রত্যেকের ফতোয়াও আলাদা আলাদা রিসালার রূপ নিতে পারে। এই স্তরে রয়েছেন উম্মুল মুমিনীন হযরত সাফিয়্যাহ (রা.), উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা (রা.), উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে হাবীবা (রা.), উম্মুল মুমিনীন হযরত জুয়ায়রিয়াহ (রা.), উম্মুল মুমিনীন হযরত মাইমূনা (রা.), হযরত ফাতেমাতুজ জাহরা (রা.), হযরত উম্মে আতিয়্যাহ (রা.), হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রা.), হযরত উম্মে শারীক (রা.), হযরত উম্মে দারদা (রা.), হযরত আতেকা বিনতে যায়েদ (রা.), হযরত ফাতেমা বিনতে কায়েস (রা.), হযরত লায়লা বিনতে কায়েফ (রা.), হযরত হাওলা বিনতে তুআইত (রা.), হযরত সাহলা বিনতে সুহাইল (রা.), হযরত উম্মে সালামা (রা.), হযরত যায়নাব বিনতে উম্মে সালামা (রা.), হযরত উম্মে আইমান (রা.), হযরত উম্মে ইউসুফ (রা.) ও হযরত গামেদিয়াহ (রা.)। এদের মধ্যে কয়েকজন তাবেয়ীও রয়েছেন।

এই তালিকার একশ ত্রিশজন ফকিহ সাহাবার মধ্যে বাইশজন মহিলা ফকিহ ও মুফতী রয়েছেন, যাদের প্রত্যেকের ফিকহী মাসায়েল ও ফতোয়া বড় বড় খণ্ডে, মাঝারি ধরণের

কিতাবে কিংবা ছোট ছোট রিসালায় সংকলিত হওয়ার মত। এইসব মহিলা সাহাবীদের জ্ঞান ও ফিকহী গভীরতার গ্রহণযোগ্যতা ও প্রসিদ্ধি সাহাবা, তাবেয়ীদের যুগেই ব্যপকভাবে ছিলো।

ইমাম যাহাবী (র.) তাযকিরাতুল হুফফায গ্রন্থে বত্রিশজন সাহাবার জীবনবৃত্তান্ত আলোচনা পেশ করেছেন এবং মোট চৌষট্টিজন সাহাবার নাম উল্লেখ করেছেন যাদের থেকে সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাঁদের মধ্যে নিম্নোক্ত চৌদ্দজন মহিলা সাহাবীর নামও রয়েছে। যথা- হযরত আসমা বিনতে আবু বকর সিদ্দিক (রা.), উম্মুল মুমিনীন হযরত জুআইরিয়্যাহ বিনতে হারেস (রা.), উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা বিনতে ওমর ইবনে খাত্তাব আদাবিয়্যাহ (রা.), উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে হাবীবা রামলাহ বিনতে আবু সুফিয়ান উমাবিয়্যাহ (রা.), উম্মুল মুমিনীন হযরত যায়নাব বিনতে জাহাশ আসাদিয়্যাহ (রা.), হযরত যায়নাব বিনতে আবু সালামাহ মাখযূমিয়্যাহ (রা.), হযরত ফাতেমা বিনতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাশেমিয়্যাহ (রা.), হযরত উম্মে ফযল লুবাবাহ বিনতে হারেস হেলালীয়্যাহ (রা.), তার বোন উম্মুল মুমিনীন হযরত মাইমূনা বিনতে হারেস হেলালিয়্যাহ (রা.), হযরত উম্মে আতিয়্যাহ নুসাইবাহ আনসারিয়্যাহ (রা.), তার বোন হযরত উম্মে সালামা হিনদ মাখযূমিয়্যাহ (রা.), হযরত উম্মে হারাম বিনতে মিলহান আনসারিয়্যাহ (রা.), তার বোন হযরত উম্মে সুলাইম বিনতে মিলহান আনসারিয়্যাহ (রা.), ও উম্মে হানী বিনতে আবু তালেব (রা.)।

হস্তলিপিতে মুসলিম নারী

জ্ঞানের প্রচার-প্রসার ও সংরক্ষণে হস্তলিপির গুরুত্ব অপরিসীম। মুসলিম নারীগণ এই শাস্ত্রেও অমর অবদান রেখে গেছেন। নিম্নে হস্তলিপিতে কীর্তিমান কজন নারীর নাম উল্লেখ করা হলো-

১. উম্মুল ফজল ফাতেমা বিনতে হাসান বাগদাদী (র.) ছিলেন হস্তলিপিতে প্রসিদ্ধ এক নারী। হস্তলিপিতে তাঁকে বলা হতো যুগের শ্রেষ্ঠ উস্তাদ। বিশিষ্ট লিপিকার ইবনুল বাওয়াবের লিপির হুবহু নকল করতে পারতেন তিনি। আলেম- ওলামা নির্বিশেষে সবাই তাঁর কাছে হস্তলিপি শিখতেন। ইমাম যাহাবী রহ. লিখেন-

الكاتبة التي جودوا على خطها وكانت تنقل طريقة ابن البواب

"ফাতেমা এমন সুন্দর হস্তাক্ষরের অধিকারীনী ছিলেন যে, লোকে তার হস্তাক্ষর নকল করতো। আর তার হাতের লেখা ছিলো ইবনে বাওয়াবের হাতের লেখার মত।"

২. বিনতুল কুরাকে তাঁর সুন্দর হস্তলিপির কারণে উজির আবু নাসের 'আব্দুল মালেক কিন্দুরী (র.) তাঁর কাছে ডেকে নিয়ে দিওয়ানে আজিজি ও ঈসায়ী শাহরুম এর মধ্যবর্তী চুক্তিনামা লিপিবদ্ধ করান। বিনিময়ে তাঁকে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা দেন।

৩. আমাতুল আজিজ খাদিজা বিনতে ইউসুফ (র.) অনেক বড় আলেমা ছিলেন পাশাপাশি তার হস্তলিপি ছিলো চমৎকার। তিনি তৎকালীন বিশ্বের সেরা লিপিকারদের কাছ থেকে লেখা শিখেন। ইমাম যাহাবী রহ. লিখেন-

وجودت الخط على جماعة

"তিনি বেশ কয়েকজন লিপিকার থেকে সুন্দর হস্তাক্ষর শেখেন।"

৪. ফখরুন্নিসা সাহিদা অনেক বড় আলেমা ছিলেন। তার লেখা ছিলো খুবই দৃষ্টিনন্দন। তিনি তখন কাতেবা উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। ইবনে খাল্লিকান রহ. তার সুন্দর হস্তাক্ষরের বর্ণনা এভাবে দিয়েছেন-

كانت من العلماء، وكتبت الخط الجيد

"তিনি মহিলা আলেমদের একজন ছিলেন। তার হস্তাক্ষর অত্যন্ত ভালো ছিলো।"

৫. আন্দালুসের প্রসিদ্ধ লিপিকার ছিলেন আমীর নাসিরুদ্দীন। আল্লাহ তাঁর বিশেষ দৃষ্টি দান করেছিলেন তার হাতে। তাঁর লেখার সৌন্দর্য ছিলো বর্ণনাতীত। তিনি ৩৫৮ হিজরি সনে ইন্তেকাল করেন।

৬. আন্দালুস শহরে লুবনা নামক এক নারী লিপিকার ছিলেন। তিনি খলিফা হাকাম বিন 'আব্দুর রহমানের বিশেষ লেখিকা ছিলেন। তিনি সরকারি চিঠি-পত্র বিজ্ঞাপন-বিজ্ঞপ্তিও লেখতেন। তার লেখা ছিলো অত্যন্ত সুন্দর। তিনি হিসাব বিজ্ঞানেও পারদর্শী ছিলেন। কবিতা ও ব্যাকরণেও ভালো ধারণা রাখতেন তিনি।

৭. আয়েশা বিনতে আম্মার আফ্রিকীয়া (র.) সাহিত্যিক ও কবি ছিলেন। তার চিঠিপত্র ও লেখনি ছিলো খুব চমৎকার। হাতের লেখা ছিলো অনন্য। আঠারো খণ্ডের একটি কিতাব তিনি নিজ হাতে লেখেন।

৮. ইবনে খাইয়াত (র.) আখবারে কোরতুবায় লেখেন কর্ডোভার পূর্বাঞ্চলে এমন ১৭০ জন আলেমা ছিলেন যাঁরা কুফার হস্তলিপি অনুযায়ী কুরআন শরীফ লিখতেন।

মুসলিম নারীদের প্রজ্ঞা

মুসলিম উম্মাহর গৌরব উজ্জ্বল অতীতে ফিরে তাকালে দেখা যায় জ্ঞান- বিজ্ঞানের প্রতি মুসলিম নারীদের প্রবল আগ্রহ-উদ্দীপনা ছিলো। তাঁরা শুধুই দ্বীনের 'ইলম শিক্ষা করে ক্ষান্ত হতেন না বরং দৈনন্দিন জীবনের ছোট ছোট সমসাময়িক বিষয়েও তাঁরা ভালো ধারণা রাখতেন। এমনকি কখনো কখনো তাঁরা 'ইলম ও প্রজ্ঞার তলদেশে ডুব দিয়ে এমন সব মনি-মুক্তা তুলে নিয়ে আসতেন যা দেখে পুরুষগণ শুধু অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতেন।

নারীর প্রজ্ঞায় খলিফার ফরমান প্রত্যাহার

দ্বিতীয় খলিফা হজরত উমর (রা.) মিম্বরে দাঁড়িয়ে বললেন, আজকাল মানুষ বিয়ের মোহর নির্ধারণে অতিরঞ্জন করছে। ধনীরা অনেক বেশী মোহর নির্ধারণ করছে অথচ গরীবেরা তা পারছে না ফলে গরীবেরা হীনমন্যতায় ভুগছে। আমার মন চায় বিয়ের মোহরের জন্য একটি পরিমাণ নির্ধারণ করে দেই অর্থাৎ ৪০ উকিয়া (বর্তমানের হিসেবে ১ তোলা ৭ মাশা) রৌপ্য পরিমাণ সবাই মোহর দিবে। তাহলে কোনো গরীব মুসলমান এই বিষয় নিয়ে পেরেশান হবে না। নির্ধারিত এ পরিমাণের চেয়ে বেশী যদি কেউ মোহর ধার্য করে তাহলে আমি তা নিয়ে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা করে দিবো। সে যতো বড় ধনীর মেয়ে হোক না কেনো।

উমর (রা.) ভাষণ দিয়ে মিম্বর থেকে নিচে নামলে এক মহিলা সাহাবী পর্দার আড়াল থেকে বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! এটা কি আপনার প্রশাসনিক ফরমান? নাকি কুরআন হাদীসের আইন? উমর (রা.) বললেন, প্রশাসনিক ফরমান। এটা এ জন্য বলছি, যাতে কোনো মুসলমান অন্তত এই বিষয়টি নিয়ে কষ্ট না পায়। মহিলা সাহাবী বললেন, কুরআন যে বিষয়ে সুস্পষ্ট বক্তব্য দিয়েছে সে বিষয়ে কম-বেশী করার অধিকার আপনাকে কে দিয়েছে? উমর (রা.) বললেন, কুরআনের কোথায় এ কথা আছে? মহিলা সাহাবী বললেন-

وَاِنْ اَتَيْتُمْ اَحَدُ هُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا

অর্থ: তোমাদের কেউ যদি নারীর মোহর হিসেবে স্বর্ণ-রৌপ্যের ভাণ্ডার দিয়ে দেয় তবুও তোমরা তা থেকে কিছুই নিবে না। (সূরা নিসা: ২০)

আল্লাহ কুরআনে স্বর্ণ-রৌপ্যের ভাণ্ডারের কথা বলেছেন। আপনি কিভাবে তা কমাবেন? মহিলার কথা শুনে উমর (রা.) সঙ্গে সঙ্গে আবার মিম্বরে ওঠে বললেন, এক বোন তার ভাইয়ের ভুল ধরিয়ে দিয়েছে। আমি আমার ফরমান প্রত্যাহার করে নিলাম। যেহেতু আল্লাহ পরিমাণ নির্ধারণ করেন নাই তাহলে সেখানে মানুষ কর্তৃক পরিমাণ নির্ধারণের প্রশ্নই ওঠে না!

কুরআন শরীফের নির্দেশ ও এক মহীয়সীর তীক্ষ্ণতা

হজরত 'আসেম (রা.) বলেন, আমরা কখনো কখনো হজরত হাফসা বিনতে শিরিনের নিকট জ্ঞান অর্জন ও বরকত লাভের জন্য যেতাম। তিনি বার্ধক্যে উপনীত হয়ে যাওয়ার পরও আমরা গেলে বড় একটি চাদর গায়ে দিয়ে নেকাবের মতো চেহারা ঢেকে আমাদের সামনে আসতেন। একবার আমি বললাম, আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন। কুরআন শরীফে আল্লাহ বলেছেন-

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحًا أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ.

অর্থ: বৃদ্ধা মহিলা যারা বিবাহের আকাঙ্ক্ষা করে না তারা যদি তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন ব্যতিরেকে অতিরিক্ত কাপড় খুলে রাখে তাহলে কোনো অসুবিধা নেই।
(সূরা নূর: ৬০)

সুতরাং আপনি চাদর গায়ে রাখলেই যথেষ্ট, নেকাবের প্রয়োজন নেই। হাফসা বিনতে শিরিন বলেন, এ আয়াতের পরের অংশ পড়ো। আমি পড়ি-

وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُن

অর্থ: তারা যদি সতর্কতা অবলম্বন করে তাহলে তা তাদের জন্য উত্তম।

তিনি বলেন, এই আয়াত বার্ধ্যক্যেও মুখ ঢেকে রাখার স্বপক্ষে প্রমাণ।

ইমাম শাফেঈ (র.)-এর মায়ের প্রজ্ঞা

ইবনে জাওজী (র.) বলেন, হানাফি মাজহাবের অনুসারী কোনো এক কাজীর অভ্যাস ছিলো যখন সাক্ষীদের ব্যাপারে সন্দেহ হতো তখন তিনি তাদেরকে পৃথক পৃথক করে সাক্ষী নিতেন। একবার তার কাছে একটি মামলা আসে, যে মামলার সাক্ষী ছিলেন দুই মহিলা। কাজী সাহেব যখন তাদের সাক্ষ্য নেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তখন তিনি অভ্যাস অনুযায়ী দুজনকে পৃথক হতে বলেন। এরই মাঝে এক মহিলা বলে ওঠেন জনাব! আপনি ভুল বলছেন। কাজী সাহেব বললেন, কি ভুল? মহিলা বললেন, আল্লাহর নির্দেশ হলো-

أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى.

অর্থ: 'একজন যদি ভুলে যায় তাদের মাঝ থেকে আরেকজন স্মরণ করে দিবে'। (সূরা আল বাকারা: ২৮২)

আর আপনি যদি পৃথক করে দেন তাহলে কুরআনের এ বিধান কী হবে? কাজী সাহেব মহিলার কথা শুনে তার ভুল সংশোধন করে নিলেন। আর এই মহিলা ছিলেন ইমাম শাফেঈ (র.)-এর মা।

যে নারীর জীবন রক্ষা করলো তাঁর জ্ঞান

আহওয়াজ শহরে এক সময় খারেজী ফেতনা প্রবলভাবে বিস্তার লাভ করে। খারেজীরা এক মহিলাকে ধরে নিয়ে হত্যা করতে চাইলো। হত্যাকারীদেরকে মহিলা বললো, তোমরা তাকে হত্যা করতে চাচ্ছো যার ব্যাপারে কুরআনে আয়াত নাজিল হয়েছে-

أَوَ مَنْ يُنَشَّؤُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِيْنٍ .

অর্থ: যে অলংকারে সুসজ্জিত হয়ে লালিত পালিত হয় এবং বিতর্কে সে অপারগ। (সূরা যুখরুফ: ১৮)

এ কথা শুনে খারেজীগণ তাকে ছেড়ে দেয়।

নারীর কথায় নিশ্চুপ বিচারক

ইবনে 'আব্দুস সালাম হাশেমী (র.) অনেক বড় বুযুর্গ ছিলেন। তিনি ছিলেন বসরার বাসিন্দা। তিনি একবার বসরায় ঘর নির্মাণের পরিকল্পনা নিলেন। তাঁর ঘরের সাথেই ছিলো এক বুড়ির ছোট্ট কুটির। ঘরের নকশা অনুযায়ী বুড়ির ঘর তাঁর ঘরের অন্তর্ভুক্ত করা ছাড়া বিকল্প কোনো উপায় ছিলো না। তাই তিনি বুড়িকে বললেন, তোমার জায়গাটুকু আমার নিকট বিক্রি করে দাও। তাঁর প্রস্তাব বুড়ি সুস্পষ্ট প্রত্যাখ্যান করে। এরপর বুড়িকে তার জায়গার দামের চেয়ে কয়েকগুণ বেশী দাম দেওয়ারও প্রস্তাব করা হলো কিন্তু সে সম্মত হলো না।

'আব্দুস সালাম হাশেমী (র.) অক্ষম হয়ে এই অভিযোগ কাজী আবু হামেদ খোরাসানী (র.)-এর দরবারে উত্থাপন করলেন। কাজী সাহেব বললেন, এটা তো খুব সহজ বিষয়। চিন্তার কিছু নেই, আমার কাছে এমন এক পদ্ধতি আছে তা প্রয়োগ করলেই সমাধান হয়ে যাবে।

কাজী সাহেব মহিলাকে ডেকে বললেন, তোমাকে যে দাম দেওয়া হচ্ছে তোমার ঘরের দামতো এর চেয়ে অনেক কম। তুমি যদি তা গ্রহণ না করো তাহলে আমি তোমার ওপর পাথর নিক্ষেপের হুকুম দিবো। বুড়ি মহিলা বললেন, কাজী সাহেব! বুঝলাম আমি বেশী দামে বিক্রি করছি না বলে আপনি পাথর নিক্ষেপের নির্দেশ দিচ্ছেন অথচ সে যে এক টাকার মালে দশ টাকা দিচ্ছে তারপরও তার প্রতি পাথর নিক্ষেপের কথা বলছেন না কেনো? আরেকটি কথা বিচারক মহোদয়! আমার ওপর যদি পাথর নিক্ষেপের নির্দেশ দেন তাহলে আমার সম্পদে তো এখন আর আমার কোনো অধিকার নেই। আপনিই বলুন, এখন আমি আমার জায়গা বিক্রয় করবো কী করে আর সে ক্রয় করবেইবা কী করে?
কাজী সাহেব বুড়ির এ কথা শুনে নিশ্চুপ হয়ে গেলেন।

হাজ্জাজ বিন ইউসুফকে ভীতি প্রদর্শন

হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ছিলেন দুনিয়ার প্রভাবশালী শাসকদের একজন। লোকজন তাঁর ভয়ে থর থর করে কাঁপতো। হাজ্জাজ একবার এক বৃদ্ধার ছেলেকে শাস্তি দিলেন। বৃদ্ধা হাজ্জাজের দরবারে এসে অত্যন্ত কঠিন ভাষায় বললেন, হে হাজ্জাজ। তুমি অত্যাচার বন্ধ করো, অন্যথায় আল্লাহ তোমাকে এমনভাবে মুছে দিবেন যেমন তিনি কুরআনের প্রথম ১৫ পারা থেকে কাল্লা كَلَّا শব্দটি উঠিয়ে দিয়েছেন। হাজ্জাজ ছিলেন হাফেজ ও কারী। তিনি বৃদ্ধার কথায় চিন্তা করে দেখলেন আসলেই তো কুরআন শরীফের প্রথম ১৫ পারায় 'কাল্লা' كَلَّا শব্দ নেই। হাজ্জাজ বললেন, তুমি সত্য কথা বলেছো। যদি 'কাল্লা' كَلَّا শব্দটি থাকতো তাহলে তোমাকে কঠিন শাস্তি দিতাম।

তখনকার বৃদ্ধা মহিলারাও তাদের দৈনন্দিন কথাবার্তায় জ্ঞানের কী সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় আলোচনা করতেন।

এক কৃতদাসীর উপস্থিত জবাব

একবার আত্তার মাজিন এর সামনে এক কুৎসিত মহিলা দাঁড়ালেন। মহিলাকে দেখে আত্তার মাজিন রেগে গেলেন এবং দাসীকে উদ্দেশ করে কুরআনের আয়াত তেলাওয়াত করতে থাকেন-

وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ.

অর্থ: যখন হিংস্র প্রাণীদেরকে একত্রিত করা হবে।
(সূরা তাকবীর: ৫)

দাসী তার তেলাওয়াত শুনে প্রতি উত্তরে আয়াত তেলাওয়াত করে-

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ.

অর্থ: আমাকে দিয়ে তো উদাহরণ দিলে এবং তোমার প্রতিকৃতি ভুলে গেলে।
(সূরা ইয়াসীন: ৭৮)

উত্তম ইঙ্গিত

কয়েস বিন সা'দ বিন উবাদা (রা.) আল্লাহর নবীর এক বিশিষ্ট ও প্রসিদ্ধ সাহাবী। তিনি দীর্ঘ দিন পর্যন্ত মিশরের গভর্নরের দায়িত্ব পালন করেন। একবার এক মহিলা তার কাছে এসে বললো, আমার ঘরে বিড়ালের আসা যাওয়া কম (অর্থাৎ, খাবার নেই তাই বিড়ালও আসে না)। কয়েস (রা.) বললেন, এই মহিলা কতই না সুন্দর ইঙ্গিতে কথা বললেন! এ জন্য তাঁর ঘর আটা ও গোস্ত দিয়ে ভরে দাও।

সাহিত্য ও কাব্যে মুসলিম নারীর ভূমিকা

মুসলিম নারীগণ সাহিত্যে ও কাব্যেও গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে রেখেছেন। তাদের মধ্যে এমন স্বনামধন্য কবি-সাহিত্যিক জন্মলাভ করেছেন যাদের সামনে বড় বড় পুরুষ কবি-সাহিত্যিকও হার মানতো। আরবি কাব্যশাস্ত্রে তারা এমন অসাধারণ ভূমিকা রেখেছেন যা আজও আরবি সাহিত্য ও সংস্কৃতির সৌন্দর্য বর্ধন করে চলছে।

হজরত আয়েশা (রা.) আরবি সাহিত্যের স্বর্ণযুগে জন্মলাভ করেন। তাই শৈশবেই তিনি আরবি সাহিত্যে বিশেষ পারদর্শী হয়ে ওঠেন। তাঁর ছাত্রীরা বলেন, কাব্যে আপনার বিশেষ পারদর্শীতা এটা বিস্ময়কর কিছু নয় কারণ আপনি আবু বকরের মেয়ে। হজরত আয়েশা (রা.) ছাত্রীদের পাঠদানের সময় তাদের ভাষাশৈলী ও উচ্চারণের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতেন। কাব্যের প্রতি তাঁর বিশেষ আকর্ষণ ও পারদর্শীতার কারণে তৎকালীন খ্যাতনামা অনেক কবি তাঁকে তাদের রচনা শোনাতেন। হজরত আয়েশা (রা.) হজরত রাসূলে করীম (সা.)-এর গঠন ও সৌন্দর্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে যে কবিতা লিখেছেন তা ইতিহাসের মর্যাদাপূর্ণ স্থানে স্বতন্ত্রভাবে অমর অক্ষয় হয়ে আছে-

شمس لنا وللا فاق شمس
شمسى خيرا من شمس السماء
وشمس الناس تطلع بعد الفجر
و شمسى تطلع بعد العشاء

"আমার একটি সূর্য আছে, আছে সূর্য আকাশের
আমার সূর্য শ্রেষ্ঠ সূর্য নীল গগনের সুন্দরের

এই ধরাতে সূর্য আসে সাত সকালে হেসে
আমার সূর্য ভেসে আসে এশার পরে নিশে।”

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ফুফু হজরত সাফিয়্যা (রা.) ছিলেন আরবের খ্যাতনামা কবিদের একজন। তাঁর কবিতা ছিলো তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর কবিতা শ্রবণে স্বভাবে নম্রতা, ভদ্রতা ও শালীনতার উদ্রেক হতো। মনে প্রেরণা ও সাহসিকতার জোয়ার সৃষ্টি হতো। তিনি আপন পুত্রকে এমন কবিতা শোনাতেন যা মনে বীরত্ব ও যৌবনদীপ্ত চেতনা তৈরী করতো। সীরাতের নানা কিতাবে তাঁর কবিতা সংরক্ষিত রয়েছে। তাঁর পিতার ইন্তেকালের পর তিনি একটি শোকগাঁথা রচনা করেন যার কয়েকটি পঙ্ক্তি নিচে উল্লেখ করা হলো-

ارقت لصوت نائمة بليل
على رجل بقارعة الصعيد

“তার প্রতি রহমত বর্ষিত হোক যে নিশি রাতে মাওলার কাছে কান্নাকটি করে এবং তার ওপর রহমত বর্ষিত হোক যে মাটির নিচে বিপদে আছে।"

فضاقت عند ذالكم دموعي
على خدى كمنجدر الفريد

“বিপদসংকুল সময়ে আমার কপালে বেদনার অশ্রু টপকে পড়ে যেমন মুক্তামালা থেকে ঝরে পড়ে।”

হজরত হিন্দা বিনতে ওতবা (রা.) ছিলেন দৃঢ় মনোবল, বীর সাহসিকতা ও চমৎকার বাকশৈলীর অধিকারিনী সুমিষ্টভাষী এক নারী। তিনি প্রচুর কবিতা জানতেন। ইসলাম গ্রহণের আগে কাব্যের মাধ্যমে কাফেরদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধাচরণে উদ্বুদ্ধ করতেন। ইসলাম গ্রহণের পর জিহাদের ময়দানে ডংকা হাতে প্রেরণামূলক কবিতা আবৃত্তি করে মুজাহিদীনে ইসলামকে উদ্দীপ্ত করতেন।

মারয়াম বিনতে আবু ইয়াকুব উন্দুলুসিয়্যা (র.) তার যুগের প্রসিদ্ধ কবি ও সাহিত্যিক ছিলেন। অত্যন্ত ধার্মিক ও যোগ্যতাসম্পন্না নারী ছিলেন। নারীদের মাঝে তিনি কবিতা ও সহিত্যের দরস দিতেন। তিনি ইশবেলিয়াতে বাস করতেন।
চতুর্থ শতাব্দীর পর তার সাহিত্য প্রসিদ্ধি ও গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। তার রচিত দু'টি কবিতাপঙক্তি-

وما يرتجى من بنت سبعين حجة
وسيع كنسيج العنكبوت المهلهل

تدب دبيب الطفل تسعى إلى العص
وتمشي بها مشي الأسير المكبل

উন্দুলুসের আমীর ইবনুল মুহান্নাদ তার এই কবিতা শুনে মুগ্ধ হয়ে অনেক দীনার হাদিয়া পাঠিয়েছিলেন।

গাসসানিয়া (র.)ও উন্দুলুসের একজন প্রসিদ্ধ মহিলা কবি ছিলেন। বুজায়া নামক স্থানে তিনি বসবাস করতেন। তিনি বাদশা ও মান্যবর ব্যক্তিদের কীর্তিগাঁথা নিয়ে কবিতা লিখতেন। তিনি আমীর খায়রান আমেরী এর গুণকীর্তন করে কবিতা রচনা করেছিলেন।

উন্দুলুসের মহিলা কবিদের মাঝে দাদী আসিয়া অনেক প্রসিদ্ধ ছিলো। তিনি আমীরদের সম্মানে কবিতা লিখতেন। একবার তিনি নিজ শহর আশ থেকে ইশবীলিয়া সফর করেন এবং আমীরুল মুমিনীন খলিফা ইয়াকুবকে নিজের রচিত কবিতা শোনান।

নাযহুন নামের একজন মহিলা গ্রানাডার খুব প্রসিদ্ধ কবি ও সাহিত্যিক ছিলেন। উপস্থিত কবিতা বলা ও কবিতা দিয়ে কথার উত্তর দেওয়ার বিশেষ পারদর্শিতা ও প্রসিদ্ধি ছিলো।

মুশতাকফি বিল্লাহ মোহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান ওয়ালিয়ে উন্দুলুস এর কন্যা ওয়াল্লাদা। তার সম্পর্কে তার জীবনীকার লিখেন-

أديبة شاعرة جزلة القول مطبوعة الشعر، وكانت تخالط الشعراء وتساجل الأدباء، وتفوق البراء

তিনি একজন কবি ও সাহিত্যিক ছিলেন। তার কথাবার্তা খুবই ওজনদার ছিলো। তিনি স্বভাবকবি ছিলেন। কবি ও সাহিত্যিকদের মাঝে গিয়ে তাদের সাথে সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করতেন এবং তিনি সবার অগ্রগণ্য থাকতেন।

মুসলিম বিশ্বের পশ্চিম অংশের নারী কবি ও সাহিত্যিক সারা বিনতে আহমাদ ইবনে উসমান (র.) কবিতা ও সাহিত্যে এতো উচ্চস্তরের ব্যক্তিত্ব ছিলেন যে, ইবনে সালমুন তার থেকে অনুমতি লাভ করে গর্ব প্রকাশ করেছেন। এছাড়াও সারা ও রশিদ ফেহরীর মাঝে কবিতা ও সাহিত্যের সম্পর্ক ছিলো।

মক্কা মোকাররমার প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসা আবেদা যাহেদা খাদিজা বিনতে শায়েখ শিহাবুদ্দীন নুওয়াহরী কবি ছিলেন। এবং তিনি অত্যন্ত উঁচু মানের কবিতা লিখতেন। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর গুণগাণ করে অনেক কবিতা রচনা করেছেন।

মুহাদ্দিসা ও ফকিহা যায়নাব বিনতে কামালুদ্দীন হাশেমী (র.) মক্কা মোকাররমায় বসবাস করতেন। জ্ঞান-বুদ্ধি, প্রভাব-পতিপত্তি ও মান-সম্মানের দিক দিয়েও অনেক অগ্রগণ্য ছিলেন। পরিচ্ছন্ন ও উচ্চায়ত কাব্যরুচি ছিলো তার। অসংখ্য কবিতা তার মুখস্ত ছিলো।

উম্মে হুসাইন বিনতে কাযিয়ে মাক্কা শিহাবুদ্দীন তবারী কবিতা লিখতেন। তার কবিতা খুবই প্রসিদ্ধ ও গ্রহযোগ্য ছিলো।

উম্মে আলী তাকিয়া বিনতে আবুল ফরজ গায়েস ইবনে আলী সুলামী সূরী অনেক বড় মাপের আলেম ও জ্ঞানী ছিলেন। তার রচিত অনেক মূল্যবান কবিতা রয়েছে। তিনি সুলতান সালাহউদ্দীন আইউবী রহ.-এর ভাতিজা মুযাফ্ফর তাকিউদ্দীন ওমর এর প্রশংসা করেও কবিতা রচনা করেছেন।

সমাজ গঠন ও সংস্কারে নারীর ভূমিকা

ইসলামী জীবন ব্যবস্থার কোনো অংশই মুসলিম মহীয়সী নারীদের খেদমত থেকে বঞ্চিত নয়। সভ্যসমাজ বিনির্মাণ এবং সমাজ সংস্কারে নারীর ভূমিকা অনস্বীকার্য। পরিবার থেকে শুরু করে সমাজের বিভিন্ন স্তরের কার্যক্রমে পুরুষের পাশাপাশি নারীদের রয়েছে যথেষ্ট ভূমিকা। সমাজ গঠন ও সংস্কারে মুসলিম নারীদের কিছু কাজ নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

মহিলা মাদরাসা প্রতিষ্ঠা ও নারী শিক্ষার প্রচলন

সর্বপ্রথম নারী শিক্ষার প্রচলন করেন হজরত আয়েশা (রা.)। অবশ্য পরবর্তীতে তাবেয়ীদের মাঝে তা ব্যাপক বিস্তার লাভ করে। চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত নারীগণ নিজ ঘরেই শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ নিতেন। প্রতিটি মুসলিম পরিবার ছিলো একেকটি শিক্ষালয়। তখন মহিলাদের নিকট থেকে পুরুষগণও ইলমী বরকত অর্জন করতেন। সময়ের পরির্বতনে যখন মাদরাসা শিক্ষার প্রচলন ঘটলো তখন পুরুষদের মাদরাসার পাশাপাশি স্থানে স্থানে মহিলা মাদরাসাও প্রতিষ্ঠিত হলো। ইতিহাস বলে, যে সব মুসলিম নারী জ্ঞান অর্জন করতেন তারা কেবল গৃহ শিক্ষক, আত্মীয় স্বজন বা দু-চারজন থেকে জ্ঞান অর্জন করেই ক্ষান্ত হতেন না বরং যুগের সেরা প্রসিদ্ধ মাদরাসায় গিয়ে ইলম অর্জন করতেন। কেউবা জ্ঞান অর্জনের পর জীবনের অবশিষ্ট সবটুকু সময় শিক্ষকতা করে পার করে দিয়েছেন। কেউ কেউ নিজের টাকা দিয়ে বড় বড় মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন। নিম্নে এরকম কিছু দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হলো:

সর্বপ্রথম মহিলা মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয় পশ্চিম ফিলিস্তিনের ফাঁস নামক এলাকায়। যা আজ 'জামেয়া কুররিন' নামে খ্যাতি লাভ করে কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন ফাতেমা বিনতে মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ফাহরিয়া। এই মাদরাসার জমি ক্রয়ে তিনি তাঁর উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সব সম্পদ ব্যয় করেন। মাদরাসা নির্মাণ কালে তিনি খুব যাচাই-বাছাই করেন যাতে এখানে কোনো প্রকার সন্দেহজনক অর্থ প্রবেশ না করে। মাদরাসার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন ২৪৫ হিজরি সনের ১ লা রমজান। মাদরাসার কাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত তিনি রোজা রাখেন।

ফাতেমার বোন মারিয়াম বিনতে মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ওই বছরই একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। পরবর্তীতে ওই মসজিদটি 'জামে আল আন্দুলুসী' নামে পরিচিতি লাভ করে। প্রায় শত বছর এই মসজিদে ইলমে দ্বীনের নানা বিষয়ের তা'লীম তারবিয়াত দেওয়া হয়। ৪র্থ হিজরি শতাব্দীতে এই মসজিদকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে জামেয়া কুররিনের আরেকটি শাখা।

‘হাকিমুল মিশকাত মাআত তাখরিজ’ কিতাব থেকে জানা যায় যে দামেশকের উমর মসজিদকে কেন্দ্র করে সেখানে এক জামেয়া গড়ে উঠে ছিলো। ওই জামেয়ায় ৫০০ ছাত্রী আবাসিক থেকে লেখাপড়া করতেন।

খতীব বাগদাদীর কিতাব ‘কিতাবুল কিফাইয়া’তে আছে যে, নাঈমা বিনতে আলী, উম্মে আহমাদ, জায়নাব বিনতে আল মক্কীসহ অনেকেই তাদের সময়ের বিখ্যাত দ্বীনি বিদ্যাপীঠ

যেমন জামেয়া আজিজিয়া ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান থেকে সমগ্র জীবন ইলমে হাদীসের খেদমতে উৎসর্গ করেন। এ সব মহান নারীদের ছাত্রদের মধ্যে জেনারেল সালাহ উদ্দীনের ছেলে উল্লেখযোগ্য।

হাকিম তিরমিযি (র.) তাঁর আত্মজীবনীতে লেখেন, আমি ছোট কালে ৭ জন নারী থেকে ইলমে হাদীস অর্জন করেছি।

বিবি মারিয়াম আন্দালুসী (র.) ৪র্থ হিজরী শতাব্দীতে আসবিলিয়াতে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। যেই মাদরাসায় জ্ঞান পাগল অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী দূর দূর থেকে এসে অধ্যয়ন করেন। তিনি খুব যত্নের সাথে তাদেরকে ইলমে দ্বীন ছাড়াও আরবি সাহিত্য, অলংকারশাস্ত্র, কবিতা ইত্যাদি শিখাতেন। তাঁর মাদরাসায় অধ্যয়ন করে যে সব নারী বের হতেন অধিকাংশেরই উচ্চ বংশের সাথে সম্বন্ধ হয়ে যেতো।

ফখরুন্নীসা সাহিদা ৬ষ্ঠ হিজরি শতাব্দীর একজন খ্যাতনামা নারী মুহাদ্দীস ও লেখিকা। তাঁর জ্ঞান গরিমা, চমৎকার হাতের লেখা এবং প্রজ্ঞার কারণে তিনি 'ফখরুন্নীসা' বা 'নারীদের গৌরব' উপাধিতে ভূষিত হন। আব্বাসী খলিফা তাঁর জ্ঞানে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বিশাল এক জায়গীর দান করেন। সাহিদা জায়গীর থেকে অর্জিত অর্থ দিয়ে দজলা তীরে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। যেই মাদরাসায় শত শত শিক্ষার্থী ভর্তি হয়ে জ্ঞানের পিপাসা নিবারণ করেন। এই মাদরাসার যাবতীয় ব্যয়ভার সাহিদা নিজেই বহন করতেন।

বিবি যায়নাব বিনতে আব্দুর রহমান তাঁর যুগের (২১৫ হি.) প্রখ্যাত আলেমদের থেকে সনদ লাভ করেন। তাঁর জ্ঞানের গভীরতা সম্পর্কে ওইসব আলেম ও ফকীহগণ অবগত ছিলেন, যাদের বলা হতো যামানার ইমাম। তাঁকে আব্বাসীয় খলিফা অনুমতি দিয়েছিলেন যে, শুধু বাগদাদ নয় বরং আব্বাসীয় খেলাফতের যেখানেই ইচ্ছে সেখানেই মাদরাসা স্থাপন করতে। তাঁর কাছ থেকে অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী জ্ঞান অর্জন করেন।

মুজাহিদে আজম সুলতান সালাহউদ্দীন আইয়ুবী (র.)-এর বোন একজন আলেমা পুণ্যবতী নারী ছিলেন। তিনি দামেশকের জাবালে কাসিয়ুন নামক স্থানে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছিলেন যা মাদরাসায়ে খাতুনিয়্যা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। এই মাদরাসার ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য তিনি এক বিরাট জমিদারী ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত ওই মাদরাসা আজও বিদ্যমান আছে।

ওয়াজ-নসীহত

পর্দার আড়ালের উলামা, ফুযালা নারীগণ ওয়াজ-নসীহত ও বয়ানের মাধ্যমেও নিজেদের মাঝে ঈমান, আমলের উন্নতি ও অগ্রগতি ঘটিয়েছেন এবং তাদের মাধ্যমে ইসলামী সমাজ ও মুসলিম পরিবারগুলো সংশোধিত হয়েছে। তাদের নিজেরা নিজেদের মাঝে, শুধু নারীদের সম্মেলনে ওয়াজ করতেন, আলোচনা পেশ করতেন। এভাবে নারীত্বের গণ্ডি ও সীমার ভেতরে থেকেও সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধের মহাকর্তব্যও তারা আঞ্জাম দিয়েছেন।

ইমাম হাসান বসরী (র.)-এর মা খায়রাহ (র.) মহিলাদের মাঝে ওয়াজ করতেন। হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (র.) বলেন-

رَأَيْتُ أُمَّ الْحَسَنِ تَقُصُّ عَلَى النِّسَاء ِ

আমি হাসান বসরীর মাকে মহিলাদের মাঝে বয়ান করতে দেখেছি।

মুআযা বিনতে আবদুল্লাহ রহ. প্রসিদ্ধ তাবেয়ী হযরত সিলাহ ইবনে আশয়াম (র.)-এর স্ত্রী ছিলেন। তিনি বড় একজন আলেমা, আবেদা ও যাহেদা নারী ছিলেন। তিনি মহিলাদের মাঝে বসে ওয়াজ-নসীহত করতেন। হযরত জাফর ইবনে কায়সান রহ. বলেন-

رَأَيْتُ مُعَاذَةَ مُحْتَبِيَةً وَالنِّسَاءُ حَوْلَهَا

আমি মুআযাকে দেখেছি যে তিনি বসে ওয়াজ করতেন আর তার চার পাশে মহিলারা থাকতো।

উম্মে হাকাম আয়েশা বিনতে মোহাম্মাদ বাগদাদিয়াহ (র.) ওয়ায়েজা তথা বক্তা উপাধিতে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি মহিলাদের মাঝে ওয়াজ করতেন। ইমাম যাহাবী (র.) লিখেছেন-

وكانت صالحة تعظ النساء

তিনি অত্যন্ত বুজুর্গ ছিলেন। তিনি মহিলাদের মাঝে বয়ান করতেন।

উম্মে আহমাদ যুলাইখা বিনতে ইলিয়াস গযনবীয়্যাহ 'ওয়ায়েজ' তথা বক্তা উপাধিতে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি অত্যন্ত পর্দানশীন, আবেদা ও যাহেদা নারী ছিলেন। ঘরে ঘরে গিয়ে মহিলাদেরকে ওয়াজ শোনাতেন। ইমাম ফাসী (র.) লিখেন-

وَكَانَتْ تَعِظُ وَتَلْبَسُ الْمُرَقَّعَةَ فِي دُوَيْرَةِ النِّسَاء

তিনি বয়ান করতেন। অত্যন্ত পর্দার সাথে অন্য মহিলাদের বাড়ি যেতেন।

ওয়াজ-নসীহতের মত খেদমতের ক্ষেত্রে শায়েখা, আলেমা, মুহাদ্দিসা, যাহেদা হযরত উম্মে যায়নাব ফাতেমা বিনতে আব্বাস বাগদাদিয়া (র.)-এর খেদমত ছিলো উল্লেখ করার মতো। তার ওয়াজ-নসীহতে শুধু বাগদাদের নারীরাই উপকৃত হয়নি বরং দামেশক ও মিসরের নারীরাও ব্যাপকভাবে উপকৃত হয়েছে। এজন্যই তিনি 'যুগের নারীদের সরদার' উপাধিতে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

ইমাম যাহবী (র.) লিখেন, তার থেকে নারীজাতির বিরাট উপকার হয়েছে। বহু নারী গুনাহ থেকে তওবা করে সঠিক পথে ফিরে এসেছে। তিনি অনেক বড় মাপের আলেমা ও অল্পেতুষ্ট মানুষ ছিলেন। নারীদের শিক্ষা-দীক্ষা প্রদানে অত্যন্ত আগ্রহী মানুষ ছিলেন। তার মাঝে সততা ও খোদাভীরুতা অনেক বেশি ছিলো। তিনি মানুষকে সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করতেন। তার মাধ্যমে দামেশক ও মিসরের অনেক নারী সংশোধিত হয়েছে। সর্বশ্রেণীর মানুষের অন্তরে তার জন্য সীমাহীন ভক্তি-শ্রদ্ধা ছিলো। তিনি সবার মাঝে গ্রহনযোগ্য ব্যাক্তিত্ব ছিলেন।

আধ্যাত্মিক সংশোধনে নারী

মুসলিম মহিয়সী নারীদের মাঝে অসংখ্য নারী এমন নেককার ও বুজুর্গ ছিলেন যাদের পবিত্র আত্মার বরকতে মুসলিম নারীসমাজে তাকওয়া, পরহেযগারী ইবাদত-বন্দেগী ও আত্মসংশোধনের জাগরণ তৈরী হয়েছে। ওই মহিলা আবেদ, যাহেদ ও সুফীগণ নিজেদের মাঝে অর্থাৎ মহিলা অঙ্গনে আধ্যাতিকতা ও আত্যশুদ্ধির ক্ষেত্রে বিরাট কর্ম আঞ্জাম দিয়েছেন। তাদের ঘরে, খানকায় নারীদের আত্মিক ও চারিত্রিক সংশোধনের কাজ হয়েছে। তাদের ফয়েজ ও বরকতের ধারায় মানুষের মাঝে সততা, আধ্যাতিকতা, 'জীবন্ত বন্দেগীর' বন্যা বয়ে গেছে।

উম্মে আহমাদ যুলাইখা গযনবীয়্যাহ ওয়ায়েজ তথা বক্তা উপাধিতে প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং অত্যন্ত পর্দা-পুশিদার সাথে চলতেন। তিনি নারীদের কাছে গিয়ে গিয়ে ওয়াজ করতেন, দীনের পথে চলতে উদ্বুদ্ধ করতেন।

ফাতেমা বিনতে হুসাইন রাযিয়াহ (র.) ওয়ায়েজ তথা বক্তা উপাধিতে প্রসিদ্ধ ছিলেন। অত্যন্ত ইবাদতগুজার ও সূফী ছিলেন। তার সম্পর্কে ইমাম ইবনুল জাওযী (র.) লিখেছেন,

كانت واعظة متعبدة لها رباط تجتمع فيه الزاهدات
তিনি বক্তা ও ইবাদতগুজার ছিলেন এবং তার খানকা ছিলো, যেখানে আবেদা, যাহেদা নারীগণ একত্রিত হতেন।

তাজুননিসা বিনতে রুস্তম আসফাহানিয়া (র.) মক্কা মোকাররমায় স্থায়ীভাবে অবস্থান করে দুনিয়াবিরাগী ও আধ্যাত্মিক জীবন অতিবাহিত করেন। ইমাম তাকিউদ্দীন ফাসী মাক্কী রহ. লিখেছেন,

وكانت مقدمة الصوفية بها
তিনি মক্কা মোকাররমায় সূফীদের মাঝে সকলের অগ্রগণ্য ছিলেন।

এমনিভাবে মক্কা মোকাররমার প্রসিদ্ধ আলেমা, যাহেদা হযরত সাফিয়্যাহ বিনতে ইবরাহীম (র.) সম্পর্কে ইমাম তাকিউদ্দীন (র.)-এর বক্তব্য হলো-

شيخة الصوفيات خادمة الفقراء بالحرمين الشريفين
তিনি মক্কা, মদীনায় নারী সূফীদের সরদার ও দরিদ্রদের সেবক ছিলেন।
অর্থাৎ সাফিয়্যাহ বিনতে ইবরাহীম (র.) হারামাইনের আবেদা, যাহেদা ও সূফীয়াদের অনুসৃত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তাদের শিক্ষা ও সংশোধনের খেদমত করতেন।

যাহরা বিনতে মোহাম্মাদ ইবনে আহামাদ (র.)-কে ঐতিহাসিকগণ শায়েখা, সালেহা, সুফীয়া উপাধিতে স্মরণ করেছেন। দামেশকে তার নিজের নামে সরাইখানা ছিলো। ঐ সরাইখানার সাথেই তিনি বসবাস করতেন এবং তার খানকায় অবস্থানরত যাহেদা, সুফীয়াদের শিক্ষা-দিক্ষা দিতেন।

ফাতেমা বিনতে মোহাম্মাদ কাসতাল্লানিয়াহ মক্কীয়্যাহ (র.) একজন মুহাদ্দিস হওয়ার পাশাপাশি বড় একজন সুফীও ছিলেন। তিনি সুফীবাদের শিক্ষা গ্রহন করেছিলেন শায়েখ নাজমুদ্দীন তিবরীযী (র.) থেকে। তার কাছে যেসব মুহাদ্দিসিন পড়তে আসতেন তাদেরকেও তিনি 'খিরকায়ে তাসাওউফ' পরিয়ে দিতেন।

ইমাম হাফেয যিয়াউদ্দীন মাকদিসী (র.)-এর বোন, শায়েখ মাজদুদ্দীন ঈসা (র.)-এর স্ত্রী আসিয়া মাকদিসীয়্যাহ (র.) তার যুগের আবেদাদের একজন ছিলেন। ধর্ম-কর্ম, কল্যাণ ও নেককাজে অনেক অগ্রগণ্য ছিলেন। কিতাবুল মুশতাবিহাতে তার সম্পর্কে লেখা হয়েছে,

وآسية أُخت الحافظ الضياء من العوابد. قلت: لو قال: العابدات كان اسلم حفظت القرآن العزيز توصف بالدين والخير والصلاح ولها ورد وما في زمانها مثلها

'হাফেয যিয়ার বোন আসিয়া আবেদাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি কুরআন হেফয করেছিলেন। ধর্ম-কর্ম ও নেককারীর গুণে গুণান্বিত ছিলেন। তিনি আমল ও অযিফা পালনে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি তার যুগের একজন তুলনাহীনা নারী ছিলেন।'

জনকল্যাণমূলক কাজে নারীর ভূমিকা

সৃষ্টিগতভাবেই সেবামূলক কাজ এবং আচরণ নারীর স্বভাবজাত। তাই আমরা যেমন নববী সময় থেকে সাহাবিয়াতগণের জীবনীতে এর বহিঃপ্রকাশ পাই, তেমনি বর্তমান পর্যন্ত বিভিন্ন সময়কালে এমন অনেক দৃষ্টান্ত মুসলিমাহগণ স্থাপণ করে গেছেন।

নারীদের খানকাহ ও সরাইখানা নির্মাণ

মুসলিম নারীরা মাদরাসার মত এমন বহু খানকা ও সরাইখানা তৈরী করেছেন, যেখানে আবেদা, যাহেদা ও সুফী নারীগণ নিশ্চিন্তে ও নির্বিঘ্নে তাকওয়া, পরহেজগারী ও সূফীয়ানা জীবন অতিবাহিত করতে পারতেন।

যাহরা বিনতে মোহাম্মাদ অত্যন্ত নেককার ও সুফী ছিলেন। তিনি দামেশকে নিজের নামে সরাইখানা তৈরী করেছিলেন; 'যাহরা সরাইখানা'। এর পাশেই নিজের আবাস তৈরী করে সেখানে আগত মেহমান, আবেদা, যাহেদা নারীদেরকে ইলমী ও দীনি সেবা দান করতেন।

ফাতেমা বিনতে হুসাইন (র.) অনেক বড় একজন আবেদা, যাহেদা ও বক্তা মহিলা ছিলেন। তিনিও আবেদা, যাহেদা ও সুফীয়াদের জন্য একটি সরাইখানা নির্মাণ করেছিলেন।

পবিত্র মক্কা নগরিতেও অনেক মহিলা খানকা ও সরাইখানা নির্মান করেছিলেন, যেখানে আবেদা, যাহেদা নারীদের জন্য সবধরনের সুযোগ-সুবিধা ও আরামের ব্যবস্থা ছিলো।

শরীফা ফাতেমা আমীর আবু লাইলা মোহাম্মাদ (র.) ৫৭৭ হিজরীতে 'মহিলা সরাইখানা' নির্মাণ করে ওয়াকফ করেন।

উম্মে হুসাইন বিনতে শিহাবুদ্দীন তবারিয়্যাহ মক্কীয়্যাহ (র.) 'সায়্যেদা সরাইখানা' নামে একটি সরাইখানা তৈরী করে ফকীর, মিসকীনদের জন্য ওয়াকফ করে দেন।

ইমাম কুতবুদ্দীন কাসতল্লানী (র.)-এর আম্মা এবং মক্কা মোকাররমার আরো কয়েকজন মহিলা মিলে 'মাসাজাহ সরাইখানা' নামে একটি সরাইখানা নির্মান করেন, যেখানে ভিনদেশী, অসহায় দ্বীনদার মহিলারা থাকতেন।

আবু মারছাদ মুবারক ইবনে আবদুল্লাহ কাসেমীর দুই কন্যা উম্মে খলীল খাদিজাহ ও উম্মে ঈসা মারয়াম 'ইবনে সাওদা সরাইখানা' ক্রয় করে শাফেয়ী মাযহাবের বিধবা আবেদা, সুফিয়া মহিলাদের জন্য ওয়াকফ করেছিলেন।

উম্মে সুলাইমান ও বিনতে হাররাবী দু'জন মিলে 'যাবিয়াহ উম্মে সুলাইমান' ও 'বিনতে হারাবী সরাইখানা' নামে দু'টি খানকা নির্মাণ করেছিলেন, যেখানে মক্কা মোকাররমার বুযুর্গ মহিলাগণ থাকতেন।

ইয়ামানের সুলতান মালিকুল আশরাফ ইসমাঈল ইবনে ফযল এর স্ত্রী কারীমাহ মক্কা মোকাররমায় 'আল জিহাহ সরাইখানা' নামে একটি সরাইখানা তৈরী করে ওয়াকফ করেন।

'বানফাশাহ' নামের একজন মহিলা যার উপাধি ছিলো, 'আল জিহাহ মুয়াজ্জমাহ'। তিনি একজন আলোমা, ফাযেলা ও দয়াবান মহিলা ছিলেন। তিনি ‘সূকুল মাদীনা' নামক স্থানে সুফি ও আবেদা মহিলাদের জন্য একটি খানকা তৈরী করেন। এই খানকায় একটি ঘর বিশেষভাবে নির্ধারিত ছিলো জাওযানী খানকার শায়েখ ও মুরশিদ আবু বকর সুফির বোনের জন্য।

শাহী পরিবারের নারীদের জনকল্যাণমূলক কাজ

শাহী পরিবারের বিভিন্ন নারীদের জনকল্যাণমূলক কাজ ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। তারা ছিলেন রাজা-বাদশা ও সুলতানদের ঘরের মহিলা; তাদের স্ত্রী ও কন্যা। রাজকীয় সুরম্য প্রাসাদে প্রার্থী সব রকম সুখ স্বাচ্ছন্দে বেষ্টিত থেকেও তারা দ্বীনি, ইলমী ও জনকল্যাণমূলক কাজ একমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্যই করতেন। তাদের অনেকেই রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব ও কাজকর্ম অত্যন্ত সুচারুরূপে আঞ্জাম দিয়ে দৃষ্টান্ত তৈরি করেছেন। এ বিষয়ে অনারবী মহিলাদের কীর্তিও অনেক বেশি। এই ঘটনাগুলো ধনাঢ্য মুসলিম নারীদের জন্য বিশেষভাবে শিক্ষণীয়। ধর্মীয় ও কল্যাণমুখী কজে তাদেরও এগিয়ে এসে অংশগ্রহণ করা দরকার। এখানে শাহী পরিবারের নারীদের জনকল্যাণমূলক কাজের কিছু উদাহরণ তুলে ধরা হলো:

যুবাইদা (র.) ছিলেন হারুনুর রশীদের স্ত্রী। তার আসল নাম আমাতুল আযীয। তার দাদা খলিফা আবু জাফর মানসুর ছোটাবেলায় তাকে যুবাইদা বলে ডাকতেন। সে থেকে এই নামেই তিনি প্রসিদ্ধ হয়ে যান। তার কাছে কুরআনের হাফেয একশত কৃতদাসী ছিলো। তাদের প্রত্যেকেই দৈনিক দশ পারা কুরআন তেলাওয়াত করতেন। এটা তাদের নিয়মিত অযিফা ছিলো। তাদের তেলাওয়াতে যুবাইদার মহল গুঞ্জরিত হয়ে উঠতো।
হযরত যুবাইদা (র.)-এর অনেক জনহিতকর কাজ রয়েছে। এগুলোর মধ্যে 'নহরে যুবাইদা' এখনও মক্কা মোকাররমায় পানির অভাব পূরণ করছে। সাধারণত নারীগণ তাদের স্বামীকে দিয়ে ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ায় নানা স্মৃতি চিহ্ন, নানা কীর্তি তৈরী করাতে চায়। তিনি তাঁর স্বামীর কাছে আবেদন করলেন, হিজাজের পানি সংকট দূর করতে তায়েফ এবং ওয়াদিয়ে নুমানের জলধারাসমূহ থেকে মক্কা পর্যন্ত পানি পৌছানোর একটি ব্যবস্থা করো। যা থেকে লাখো মানুষ, পশু-পাখি পানি পান করেছে এবং এর সওয়াব এই নেক নারী পেয়েছেন।
হুনাইন থেকে পাহাড় কেটে কেটে একটি খাল মক্কা পর্যন্ত নিয়ে আসা হয়েছিল এবং ওয়াদিয়ে নুমান থেকে আরেকটি খাল আরাফা পর্যন্ত নিয়ে আসা হয়েছিল। এই কাজে যিনি তার প্রতিনিধি ছিলেন তিনি বলেন, কাজটি অনেক ব্যয়বহুল ছিলো। মুহতারামা বললেন, তুমি কাজ করতে থাক, যদি পাহাড় ভাঙ্গার কাজে একেকটি হাতুড়ির আঘাতের মূল্য এক দীনার করেও হয় তার পরও করতে থাক। একটি হিসাব অনুযায়ী নহরে যুবাইদা তৈরীতে ব্যয় হয়েছিলো, সতের লক্ষ দীনার। কাজ শেষে প্রতিনিধি যখন মুহতারামা যুবাইদার কাছে হিসাব নিয়ে গেলো তখন তিনি বললেন, আমরা এই হিসাবকে 'হিসাব দিবসে'র জন্যই রেখে দেই!
সেই তখন থেকে আজ পর্যন্ত যুগে যুগে মক্কার শাসকরা এই খালের সাফাই ও মেরামত করে করে একে ঠিক রেখেছেন। এই কাজে হিন্দুস্তানী মুসলমানরাও বিভিন্ন সময় অংশগ্রহণ

করেছেন। গত শতকে তারা একটি সংস্থা তৈরী করে হিন্দুস্তানের শাসকদেরকে সেই কাজে শরীক করেছে।
মুহতারামা যুবাইদা এই খাল ছাড়াও মক্কা মোকাররমায় আরো পাঁচটি বৃহৎ হাউজ তৈরী করেছেন। মক্কা মোকাররমায় অনেক বাড়ি কিনে সেগুলো মুসাফিরদের জন্য ওয়াকফ করেছেন। এই বাড়িগুলোর মধ্যে দারুল আরকামও ছিলো। তিনি তার খাদেমকে বাবে এহইয়া কাবীরে একটি অযুখানা নির্মাণের নির্দেশ দেন। এগুলো ছাড়াও আল্লাহর এই প্রিয় বান্দী ও খোদাপ্রেমিক মহিলা আরো বহু জনকল্যাণমূলক কাজ করেন।

ফাতেমা খানম (র.) তুর্কীর এক প্রভাবশালী বাদশাহর পুণ্যবতী কন্যা ছিলেন। তিনি 'নহরে যুবাইদা'-এর পুনঃসংস্কারকারিনী ছিলেন। 'নহরে যুবাইদা' খননের প্রায় সাতশত বছর পর মক্কার সমস্ত ঝর্না এবং কূপ শুকিয়ে যায়। রাজকন্যা ফাতেমা (র.) স্থির করেন যেভাবেই হোক মক্কার প্রতিটি ঘরে ঘরে পানি পৌছাবেন। তিনি তার এক অনুগত কর্মচারীকে অর্থসম্পদ দিয়ে নির্দেশ দেন, মক্কায় গিয়ে যেন প্রথমেই 'নহরে যুবাইদা'-এর সংস্কার করায় ও তা জাবালে আরাফার পার্শ্ববর্তী 'নহরে যুবাইদা'-এর উৎপত্তিস্থল থেকে মক্কা পর্যন্ত পৌঁছানোর ব্যবস্থা করে।
তিনি মক্কায় পৌছে খ্যাতনামা সব ইঞ্জিনিয়ার ও শত শত শ্রমিককে ঝর্না পরিষ্কার, সংস্কার ও বিস্তারের কাজে নিয়োগ দেন। কিন্তু মক্কা শহর ও নহরে যুবাইদার মধ্যবর্তী স্থানে এমন সব পাথর খণ্ড পাওয়া যায় যা কাটা মুশকিল হয়ে পড়ে।
ওই সময় তো আর এ রকম কোনো মেশিন ছিল না যা দিয়ে এসব পাথরের পাহাড় কাটা যায়। ফলে ইঞ্জিনিয়ারগণ সাহস হারিয়ে ফেলেন। কিন্তু রাজকন্যা ফাতেমা (র.) সাহস হারালেন না। তিনি নির্দেশ দিলেন যেভাবেই হোক তা করতে হবে। তাঁর কঠোর নির্দেশে অসংখ্য শ্রমিক দীর্ঘ ১০ বছর হাড় ভাঙ্গা পরিশ্রম করে 'নহরে যুবাইদা' মক্কায় পৌছান। ওই দিন ছিলো মক্কার লোকদের আনন্দের দিন। তিনি মক্কায় নিমন্ত্রণের আয়োজন করেন এবং ফকির-মিসকিনদের মধ্যে মুক্ত হস্তে দান-খায়রাত করেন। এই অসাধারণ কীর্তিমান কাজের কারণে রাজকন্যা ফাতেমা (র.)-কে দ্বিতীয় যুবাইদা বলা হয়।

সাফারিয়াহ খাতুন সুলতান মালিক শাহের প্রিয় দাসী ছিলো। তার গর্ভেই জন্ম নিয়েছিলো সুলতান সানজার। এই মহিয়সী নারী সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি অত্যন্ত দীনদার মহিলা ছিলেন। মক্কার পথে হাজীদের জন্য পানির ব্যবস্থা করতেন।

ইমাম মোহাম্মাদ ইবনে আহমাদ ইবনে জুবাইর উন্দুলুসী (র.) ৫৭৯ হিজরীতে তার হজের সফরনামায় তিনজন রাজরানী ও রাজকন্যার আলোচনা ও মক্কা মোকাররমায় তাদের দান ও খেদমতের কথা উল্লেখ করেছেন। এই তিনজনই সে বছর হজের সফরে এসেছিলেন।

প্রথমজন হলেন, দারবে আরমান ও রোমের সুলতান মাসউদের কন্যা। তখন তার বয়স ছিলো মাত্র পঁচিশ বছর। তিনি লিখেছেন যে, এই কমবয়সী মেয়ে হজের সফরে অনেক সওয়াবের কাজ করেছেন। তার ত্রিশটি উট হাজীদের জন্য পানি সরবরাহের কাজে নিয়েজিত ছিলো। ত্রিশটি ছিলো খাবার পরিবহনে। আর এছাড়াও আরো একশ'টি উট ছিলো অন্যান্য মালামাল পরিবহনের কাজে। এই সব কিছু তিনি করেছিলেন হাজীদের সুবিধার্থে। এছাড়াও তার আরো অনেক কল্যাণমুখী কাজ রয়েছে যার আলোচনা অনেক দীর্ঘ।

দ্বিতীয়জন হলেন, মুইজ্জুদ্দীনের মা সুলতান নুরুদ্দীন যানকীর ভাই বাবেক এর স্ত্রী। এই মহিয়সী নারীরও অনেক জনহিতকর কাজ রয়েছে।

তৃতীয়জন হলেন, আসফাহানের সুলতান দাকওয়াসের কন্যা। তিনি অনেক শান- শওকতের অধিকারী এবং নেক কাজের প্রতি অত্যন্ত আগ্রহী একজন নারী ছিলেন।

এই তিনজন মহিলারই নেক কাজ ও শান-শওকত ছিলো অবাক করার মত।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা

রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও মুসলিম নারীগণ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছেন। উম্মাহাতুল মুমিনীনদের মধ্যে উম্মে সালামা (রা.) জাতীয় জীবনের জটিল সমস্যা সমাধানে যে ভূমিকা পালন করেছিলেন তার কারণে তাকে ইসলামে রাষ্ট্রপ্রধানের উপদেষ্টার মর্যাদায় স্মরণ করা হয়। নবীজি মক্কা অভিযানের উদ্দেশ্যে ১৪০০ সাহাবীর বিরাট বাহিনী নিয়ে মদীনা থেকে মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন। হুদায়বিয়া নামক স্থানে পৌঁছে তিনি জানতে পারেন কুরাইশরা তাকে মক্কা প্রবেশ ও উমরা পালন করতে দেবে না। তিনি আলোচনার জন্য মক্কায় হযরত উসমান (রা.)-কে পাঠান। ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে কুরাইশদের সাথে শান্তিচুক্তি হয়। কিন্তু বাহ্যত এই চুক্তি ছিল মহানবী ও মুসলমানদের জন্য অবমাননাকর। শান্তির স্বার্থে ও ভবিষ্যতের বৃহত্তর সুফলের আশা নিয়ে নবীজি এই চুক্তি স্বাক্ষর করেন।

চুক্তির শর্ত ও চুক্তি স্বাক্ষরকালে মক্কার মুশরিকদের ঔদ্ধত্বপূর্ণ আচরণে মুসলমানরা ভীষণ ক্ষিপ্ত ছিল। বিপুল সংখ্যক জানবাজ যোদ্ধা সঙ্গে থাকা সত্ত্বেও মহানবীর পক্ষ হতে মুশরিকদের অযৌক্তি সব শর্ত মেনে নেয়াকে সহজভাবে মেনে নিতে পারছিল না, হযরত উমর (রা.) এর মত বিশাল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সাহাবীও। শেষ পর্যন্ত চুক্তি স্বাক্ষর হল। শর্ত অনুযায়ী মুসলমানরা উমরা পালন না করেই ফেরত যাবে। মক্কার হেরেমে কুরবানীর জন্য যেসব পশু তারা সাথে এনেছিল সেগুলো হুদায়বিয়াতেই যবাই করতে হবে। এখানেই উমরার ইহরাম খুলতে হবে।

নবীজি সাহাবীদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা দিলেন, তোমরা কুরবানীর পশু জবাই কর। মাথার চুল ছেঁটে ফেল। ইহরাম খুলে স্বাভাবিক হয়ে যাও। কিন্তু আশ্চর্য যে, যারা নিজের জান বাজি রেখে হযরতের নির্দেশে প্রাণ দিতে হুদাইবিয়া প্রান্তর পর্যন্ত এসেছেন, তারা এখন হযরতের আদেশ পালনে তৎপর হচ্ছেন না। নবীজি তার আদেশটি তিনবার ঘোষণা করলেন। কিন্তু কেউ আদেশ পালনে অগ্রসর হয় না। এ অবস্থা দেখে নবীজি চিন্তিত মনে তাঁবুতে ঢুকে উম্মে সালামা (রা.)-কে লোকদের অবস্থার কথা জানালেন।

নেতৃত্বের আনুগত্য ও প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর চেয়ে গভীর ও জটিল সংকট আর কিছু হতে পারে না। এই সংকট সমাধানে প্রচন্ড আত্মবিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে এলেন নবীজির যোগ্য সহধর্মীনী আমাদের মা উম্মে সালামা (রা.)। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি চান যে তারা আপনার আদেশ পালন করুক। তাহলে আপনি তাদের কারো সাথে একটি কথাও বলবেন না। শুধু সবার সামনে গিয়ে আপনার উটনীটি নহর (জবাই) করুন। তারপর আপনার নাপিতকে ডেকে আপনার মাথা মুন্ডানোর ব্যবস্থা করুন। এই পরামর্শ পেয়ে নবীজি তাঁবু হতে বের হলেন এবং কারো সাথে কোনো কথা না বলে নিজের উটনী নহর করলেন। তারপর নাপিত ডেকে মাথা মুন্ডন করলেন।

লোকেরা যখন এই দৃশ্য দেখল, সবাই তাদের কুরবানীর পশু নহর করল। একজন আরেকজনের মাথা মুন্ডন শুরু করল। এতক্ষণ তারা ভাবছিল যে, মুশরিকদের সাথে দৃশ্যত অবমাননাকর চুক্তি হয়ত পুনর্বিবেচনা হবে, তাই পশু জবাই ও মাথা মুন্ডনের জন্য নবীজির আদেশ পালনে তাই তারা ইতস্তত করছিল। কিন্তু যখন প্রমাণ হল যে, নবীজি তাঁর সিদ্ধান্ত ও আদেশের ব্যাপারে অবিচল তখন তারা সেই আদেশ পালনে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। বস্তুত, জাতীয় জীবনের এই রকম গুরুত্বপূর্ণ একটি সমস্যা সমাধানে হযরত উম্মে সালমা (রা.)-এর রাষ্ট্রপ্রধানের উপদেষ্টার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে বিচক্ষণতার প্রমাণ দেওয়া মুসলিম মহিলাদের জন্য আলোকবর্তিকা হিসেবে রয়ে গেছে।

খলীফা হযরত উমর (রা.) শিফা বিনতু আব্দিল্লাহ (রা.)-এর রাজনৈতিক বুদ্ধিমত্তাকে মূল্যায়ন করতেন এবং সময়ে সময়ে তাঁর সাথে অনেক বিষয়ে পরামর্শ করতেন। এমনকি তিনি তাঁকে রাষ্ট্রের ব্যবসা-বাণিজ্যবিষয়ক দায়িত্ব পালনের জন্য নির্বাচিত করেছিলেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনা থেকে হিজরতের পূর্বে কাফিররা তাঁকে নিজ গৃহে হত্যার পরিকল্পনা করেছিল। এ ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে রুকাইকা বিনতু সাইফি (রা.) সতর্ক করেছিলেন। তারপরই নবীজি নিজ বিছানায় হযরত আলী (রা.)-কে রেখে গোপনে মদিনায় হিজরত করেন।

ইসলামে নারীদের ব্যাপক রাজনৈতিক অধিকারের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। একজন নারী ইচ্ছে করলে শত্রুকে নিরাপত্তা দিতে পারেন; সে অধিকার তাঁকে দেওয়া হয়েছে। ইতিহাসবিদ আবু দাউদ, হযরত আলী (রা.)-এর বোন উম্মু হানি (রা.)-এর সাথে সম্পৃক্ত করে একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। উম্মু হানি (রা.) একজন কাফির শত্রুকে আশ্রয় দেন। এ বিষয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,
'তুমি যাকে আশ্রয় দান করেছ, আমরাও তাকে আশ্রয় দান করেছি; তুমি যাকে নিরাপর প্রদান করেছ, আমরাও তাকে নিরাপত্তা করেছি।' এ ক্ষেত্রে ইসলামের বিধান হচ্ছে মহিলাদের নিরাপত্তা দানের সাথে ইমাম বা নেতার একমত হতে হবে।

ইসলাম পরবর্তী যুগে নারীর রাজনীতি সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ন ঘটনা হলো জামাল যুদ্ধ। জামাল যুদ্ধের একাংশের নেতৃত্ব দেন আয়েশা (রা.)। তাঁর পক্ষে ছিল তালহা (রা.), যুবাইর (রা.) সহ বিপুল সাহাবায়ে কেরাম। আর অপর পক্ষের নেতৃত্বে ছিলেন আলী (রা.)।

চিকিৎসাক্ষেত্রে মুসলিম নারী

চিকিৎসাবিদ্যার উন্নতি, প্রসারে নিঃসন্দেহে পুরুষদের পাশাপাশি মুসলিম নারীদেরও রয়েছে অনন্য ভূমিকা । মুসলিম নারীরা ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকে শুরু করে আধুনিক যুগ পর্যন্ত চিকিৎসা ক্ষেত্রে যে ভূমিকা পালন করেছেন, তা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে ৯ জন নারী চিকিৎসকের সন্ধান পাওয়া যায়। তারা শল্যচিকিৎসা বা অস্ত্রোপচার, ধাত্রীবিদ্যা ও স্ত্রীরোগসহ বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন। যখন কোনো মুসলিম বাহিনী শত্রুদের সঙ্গে লড়াইয়ের জন্য রওয়ানা করতেন তখন অনেক নারী সৈনিক তাদের সঙ্গে যেতেন। মূলত যুদ্ধের সময় পুরুষগণ যুদ্ধ পরিচালনায় ব্যস্ত হয়ে যেতেন কিন্তু আহতদের চিকিৎসা, ব্যান্ডেজ করে দেওয়া, পানি পান করানো, অস্ত্র এগিয়ে দেওয়াসহ আনুষঙ্গিক কাজ আঞ্জাম দিতেন নারীগণ। এর দ্বারা ইসলামের ইতিহাসে নারীদের চিকিৎসায় অবদানের প্রমাণ মিলে। পরবর্তীতে ইসলামের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসাবিদ্যারও ব্যাপক চাহিদা ও বিস্তার ঘটে। শরীয়তের মাসআলা-মাসায়িলের প্রতি লক্ষ রেখে ব্যাপক প্রয়োজন হয় মহিলা চিকিৎসকেরও। ফলে অসংখ্য মুসলিম নারী চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে ওঠেন।

রুফাইদা আল-আসলামিয়্যা

তার বাবা সাদ আসলামি পেশায় চিকিৎসক ছিলেন। রুফাইদা তার বাবার কাছ থেকে চিকিৎসাবিদ্যার শিক্ষা নেন। জাহেলি ও ইসলামী যুগে তিনি অস্ত্রোপচার ও যুদ্ধে আহতদের চিকিৎসা করতেন। মাহমুদ ইবনে লাবিদ (রা.) থেকে বর্ণিত, ‘খন্দক যুদ্ধের দিন সাদ (রা.)-এর চোখ আঘাতপ্রাপ্ত হয়। অবস্থার অবনতি হলে তাকে রুফাইদা নামক এক নারীর কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। তিনি আহতের চিকিৎসা করতেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকাল-সন্ধ্যা সাদ (রা.)-কে তাঁর অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন।’ (আদাবুল মুফরাদ, হাদিস : ১১৩৯)

উম্মে আতিয়্যা আল-আনসারিয়্যা

অপর নাম নুসাইবা বিনতে কাব। জাহেলি ও ইসলামী যুগে তিনি চিকিৎসায় প্রসিদ্ধি লাভ করেন। অস্ত্রোপচার ও চক্ষু বিশেষজ্ঞ ছিলেন তিনি। উম্মে আতিয়্যা (রা.) থেকে বর্ণিত, 'আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে সাতটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। আমি তাঁদের বাহন ও মালপত্র দেখাশোনার জন্য পেছনে থেকে তাদের খাবার তৈরি করতাম, আহতদের চিকিৎসা করতাম এবং রোগীদের দেখাশোনা করতাম।' (ইবনে মাজাহ, হাদিস : ২৮৫৬)

আশ-শিফা বিনতে আবদুল্লাহ

জাহেলি ও ইসলামী যুগে লেখাপড়া জানা লোকদের অন্যতম ছিলেন তিনি। হিজরতের আগে ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে মদিনায় হিজরত করেন। তিনি মুসলিম নারীদের শিক্ষা দিতেন। হাফসা (রা.) তাঁর কাছে হস্তশিল্প শেখেন। ইসলামের ইতিহাসে তিনি প্রথম শিক্ষিকা হিসেবে পরিচিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে যুদ্ধে বের হতেন তিনি। অসুস্থ ও আহতদের চিকিৎসা করতেন। সাহাবিরাও বিভিন্ন সময় তাঁর কাছ থেকে চিকিৎসা গ্রহণ করতেন। আশ-শিফা বিনতে আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'একবার আমি হাফসা (রা.)-এর কাছে ছিলাম, তখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে এসে বললেন— তুমি তাকে (হাফসাকে) যেভাবে লেখা শিখিয়েছ, সেভাবে পিঁপড়া (পোকা) কামড়ের ঝাড়ফুঁক শিক্ষা দাও না কেন?' (আবু দাউদ, হাদিস : ৩৮৮৭)

হজরত আয়েশা (রা.)

উরওয়াহ বলেন, আমি চিকিৎসাবিদ্যায় হজরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর চেয়ে অধিক দক্ষতা সম্পন্ন আর কাউকে দেখি নাই। কেউ একবার হজরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) কে বললেন, আপনি কবিতায় বিশেষ পারদর্শী তা দেখে আমরা বুঝে নেই আপনি আবু বকরের মেয়ে কিন্তু আপনি চিকিৎসা বিদ্যায় এ রকম পারদর্শী কীভাবে হলেন? জবাবে হজরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বললেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ বয়সে অসুস্থ ছিলেন। তাঁর চিকিৎসার জন্য আরবের চিকিৎসকগণ আসতেন। তারা যা বলতেন আমি তা মুখস্থ করে নিতাম।

জয়নব তবিবাতু বনি আউদ

তিনি জয়নব আশ-শামিয়া নামেও পরিচিত ছিলেন। উমাইয়া যুগের প্রসিদ্ধ চিকিৎসক। উমাইয়া খলিফাদের স্ত্রীদের চিকিৎসা করতেন। অস্ত্রোপচার ও চক্ষু বিশেষজ্ঞ ছিলেন তিনি।

উখতুল আবু বকর ইবনে জাহরা

তিনি স্পেনের প্রসিদ্ধ জাহরা পরিবারের মেয়ে, যে পরিবারের সবাই চিকিৎসক ছিলেন। প্রসিদ্ধ চিকিৎসক আবু বকর ইবনে জাহরার বোন। ধাত্রীবিদ্যা ও স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ছিলেন তিনি। স্পেনজুড়ে তাঁর খ্যাতি ছিল। তাঁর বাবা, ভাই এবং মেয়েও চিকিৎসক ছিলেন।

বিনতু দিহনিল লাউজ

তার মা দিহনুল লাউজ ছিলেন দামেস্কের প্রসিদ্ধ মুসলিম স্কলার। চিকিৎসাজগতে বিনতু দিহনিল লাউজের ব্যাপক খ্যাতি ছিল। তিনি উমাইয়া শাসকদের পত্নীদের চিকিৎসা করতেন।

বিনতু শিহাবুদ্দিন আবিস সায়েগ

তিনি আহমদ ইবনে সিরাজুদ্দিনের মেয়ে। তাঁর উপাধি ছিল শিহাবুদ্দিন। কায়রো দারুশ-শিফা আল-মানসুরিয়ার প্রধান ছিলেন তিনি। মৃত্যুর পর তাঁর মেয়ে বিনতু শিহাবুদ্দিনকে কায়রো দারুশ-শিফা আল-মানসুরিয়ার প্রধান করা হয়। বিনতু শিহাবুদ্দিন চিকিৎসাজগতে খুব প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

উম্মুল হাসান

তার পুরো নাম উম্মুল হাসান বিনতে কাজী আবু জাফর আত-তানজালি। অষ্টম শতাব্দীতে তার জন্ম। তিনি বাবার তত্ত্বাবধানে জ্ঞান অর্জন করেন। কবিতা ও চিকিৎসাজগতে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। সে যুগে তিনি চিকিৎসাজগতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। (আত-তিব্ব ওয়া রাইদাতুহুল মুসলিমাত, পৃষ্ঠা ৯৩)

উম্মে আহমাদ আল-কাবিলা

মামলুকি যুগের এক দ্বীনদার ও ধার্মিক চিকিৎসক। তিনি ধাত্রীবিদ্যা ও প্রসূতি বিশেষজ্ঞ ছিলেন। বিনা পয়সায় জনগণের চিকিৎসা করতেন।

জোহরা বেগম কাজী

ভারত উপমহাদেশের প্রথম মুসলিম নারী চিকিৎসক। ১৯১২ সালে ভারতে জন্মগ্রহণ করেন। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন দিল্লির হার্ডিঞ্জ মহিলা মেডিক্যাল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি লাভ করেন। ভারতের বিভিন্ন হাসপাতাল ও মেডিক্যাল কলেজে অধ্যাপনা ও চিকিৎসক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

খালেদা আবদুল ওয়াহহাব কায়সি

১৯২৪ সালে ইরাকে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব থেকে চিকিৎসক হওয়ার স্বপ্ন ছিল তাঁর। ১৯৪৭ সালে ইরাকের রয়াল মেডিক্যালে গ্র্যাজুয়েশন সম্পন্ন করে বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাসেবা দেন। এ ছাড়া বন্ধ্যাত্ব, গর্ভবতীদের রক্তশূন্যতা, ক্যান্সারসহ বিভিন্ন বিষয়ে তার গুরুত্বপূর্ণ গবেষণামূলক প্রবন্ধ রয়েছে। মহিলা চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য ইরাকের হাসপাতালগুলোতে প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ বিভাগ চালু করা তাঁর উল্লেখযোগ্য কীর্তি।

ওয়াফা আস-সদর

১৯৫০ সালে মিসরে জন্মগ্রহণ করেন। আস-সদর মিসরের কায়রো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মেডিসিনে স্নাতক এবং হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জন এফ কেনেডি স্কুল অব গভর্নমেন্ট থেকে জনপ্রশাসনে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন। তিনি ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর এইডস কেয়ার অ্যান্ড ট্রিটমেন্ট প্রগ্রামসের (আইসিএপি) পরিচালক। ১৯৮৮ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত তিনি এইচআইভি/এইডস এবং টিবি প্রগ্রাম বিকাশে সহায়তা করেছিলেন। করোনাভাইরাস মহামারি শুরুর পর থেকে ওয়াফা আস-সদর নিউ ইয়র্ক সিটি টেস্ট অ্যান্ড ট্র্যাকিং গ্রুপ এবং কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কভিড-১৯ টাস্কফোর্সের সদস্য হিসেবে কাজ করেছেন।

প্রযুক্তির হাত ধরে উম্মাহর খিদমাহতে বর্তমানের মুসলিমাহ

বর্তমান বিশ্ব এবং গোটা বিশ্বের মুসলিম উম্মাহ এখন প্রযুক্তির সাহায্যে অনেক সংযুক্ত। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে পর্দার পরিবেশ নিশ্চিত করেই উম্মাহর নারীরা আরো বেশি এগিয়ে যাচ্ছেন সাহাবিয়াত (রা.) উনাদের আদর্শ অনুসরণে।

বিশ্বজুড়ে ইলম এবং দাওয়াহর খিদমাহ

বর্তমানে বিভিন্ন দেশে বেড়ে চলছে নারী স্কলারদের পদচারণা। কুরআন, হাদীস , ফিকহ কোন দিকেই পিছিয়ে নেই উনারা। ত্বলিবারা সফর না করে অন্য দেশ থেকেও নারী আলিমাদের কাছ থেকে উনাদের সান্নিধ্যে এই জ্ঞান অর্জন করতে পারছেন, ইজাজাহ নিচ্ছেন। শুধু অন্য দেশেই নয়, নিজেদের দেশেও সফর কিংবা পরিবেশের ফিতনার আশংকা থাকলে এই পদ্ধতিতে ইসলাম শিক্ষা, এর প্রয়োগ, দারস, হালাকায় অংশ নিচ্ছেন উম্মাহর অনেক বড় একটা অংশের নারীগণ । বর্তমান বিশ্বের বিখ্যাত কয়েকজন নারী স্কলার, যাদের সান্নিধ্যে দ্বীনের গভীর জ্ঞান লাভ সরাসরি উপস্থিত না থেকেও সম্ভব হচ্ছেন উনারা হলেনঃ শাইখা ড.হাইফা ইউনুস, নাইমা রবার্ট , শাইখা মারওয়া আল গিন্ডি, যাইনাব আল গাযী প্রমুখ।

বর্তমানে বিভিন্ন মোবাইল এবং কম্পিউটারের সাহায্যে প্রযুক্তি ব্যবহার করে কিতাবের পাশাপাশি প্রকাশ হচ্ছে অনেক গবেষণা, যা অনলাইনে গোটা পৃথিবীর মুসলিমদের জন্য উন্মুক্ত থাকছে। সীরাহ , হাদীসের উপর দাওয়াহ দেয়ার জন্য সেমিনার, পোস্টার ডিজাইন, প্রচারণা এসবও খুব সহজেই সম্ভব হচ্ছে। মুসলিমাহগণ এসব প্রযুক্তির ব্যবহার শিখছেন, দক্ষতার সাথে প্রয়োগ করে ইসলামের ইলম প্রচার এবং দাওয়াহ কার্যক্রমকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন নিজ দেশের প্রত্যন্ত এলাকা এবং বিশ্বের প্রত্যন্ত দেশগুলোতেও।

কর্মমুখর সাহাবিয়াত (রাঃ) উনাদের অনুসরণ

কুটিরশিল্প, হাতের কাজ, সেলাই, বেকিং ইত্যাদি ট্রেনিং এখন ঘরোয়া পরিবেশেই ইন্টারনেটের মাধ্যমে নেয়া সম্ভব। নারীদের মাধ্যমেই সকল কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। উম্মুল মু'মিনীন সাওদা (রা.) প্রশংসিত ছিলেন আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এমন গুনের কারণে। তিনি হাতের সেলাইয়ের কাজ করতেন, তা থেকে প্রচুর সাদাকাহ করতেন। উনারা ঘরের কাজগুলোর মাধ্যমে সংসারে সাহাবীগণকেও অনেক সাহায্য করতেন। এখন ঘরে বসে এই অনলাইন প্ল্যাটফর্মকে কাজে

লাগিয়ে দ্বীন প্রচার যেমন সম্ভব হচ্ছে বেশি, সেই সাথে নারীরা ইসলামের সকল বিধানের মধ্যে থেকে প্রয়োজনের তাগিদে সংসারে সহোযোগিতা করতে পারছেন এবং পিতা মাতাকেও দেখাশুনা করতে পারছেন।

উম্মাহর দূর্যোগ বা বিপর্যয়ে পাশে দাঁড়ানো

আমরা জানি, বর্তমানে গাযা, কাশ্মীর , সিরিয়া, ইয়েমেন, চীনের উইঘুরে মুসলিম উম্মাহর উপর চরম জুলুম নির্যাতন চলছে। ধর্মীয়ভাবে জুলুম, দূর্ভীক্ষ তৈরি করে জুলুম, নারীদের ইজ্জতের উপর হামলা, বছরের পর বছর হত্যা, কারাগারে বন্দী , শারীরিক মানসিক নির্যাতন থেকে রেহাই পাচ্ছেনা মুসলিম নারী, শিশু, যুবক বৃদ্ধ কেউই। ইন্টারনেট এবং অনলাইন প্রচারণার মাধ্যমে নারীরাও ঘরে বসে এসবের বিরুদ্ধে করতে পারছেন কঠোর প্রতিবাদ। বিভিন্ন লিখালিখি, পোস্টারের মাধ্যমে বিশ্বকে জানাচ্ছে, সাহায্য চাচ্ছে। অনুদান সংগ্রহ করে দূর দূরান্তের দেশ থেকেও আর্থিক সাহায্য পাঠাতে পারছে ই-ট্রান্স্যাকশানের মাধ্যমে। “ইসলামিক রিলিফ”, “ওয়ান উম্মাহ” ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানগুলো যেমন এই দূর্যোগে কাজ করছে, তেমনি নারীরাও অনলাইনে যুক্ত থেকে প্রতিটা কাজের ব্যাপারে ভুমিকা রাখতে পারছেন। আজকাল আমাদের দেশেও অতিবৃষ্টি, বন্যা, আন্দোলনের মতো দুর্যোগ এবং কঠিন পরিস্থিতিতে এই ভূমিকাগুলো খুবই দৃশ্যমান।

এ প্রজন্মের মুসলিম নারীর কৃতিত্ব

মুসলিম মহীয়সীদের অনুসরণ করে এ প্রজন্মের মুসলিস নারীরাও বহুবিধ জ্ঞানার্জনের পথে অগ্রসর হয়েছেন। পাশাপাশি রাষ্ট্রীয়, সামাজিক বিভিন্ন কাজে এবং ইসলাম প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বড় বড় অবদান রেখেছেন। ঘরের ভেতরে, বাইরে, সর্বক্ষেত্রে, নিজেদের নাম ও কর্মের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে আসছেন।

ফারসী সাহিত্যে মুসলিম নারীদের রয়েছে বিশেষ অবদান। **'আদিবুল মামালিক' ফারহানী** বিশ শতকের প্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ মহিলা কবি। শুধু কাব্য জগতে নয়, নারী স্বাধীনতা ও নারী অধিকার সম্পর্কে তিনি বেশ সংখ্যক প্রবন্ধও রচনা করেন। এ জন্য তাঁকে 'আদিবাতুজ জামান' (কালের গৌরব) আখ্যায় ভূষিত করা হয়।

ইসলামী জীবন ব্যবস্থাতে আকৃষ্ট হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার ক্ষেত্রে পশ্চিমা জগতের **মরিয়ম জামিলা** এক বিশেষ ব্যক্তিত্ব। তিনি একজন আমেরিকান-পাকিস্তানি লেখিকা যিনি ছিলেন ধর্মান্তরিত নও মুসলিম। তাঁর নাম ছিল মার্গারেট মার্কাস। ছোটবেলা থেকেই ইহুদীবাদের গলদ তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তিনি ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। এ জন্য তাকে অনেক দুঃখ-কষ্ট সইতে হয়েছে এমনকি নিজ পরিবারেও যথেষ্ট লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছে। শেষ পর্যন্ত নিজের দেশ, বাড়ী-ঘর, স্বজন ছেড়ে পাকিস্তানে হিজরত করেন। তিনি তার শিক্ষাগত যোগ্যতার সবটুকু মুসলিম জাগরণের কাজে লাগানোর জন্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তিনি ইসলামী সংস্কৃতি ও ইতিহাস সম্পর্কিত ত্রিশেরও বেশি বই লিখেছেন। তার মধ্যে- Islam Vs the west, Islam in theory and practice, Islam and modernism প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর বিখ্যাত বই 'Islam and modernism' ইসলামী চিন্তার জগতে এক বিরাট আন্দোলন সৃষ্টি করেছে।

বর্তমান বিশ্বে ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজে মহিলাদের ভূমিকার কথা বলতে গেলে যে নামটি কোনক্রমেই বাদ দেয়া যায় না তিনি হলেন মিশরের **জয়নব আল গাজালী**। পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী এবং সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর নির্মম অত্যাচার নিপীড়ন সহ্য করে ইসলামী আন্দোলনের বিপ্লবী কাফেলাকে সামনে এগিয়ে নেয়ার জন্যে যেসব বিপ্লবী মানুষ জীবন বাজী রেখেছেন তাদেরই একজন জয়নব আল গাজালী। তিনি ছিলেন মুসলিম সংগঠনের নেত্রী। প্রথমে প্রশাসন তাকে আটকানোর জন্য ষড়যন্ত্রের ফাঁদ পাতেন। যখন কোনক্রমেই এই মহিয়সী মহিলাকে ষড়যন্ত্রের ফাঁদে ফেলতে পারলেন না তখন তাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

কিন্তু আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে তিনি নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পান। অবশেষে শেষ রক্ষার জন্য তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। তাঁর উপরে মিশরের জেলখানায় যে শারীরিক, মানসিক নির্যাতন চালান হয় তা ভাষায় অবর্ণনীয়। কারাগারের সীমাহীন অত্যাচার-যুলুমের পরেও তিনি স্বৈরাচারী খোদাদ্রোহী সরকারের কাছে নতী স্বীকার করেননি। যাবতীয় নির্যাতন সহ্য করে তিনি অটল-অবিচল থেকেছেন আল্লাহর পথে। নির্যাতনের সেই লোম হর্ষক কাহিনী নিয়ে তিনি রচনা করেছেন 'কারাগারে রাত দিন' নামে একটি বই।

এ ছাড়াও এ প্রসঙ্গে নাম করতে হয় সাইয়েদ কুতুবের বোন **হামিদা কুতুব**কে। তাঁকে তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হয়। অন্য আর এক বোন আমিনা কুতুবকে জেল খানায় নির্যাতন করা হয় এবং সেখানেই তিনি শাহাদত বরণ করেন। এ ছাড়াও বিপ্লবী নারী হিসেবে তুরস্কের হালিমা এদিব হানুম মুসলিম নারী সমাজের গৌরব।

ড. আফিয়া সিদ্দিকী একজন নিউরোলজিস্ট, একজন হাফিজা, দাওয়াতি মুসলিমাহ, কাফিরদের ষড়যন্ত্রের শিকার একজন নির্যাতিতা।
আফিয়া সিদ্দিকী ব্র্যান্ডিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নায়ুবিজ্ঞান বিভাগ থেকে ২০০১ সালে পিএইচ.ডি. করেন। প্রফেসর নোয়াম চমস্কি তার সম্পর্কে বলেন, "আফিয়া যেখানেই যাবে সেখানের পরিবেশকেই পাল্টে দেবে।"
কোমল হৃদয়ের অধিকারী ড. আফিয়া দাতব্য ও সেবামূলক কাজ করতেন। তিনি বসনিয়ার মজলুম নারী ও শিশুদের জন্য একাই এক হাজার ডলার জমা করেন যা সম্ভবত কোনো ছাত্রীর পক্ষ থেকে ফান্ড গঠনের বিশ্ব রেকর্ড ছিল।
তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন আমেরিকার মত একটি দেশকে মুসলিম রাষ্ট্রে পরিনত করার। তিনি বলতেন, আমেরিকা আমাকে জাগতিক শিক্ষা দিয়েছে আর আমি আমেরিকার জনগণকে ইসলামের শিক্ষা দেবো। এই উদ্দেশ্যে ১৯৯৯ সালে ড. আফিয়া তার বোন ড. ফাওজিয়াকে সাথে নিয়ে ইনিস্টিউট অফ ইসলামিক রিসার্চ এন্ড টিচিং প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। হাজার হাজার কপি কুরআন বিতরণ করেছেন। বিশেষভাবে কারাগারে অবস্থানরত বন্দিদের মাঝে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন। মার্কিন গবেষক ও স্কলার স্টিফেন ল্যান্ডমিন বলেন, "ড. আফিয়া সিদ্দিকীর অপরাধ শুধু একটিই সেটা হলো, সে ভুল সময়ে ভুল জায়গায় ইসলামের প্রচার-প্রসার করেছিলেন।" সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে চলা কথিত যুদ্ধের নামে ড. আফিয়া সিদ্দিকীকে ২০০৩ সালে তিন সন্তানসহ আইএসআই অপহরণ করে এফবিআই এর হাতে তুলে দেয়। অপহরণের পর থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত আফগানিস্তানের বিভিন্ন কারাগারে আফিয়া সিদ্দিকীকে পাশবিক, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করা হয়। এরপর তাকে আফগানিস্তানে নাটকীয়ভাবে গ্রেফতার দেখানো হয়। ২০১০ সালে মার্কিন আদালতে অন্যায়ভাবে ৮৬

বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। ড. আফিয়ার জীবনকর্ম, অপহরণ, গ্রেফতার নাটক, সন্তানদের অবস্থা, মামলা, কারাদণ্ড এবং বর্তমান অবস্থা নিয়ে "আফিয়া সিদ্দিকী: গ্রে লেডি অব বাগরাম" নামে একটি বই রচিত হয়েছে।

আধুনিক যুগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতেও মুসলিম নারীদের পদচারণ বেড়েছে। স্টেম এডুকেশন বা সায়েন্স, টেকনোলজি, ইঞ্জিনিয়ারিং ও ম্যাথমেটিকস—এই চারটি বিষয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছেন তারা। শিক্ষা ও গবেষণায় হিজাব ও ধর্মীয় অনুশাসন তাঁদের সাফল্যের পথে এগিয়ে যেতে প্রেরণা জুগিয়েছে।

হিসা আল জাবির : হিসা বিনতে সুলতান আল জাবির একজন প্রকৌশলী, শিক্ষাবিদ ও রাজনীতিবিদ। তিনি কাতারের বর্তমান আমির শেখ তামিমের প্রথম তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মন্ত্রী। কাতারের আইসিটি অবকাঠামো ও টেলিযোগাযোগে বিপ্লব ঘটাতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন তিনি। ইন্টারনেট ব্যবহারকারী শিশুদের সুরক্ষায় পথ দেখান তিনি।
উপসাগরীয় দেশগুলোর উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন উপগ্রহ 'ইশাইল' তৈরির প্রচেষ্টায় প্রভাবশালী ভূমিকা পালন করেন তিনি। তা ছাড়া প্রথম কাতারি নারী হিসেবে জার্মানভিত্তিক আন্তর্জাতিক কম্পানি ফোকসভাগেনের সুপারভাইজরি বোর্ডে নিযুক্ত হন। ২০১৭ সালে তিনি কাতার আমির কর্তৃক প্রথম নারী হিসেবে আইন প্রণয়নকারী কনসালটেটিভ অ্যাসেম্বলির সদস্য নিযুক্ত হন।

হায়াত আল সিন্দি : মক্কায় জন্ম নেওয়া এই নারী একজন সৌদি বায়োটেকনোলজিস্ট। মধ্যপ্রাচ্যে এ বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রিধারী প্রথম নারী তিনি। জর্জ হোয়াইটসাইডসের বিখ্যাত গবেষণাগারে যোগ দিয়ে সবার নজর কাড়েন তিনি। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে প্রযুক্তির সহজায়নে প্রতিষ্ঠিত ডায়াগনস্টিকস ফর অলের সহপ্রতিষ্ঠাতা তিনি। তা ছাড়া মর্যাদাপূর্ণ হার্ভার্ড এন্টারপ্রাইজ প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়ে একটি প্রজেক্টের জন্য ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (এমআইটি) থেকে এক লাখ মার্কিন ডলার পুরস্কার লাভ করেন। পাশাপাশি বিল গেটস থেকেও আরো ১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থ সংগ্রহ করেন।

ডা. রানা দাজানি : ফিলিস্তিনি-জর্দানীয় আণবিক জীববিজ্ঞানী ডা. রানা দাজানি আম্মানের হাশেমিয়াহ ইউনিভার্সিটির জীববিজ্ঞান ও জৈব-প্রযুক্তি বিভাগের অধ্যাপক। আরব ও মুসলিম বিশ্বের অন্যতম প্রভাবশালী এই নারী বিশ্বের ১০০ প্রভাবশালী নারীর মধ্যে ১৩তম অবস্থানে। আণবিক জীববিজ্ঞান, জেনেটিকস ও স্টেম সেল তাঁর গবেষণাক্ষেত্রগুলোর অন্যতম।

ডায়াবেটিস ও ক্যান্সারের ওপর তাঁর জিনোম-ওয়াইড অ্যাসোসিয়েশন অধ্যয়ন জর্দানে স্টেম সেল রিসার্চ এথিকস ল ফ্রেমওয়ার্কের বিকাশে সহায়তা করে। গবেষণার পাশাপাশি নারীশিক্ষা ও ক্ষমতায়নে কাজ করেন তিনি।

আয়েশা আল সাফতি : মিসরীয় বংশোদ্ভূত আয়েশা আল সাফতি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কম্পিউটারবিজ্ঞানী। তিনি অ্যাডহক নেটওয়ার্কিংয়ে বিশেষজ্ঞ, যা দুর্যোগপূর্ণ এলাকায় ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে কম্পিউটেশনাল ডিভাইসের সংযোগ ওয়্যারলেস প্রযুক্তির মাধ্যমে নেটওয়ার্ক স্থাপন করতে ব্যবহৃত হয়। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'আমার ধর্ম আমাকে কাজ করতে নানাভাবে অনুপ্রেরণা জোগায়। পবিত্র কোরআন আমাদের ক্রিয়াকলাপ ও ধর্মীয় বিশ্বাসকে একটি বিশ্লেষণমূলক পরীক্ষায় ফেলার ওপর জোর দেয় এবং পূর্ববর্তীদের মতামতকে ক্রমাগত চ্যালেঞ্জ করে। এই মনোভাব সব বিজ্ঞানীর জন্য অপরিহার্য। আর কম্পিউটারবিজ্ঞানে যেকোনো দাবিকে গাণিতিক ও যৌক্তিক বিন্যাসে ব্যাখ্যা, বোঝা ও যাচাই করা হয়।

সামিরা ইসলাম : সৌদি ফার্মাকোলজিস্ট ও শিক্ষাবিদ সামিরা ইবরাহিম ইসলাম। বর্তমানে তিনি কিং আবদুল আজিজ ইউনিভার্সিটির কিং ফাহাদ মেডিক্যাল রিসার্চ সেন্টারের ড্রাগ মনিটরিং ইউনিটের প্রধান। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে পড়াশোনা শেষ করে সৌদি নারীদের আনুষ্ঠানিক উচ্চশিক্ষা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তা ছাড়া নার্সিং ফ্যাকাল্টি খোলার ক্ষেত্রেও তিনি প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর প্রধান আগ্রহের ক্ষেত্র ড্রাগ মেটাবলিজম। আরব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ফাউন্ডেশন বোর্ড এবং বিজ্ঞান ও গবেষণায় অবদানের জন্য তিনি মক্কা অ্যাওয়ার্ড অব এক্সিলেন্স লাভ করেন।

খাতিজাহ মোহাম্মদ ইউসুফ : মালয়েশিয়ার শিক্ষাবিদ ও ভাইরোলজিস্ট খাতিজাহ মোহাম্মদ ইউসুফ। পেনাংয়ে পড়াশোনার পর অস্ট্রেলিয়ার লা ট্রোব ইউনিভার্সিটিতে কলম্বো প্ল্যান স্কলারশিপ নিয়ে পড়েন তিনি। পোলট্রি ভাইরাস বিষয়ক তাঁর গবেষণা নিউক্যাসল ডিজিজ ভাইরাস (এনডিভি) বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি পেয়েছে। ২০০৫ সালে এশিয়ার দ্বিতীয় বিজ্ঞানী হিসেবে তিনি মাইক্রোবায়োলজির জন্য ইউনেসকোর কার্লোস ফিনলে পুরস্কার লাভ করেন। ২০০২ সালে হাউটন ট্রাস্টের পক্ষ থেকে ওয়ার্ল্ড ভেটেরিনারি পোলট্রি অ্যাসোসিয়েশনের (ডাব্লিওভিপিএ) কংগ্রেসে পোলট্রিশিল্পে অবদানের জন্য প্রথম এশীয় বিজ্ঞানী হিসেবে তাঁকে বিশেষ সম্মাননা দেওয়া হয়।

বুরসিন মুতলু পাকদিল : তুরস্কের জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞানী বুরসিন মুতলু পাকদিল। পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে তুরস্কের বিলকেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন তিনি। কিন্তু সেখানে হিজাব নিষিদ্ধের পরও তা পরায় নানা ধরনের বাধার সম্মুখীন হতে হয় তাঁকে। এরপর যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস টেক ইউনিভার্সিটি থেকে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করে মিনেসোটা ইউনিভার্সিটি থেকে অ্যাস্ট্রোফিজিকস বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি সম্পন্ন করেন। ইউনিভার্সিটি অব আরিজোনায় পোস্ট-ডক্টরাল গবেষণা সহযোগী নিযুক্ত হন। ইউনিভার্সিটি অব শিকাগোয় কাভলি ইনস্টিটিউট ফর কসমোলজিক্যাল ফিজিকস (কেআইসিপি) পোস্ট-ডক্টরাল ফেলো হিসেবে কাজ করছেন। ২০২০ সালে তিনি টেড-এডের সিনিয়র ফেলো ছিলেন। আমেরিকান অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটি ও ন্যাশনাল সায়েন্স ফাউন্ডেশনসহ বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন তিনি। গবেষণার সময় তিনি বিরল গ্যালাক্সি আবিষ্কার করেন, যা তাঁর নামেই (Burcin's galaxy) বেশ পরিচিত। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় মুসলিম নারীদের অংশগ্রহণ বাড়াতে কাজ করে যাচ্ছেন তিনি।

তাহানি আমির : মিসরীয় বংশোদ্ভূত মহাকাশ প্রকৌশলী তাহানি আমির। যান্ত্রিক প্রকৌশলে স্নাতক এবং মহাকাশ প্রকৌশলে স্নাতকোত্তরের পর তিনি ভার্জিনিয়ার ওল্ড ডোমিনিয়ন ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচডি ডিগ্রি সম্পন্ন করেন। ১৯৯২ সালে নাসায় কাজ শুরু করেন। সেখানে কম্পিউটেশনাল ফ্লুইড ডাইনামিকস প্রজেক্ট (সিএফডি) নামে তাঁর একটি প্রকল্প ছিল। তাঁর কাছে ধর্ম ও ইসলাম উভয়ই গুরুত্বপূর্ণ। তাই কর্মক্ষেত্রের বাইরে তিনি জনসাধারণকে ইসলাম বুঝতে সহায়তা করেন। ২০১৪ সালে নারী ও সংখ্যালঘুদের বিজ্ঞানবিষয়ক ক্যারিয়ার গড়ে তুলতে উৎসাহ দেওয়ার জন্য নাসার পক্ষ থেকে পাবলিক সার্ভিস পুরস্কার লাভ করেন। তিনি তাঁর জীবনে তিনটি মূলনীতি অনুসরণ করেন— সৃষ্টিকর্তাকে অনুসরণ করুন এবং আপনি সবাইকে খুশি করতে পারবেন। শিক্ষা সুযোগের চাবিকাঠি। সহানুভূতি ও অনুগ্রহের মাধ্যমে অন্যের সেবা করুন।

অসংখ্য নারী প্রতিভাদের মধ্য হতে মাত্র কয়েক জনের নাম এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল।

বর্তমান যুগের নারীদের জন্য করণীয়

ইসলামের প্রারম্ভিক কাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা খুবই প্রসংশনীয়। তবে যুগের সাথে সাথে পরিস্থিতি পরিবর্তন হচ্ছে,সুযোগ এবং ফিতনার ধরণেও আসছে পরিবর্তন। তাই ইসলামের মুল ভিত্তি, বিধিবিধান অক্ষুণ্ণ রেখে মুসলিমাহদের কাজ করে যেতে হবে। দায়িত্বের প্রাধান্যগুলো বুঝতে হবে। গুরুত্বপুর্ণ করনীয়গুলো নিম্নরূপঃ

ফরজের ব্যাপারে সর্বাধিক মনযোগ দেয়া

ইসলামী শরীয়তে সকল মুসলিমের জন্য কতক ফরজ বিধান বা অবশ্য কর্তব্য আছে। পাশাপাশি নারী-পুরুষের জন্য পৃথক বিধি বিধানও আছে। মুসলিমাহ হিসেবে একজন নারীর প্রথম করণীয় হলো আল্লাহর বিধানগুলো যথাযথভাবে মেনে চলা। একজন নারী হিসেবে আল্লাহ যেমন অনেক মর্যাদা এবং অধিকার দিয়েছেন। কিন্তু, অবশ্যই প্রত্যেককে আল্লাহর বিধানগুলো সম্পর্কে এবং অধীনস্থদের সম্পর্কেও জবাব দিতে হবে।

আনাস (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

الْمَرْأَةُ إِذَا صَلَّتْ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَأَحْصَنَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ

নারী যখন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করে, রাদানের সিয়াম পালন করে, লজ্জাস্থানের হেফাজত করে ও স্বামীর আনুগত্য করে, তখন সে জান্নাতের যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করতে পারবে। (মিশকাত, হা/৩২৫৪ সনদ হাসান)

ইসলামে নারীর জন্য প্রথম কর্তব্য বা ফরযগুলো এমনই খুব স্পষ্ট । তাই প্রথমত তাকে মনোযোগ দিতে হবে ফরজ ইবাদাতের দিকে। এরপর একজন নারীর জীবনের স্বাভাবিক কাজগুলোর প্রধান কেন্দ্র হবে তার পরিবার। পিতা মাতার আনুগত্য, সন্তানকে নেক সন্তান হিসাবে প্রতিপালন, স্বামীর সন্তুষ্টি অর্জনের উপরে অন্য কোন অতিরিক্ত কাজ/দায়িত্বকে প্রাধান্য দেয়া যাবেনা।

শরীয়তের বিধান অনুসরণে দৃঢ়তা প্রদর্শন

একজন আদর্শ মুসলিমাহকে শরীয়তের বিধি-নিষেধকে দৃঢ়তার সাথে পালন করতে হবে। নিজের জীবনকে আদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করতে হবে। খণ্ডিত ইসলাম নয়, বরং পূর্ণাঙ্গ ইসলামকে বরণ ও উপস্থাপন করতে হবে।

জ্ঞানার্জন

ইসলামে জ্ঞানার্জন ফরয বা অবশ্য করণীয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি অবতীর্ণ ওহীর প্রথম কথাই ছিল إِقْرَأ অর্থাৎ পড় এবং এই পড়াটাকেও অনির্দিষ্ট না করে إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَق অর্থাৎ "পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন" কথাটি জুড়ে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ জ্ঞানার্জন করতে হবে কিন্তু তার মূল ভিত্তি হবে আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে জানা।

হাদীসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

'প্রত্যেক মুসলিমের উপর দ্বীনী ইলম শিক্ষা করা ফরয'
(মিশকাত হা/২১৮)

এখানেও জ্ঞান বলতে ইসলামী জ্ঞানের কথাই ইঙ্গিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে "জ্ঞানার্জনের জন্যে প্রয়োজন হলে সুদূর চীনে যাও।" যে জ্ঞান মানুষকে খোদা বিমুখ করে দেয়-যা মানুষকে ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে নেয় এখানে সে জ্ঞানের কথা বলা হয়নি। যে শিক্ষা মানুষকে মুসলমানের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলে, মানুষের প্রতি মানুষের কর্তব্য, হারাম-হালাল, ন্যায়-অন্যায় প্রভৃতি সম্বন্ধে নির্দেশ দেয় সেটাই প্রকৃত ইসলামী জ্ঞান। আর এই জ্ঞানার্জনের তাগিদই দেয়া হয়েছে ইসলামে। তাই একজন মুসলিম নারীকেও সাধ্যমতো দ্বীনি ইলম অর্জন করতে হবে।
এই জ্ঞান আমরা পেতে পারি তিনটি সূত্র থেকে।

১। **কুরআন:** কুরআনই হচ্ছে ইসলামী জ্ঞানের প্রধান উৎস। মানুষের জন্যে করণীয় যাবতীয় বিধি-বিধান আল্লাহ পাক দিয়ে দিয়েছেন এ পবিত্র গ্রন্থে। কুরআন না বুঝে শুধু সুর করে পড়ার জন্যে নাযিল হয়নি। বরং পবিত্র কুরআনেরই কথা هُدًى لِّلْمُتَّقِين "এটা মুত্তাকিদের জন্যে জীবনযাপন বিধান।" আসলে এটা হলো জীবন পথের নির্দেশিকা।

কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে:

هَٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ

'ইহা সমস্ত মানুষের জন্যে একটি বিস্তারিত বর্ণনা আর মুত্তাকিদের জন্যে হেদায়াত এবং নসীহত স্বরূপ।' (সূরা আলে ইমরান: **১৩৮**)

কুরআনে আরও বলা হয়েছে:

وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ

'ইহাই আমার সোজা ও সরল পথ, অতএব তোমরা এই পথেই চল।' (সূরা আল আনআম: **১৫৩**)

এভাবে কুরআনের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ পাক মানুষকে এই সঠিক সত্য পথের দিকে আহ্বান জানিয়েছেন। তাওহিদ, রিসালাত ও আখেরাতের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য আল্লাহ তা'আলা বহু উদাহরণ, উপমা এবং বহু ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। কুরআন পাঠকালে এগুলো থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে হবে।

২। **হাদীস:** কুরআন পাঠের সাথে সাথেই হাদীস পাঠের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এর মাধ্যমে আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাস্তব জীবন এবং জীবনের খুঁটিনাটি দিক সম্পর্কে জানতে পারি।

আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্যে কোন ফেরেশতাকে নবী হিসেবে পাঠাননি। বরং যে সমাজের জন্যে বা যে কওমের জন্যে আল্লাহ তাআলা নবী পাঠিয়েছেন তিনি সেই কওমেরই মানুষ। কুরআনের ঘোষণা:

أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ

'আমি তো একজন মানুষ মাত্র, তোমাদেরই মত।' (সূরা কাহাফ: **১১০**)

সেই সমাজেরই একজন মানুষ হিসেবে কিভাবে আল্লাহর আইনের পুরাপুরি আনুগত্য করা যায় তার এক জ্বলন্ত উদাহরণ আমরা দেখতে পাই নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবা আজমাঈনের জীবনে। যাতে করে মানুষের একথা বলার কোন সুযোগ না থাকে যে, এ বিধান বাস্তবে মেনে চলা অসম্ভব। আমাদেরকেও ঐভাবেই আনুগত্য করতে হবে। তাই হাদীসের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

৩। **ইসলামী সাহিত্য:** কুরআন এবং হাদীস অধ্যয়নের সাথে সাথে ইসলামী সাহিত্য পাঠ অপরিহার্য। কারণ কুরআন এবং হাদীসকে আরও ভালভাবে বাস্তব জীবনের জন্যে

গ্রহণোপযোগী করে জানতে হলে বিভিন্ন মনীষীর রচিত ইসলামী সাহিত্য ও মুসলিমদের গৌরব উজ্জ্বল ইতিহাস পাঠ করতে হবে।

ইসলামের প্রাথমিক যুগের নারীরা জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে পিছিয়ে ছিলেন না। অন্যান্য মহিলার মধ্যে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা.)-এর ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যদি আমরা হযরত আয়েশা (রা.) ও অন্যান্য উম্মুল মু'মিনীন কর্তৃক রেওয়ায়াতকৃত হাদীসগুলো এবং তাদের পারিবারিক বিভিন্ন ব্যাপার না জানতে পারতাম, তবে নবী জীবনের অনেক দিক থেকে যেত অজ্ঞাত। আয়েশা (রা) জীবনের অধিকাংশ সময় কাটাতেন জ্ঞানার্জনে। সাংসারিক অন্যান্য কাজের চেয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছ থেকে জ্ঞানার্জনই তার সবচেয়ে প্রিয় ছিল। তাঁর জীবনের এই দিকটি মুসলিম মহিলাদের জন্য অবশ্য অনুকরণীয়।

পরিবার কেন্দ্রিক শিক্ষার ওপর গুরুত্ব প্রদান

পরিবারে পুরুষের কর্তৃত্ব বেশি থাকলেও, সব সদস্যদের উপর সাধারনত মা বা স্ত্রীর প্রভাব সবচেয়ে বেশি থাকে। মানসিকভাবে সংযোগটাও বেশি থাকে। এই সুযোগটাকে কাজে লাগিয়ে সবার উত্তম ঈমান, জীবনযাপন, উত্তম চরিত্র নিশ্চিত করার চেষ্টা করাটা পরিবারে একজন নারীর প্রধান করণীয়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময় সাহাবাগণ মদীনার ঘরে ঘরে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। ফলে সাহাবায়ে কিরাম (রা.), তাদের সন্তানগণ, পৌত্রগণ এবং তাদের স্ত্রীগণও কুরআনের শিক্ষা দ্বারা আলোকিত হয়ে ওঠেন।

তাই একজন মহিলার প্রথম দাওয়াত হতে হবে তার সন্তান, স্বামী, আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীর কাছে। বিশেষভাবে সন্তানকে সঠিকভাবে গড়ে তুলতে হবে। নারীদের দায়িত্ব হবে নিজের স্বামীকে, সন্তানকে অন্যায় কাজ থেকে দূরে রাখা এবং নারী সমাজের মন-মানসিকতায় এগুলোর বিরুদ্ধে ঘৃণা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কাজ করা।

প্রযুক্তির ব্যবহার

আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ

'তোমরা তাদের (কাফিরদের) মোকাবিলা করার জন্য যথাসাধ্য শক্তি সঞ্চয়ে প্রস্তুতি গ্রহণ করো।' (সূরা আনফাল: আয়াত ৬০)

আধুনিক যুগ মিডিয়া ও প্রচারের যুগ। এক সময় মুসলমানেরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারক ও বাহক ছিলেন। আজ অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। ইসলামের শত্রুরা প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করছে। আর ইসলামের ধারক-বাহক দাঈগণ শূন্য হাতে হতাশাগ্রস্ত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। শত্রুরা অতীব দক্ষতা ও চাতুর্যের সাথে ইসলাম সম্পর্কে বিষবাষ্প ছড়াচ্ছে। ব্যবহার করছে প্রযুক্তির সর্বশেষ আবিষ্কারকে। এক্ষেত্রে দাঈগণ শত্রুর জবাব দিতে যেভাবে ব্যর্থ, তেমনি ইসলামের দাওয়াত তুলে ধরার ক্ষেত্রে শোচনীয়ভাবে পিছিয়ে পড়েছে। পুরুষদের পাশাপাশি মহিলা দাঈদের এগিয়ে আসতে হবে। বিজ্ঞানের সর্বশেষ আবিষ্কারকে সংযুক্ত করতে হবে দাওয়াতের হাতিয়ার হিসেবে এবং জ্ঞানার্জনের মাধ্যম হিসেবে। বর্তমানে ইন্টারনেটের যুগে দ্বীনের ফরজ ইলম অর্জন করা অনেক সহজ হয়েছে। নিজের সুবিধামতো সময়ে ঘরে বসেই তা সম্ভব। তাই এ ব্যাপারে গাফেল থাকা উচিত নয়।

বিদআত, কুপ্রথা ও অন্ধ অনুকরণ বর্জন

আধুনিক নারীরা বিধর্মীদের বিভিন্ন রীতি-নীতির অনুকরণ করছে। বিশেষভাবে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির দিকে ঝুঁকে পড়ছে। এ পরিস্থিতিতে একজন মুসলিম মহিলার কাজ হচ্ছে সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন বিদআত, কুপ্রথা ও পাশ্চাত্য সাংস্কৃতির ছোঁয়া থেকে নিজেকে, সন্তানদের, পরিবারকে মুক্ত রাখা। সামাজিকভাবে এসব কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও প্রতিরোধ গড়ে তোলা। ঈমানী পরিবার ও পরিবেশ তৈরি করা।

সঠিক লক্ষ্য স্থির করাঃ

সঠিক লক্ষ্য না থাকলে কোন সাফল্যেই পৌঁছানো সম্ভব নয়। একজন সচেতন মুসলিম নারীর উচিৎ সবসময় স্পষ্ট লক্ষ্য স্থির করা। কোন কোন দায়িত্ব তাকে পালন করতে হবে, এই বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করা। আল্লাহ যে নিয়ামতগুলো দিয়েছেন, যে গুন দিয়েছেন তার বিকাশে কাজ করতে হবে এবং উত্তম কাজে লাগাতে হবে। এই ব্যাপারে আমরা সাহাবিয়ার সালাফগণের প্রচুর দৃষ্টান্ত পাই।

সায়্যিদিনা আয়িশা (রা.) ছিলেন খাদীজা (রাঃ) এর পর রাসূল (সাঃ) এর সবচেয়ে প্রিয় স্ত্রী। মাত্র ১৮ বছর বয়সে প্রিয়তম স্বামী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে হারিয়েছেন। এরপর তিনি দিশেহারা হয়ে যান নি, কিংবা সমাজের এক কোণে কোন ভূমিকাহীন পড়ে থাকেন নি। নিজেকে নিয়োজিত করেছেন জ্ঞান চর্চা এবং প্রচারের মহৎ কাজে। আল্লাহ তাআলা উনাকে সফল মুসলিমাহদের কাতারে মর্যাদা দিয়েছেন।
একজন মুসলিমাহ ইবাদাত এবং পরিবারের ফরজ আদায়ের পরেও দ্বীনের গভীর জ্ঞান অর্জন, চিকিৎসক, শিক্ষিকা হওয়া – এমন মহৎ লক্ষ্য নির্বাচন করতে পারেন যদি যথেষ্ট সময়, সুযোগ এবং মেধার অধিকারী হয়ে থাকেন। বর্তমানে এমন অনেক আলেমা আছেন যারা একই সাথে সন্তানদের উত্তম তারবিয়াহ দিয়েছেন, কুরআন/হাদীসের প্রসিদ্ধ বইগুলো পড়েছেন, পড়াচ্ছেন, চিকিৎসা/সামাজিক প্রয়োজনীয় সেবা দিয়ে যাচ্ছেন শারিয়াহর গন্ডীর মধ্যে থেকেই।

প্রতিটা ক্ষেত্রে লক্ষ্য স্থির করার পর এই বিষয়ে জ্ঞান অর্জন, প্রশিক্ষণ হিসেবে হাতে কলমে শেখা, অধ্যবসায় এবং অভিজ্ঞদের সহবতে থেকে নিজের সীমাবদ্ধতাগুলোর বিষয়ে পরামর্শ নেয়া- এই ধাপগুলো একজন মুসলিমাহকে পৌঁছে দিতে পারে দুনিয়া এবং আখিরাতের সফলতার চূড়ায়।

সময়ের কদর, শোকর এবং সবর করা

সূরাতুল আসরে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَالْعَصْرِ- إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ- إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

"সময়ের শপথ! নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। তারা ব্যতীত, যা ঈমান এনেছে, সৎকাজ করেছে, একে অন্যকে হক্ক এবং সবরের উপদেশ দিয়েছে।"
আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামত হলো সময়। মৃত্যুর সময় প্রতিটা মানুষ এই সময়ের জন্যই আফসোস করেন। সম্পদ হারালে ফিরে পাওয়া সম্ভব, কিন্তু একটা মুহূর্ত একবার পার হলে কখনোই তা আর ফিরে আসবেনা। তাই সময়কে কাজে লাগানো জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। দুনিয়ায় সফল প্রত্যেক মুসলিমাহ এই কাজটি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে করেছেন। ইতিহাসের পাতা উল্টালেও আমরা এমন শিক্ষাই পাই।
সায়্যিদিনা ফাতিমা (রাঃ) মাত্র ১৮ বছর বেঁচেছিলেন। অথচ তিনি উনার আমল,পরিশ্রম এবং কীর্তির জন্যে দুনিয়াতেই পেয়েছিলেন জান্নাতের সুসংবাদ। এমনকি তিনি হবেন জান্নাতী নারীদের সর্দার। তিনি এই অল্প হায়াতের জীবনেই হয়েছিলেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সবচেয়ে উত্তম অনুসারী।
সময়ের প্রতিটি মুহূর্তকে কাজে না লাগালে এভাবে সর্বোচ্চ কামিয়াবী অর্জন করা কখনোই সম্ভব না। বরং অনেক নিয়ামতের মধ্যে থেকেও নিজের গাফিলতির জন্য বঞ্চিত হতে হবে। শুধু সময় নয়, অন্য সমস্ত নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করতে হবে। আল্লাহর দেয়া নিয়ামতের শুকরিয়া আদায়ের অর্থ হলো তা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা। "শোকর" ও "সবর" একে অন্যের পরিপূরক। নিয়ামতের শুকরিয়া করতে পারলেই অস্থির না হয়ে ধর্য্য ধরা সম্ভব। আবার সবরকারীর পক্ষেই সম্ভব , নিয়ামত যতটুকুই হয়, তাতে সন্তুষ্ট থাকা।

আজকাল নারীদের চাহিদা ক্রমেই বেড়ে চলায় শোকর এবং সবরের অভাবে ভেঙ্গে যাচ্ছে অনেক সংসার। নিয়ামতের শোকর না করতে পারার কারণে নারীরা হতাশ হয়ে যান, এতে কর্মদক্ষতা, মানসিক সুস্থতাও অনেক কমে যায়। এমনকি কমে যায় সময়কে কাজে লাগানোর উৎসাহ এবং দক্ষতাও। তাই একজন মুসলিম নারীকে পারিবারিক, সামাজিক, আত্মিক দিক থেকে অগ্রগামী হতে হলে সময়ের সদ্ব্যবহার, সবর এবং শোকর এই তিনটি দিকেই অধ্যবসায় করে যেতে হবে।

সাধ্যমতো দ্বীনের কাজ এবং উম্মাহর খিদমাহ

ফরজ বা আবশ্যিক কাজের পর যে সময় সুযোগ থাকে, সেটা কাজে লাগিয়ে উম্মাহর জন্য খিদমাতে থাকা উচিৎ প্রত্যেক মুসলিম নারীর। যে বিষয়ে তার দক্ষতা আছে তার আরো চর্চা করা, উম্মাহর বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে খোঁজখবর রাখা, তার সাধ্যে যতটুকু আছে, ততটা সাহায্য করতে সবসময় চেষ্টা করতে হবে। অনলাইনে কাজ শিখে পর্দার মধ্যে থেকেও একজন মুসলিমাহ দেশে এবং গোটা বিশ্বের উম্মাহর জন্য ইলম, দাওয়াহ, উপকারী যেকোন বিষয়/জ্ঞান, সেবাদান, আর্থিক সাহায্য ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখার নিয়্যাত রাখতে এবং কাজ করতে পারেন। পরিচিত অভিজ্ঞদের সাথে পরামর্শ করা প্রথম ধাপ হতে পারে।

উপসংহার

ইসলাম পূর্ব যুগে নারীর ছিল না কোন মর্যাদা বা সম্মান। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে শক্তি মদমত্ত পুরুষ জাতির খামখেয়ালি ও বিবেচনাহীন ইচ্ছার চাপে পিষ্ট নারী জাতিকে প্রথমবারের মতো সম্মান ও মর্যাদার সমুন্নত আসনে বসিয়েছে ইসলাম। তার মনুষ্যত্ব, ইচ্ছাশক্তি আর স্বাধীন জীবনবোধকে স্বীকৃতি দিয়েছে। তার নারীত্বকে পবিত্র হিসেবে বিবেচনা করে সেই পবিত্রতাকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছে। সম্মান ও স্বাধীনতার যে স্তরে ইসলাম নারীকে আরোহণ করিয়েছে, সেই স্তরে আরোহন করে নারী মানবসভ্যতার বিভিন্ন অঙ্গনে অনস্বীকার্য ভূমিকা পালন করে আসছে।

ইসলামের স্বর্ণযুগে আমরা তাকালে দেখি - পরিবার, জীবনের, সমাজের প্রতিটা ক্ষেত্রে দক্ষতায় ভরপুর নারীদের অনন্য অবদান। বর্তমান সময়ের প্রতি শতাব্দীতেই ইতিহাস রচনা করছেন মুসলিম নারীরা। বিশ্ববিখ্যাত কাজগুলোই উজ্জ্বল হয়ে থাকলেও, ছোট ছোট অঙ্গনে জুড়ে থাকা কোন মুসলিমাহর কোন ভুমিকাই ছোট নয় বরং অপরিহার্য। প্রজন্মের পর প্রজন্ম এ থেকে শিক্ষা নিচ্ছে, দীক্ষা নিচ্ছে। গড়ে উঠছে আরেক প্রজন্মের শ্রেষ্ঠ নারী, শ্রেষ্ঠ বীরপুরুষেরা আজকের মুসলিমাহদের হাত ধরে। ইসলামে তাই মর্যাদার, দায়িত্বের জায়গা জুড়ে নারীরা। আর মুসলিম নারীদের অনন্য ভূমিকার হাত ধরে এগিয়ে চলেছে এই উম্মাহ, আরো ছড়িয়ে পড়ছে ইসলাম, গতি পাচ্ছে আমাদের সভ্যতার অগ্রযাত্রা।

কিন্তু বর্তমানে পাশ্চাত্য সভ্যতা নারী সমাজকে নিয়ে এক গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। তারা পৃথিবীব্যাপী প্রচার করছে নারী পুরুষের সমঅধিকারের বার্তা! তাদের সেই বহুল-চর্চিত 'নারীমুক্তি' 'স্বাধীনতা' আর 'সমঅধিকারের' সাধারণ ফলাফল, মুসলিম সমাজগুলোর মুসলিম নারীদের কারো কারো কাছে যে মুক্তি ও স্বাধীনতাকে আজকাল যৌক্তিক এবং আকর্ষণীয় বলে মনে হয়। আল্লাহ হেফাজত করুন! এসবের প্রলোভনে পা দিয়ে স্বরূপ হারানো থেকে বাঁচার জন্য মুসলিম নারীর নিজেকে চিনতে হবে। নিজের দ্বীনকে আঁকড়ে ধরতে হবে। দুনিয়া ও আখিরাতের সুখ ও সমৃদ্ধির জন্য তাকে ইসলামের দিক-নির্দেশনার শর্তহীন আনুগত্য করতে হবে। কেননা, একজন মুসলিমাহ তার পরিচয় খুঁজে পাবেন প্রকৃত ইসলাম থেকে। “মুসলিমাহ” পরিচয়ের মধ্যেই নিহিত থাকে একজন নারীর সম্মানজনক ব্যক্তিত্ব, মূল্যায়ন, সাবলীল স্বভাব প্রকৃতির সাথে মানানসই আচরণবিধি। “মুসলিমাহ” পরিচয়ের আনন্দ এবং তৃপ্ত নিয়ে আত্মবিশ্বাসের সাথে উপলব্ধি করতে পারবে সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত, নিজের এবং সকলের জন্য কল্যাণকর দায়িত্বগুলো।

ইসলামে নারীর ভুমিকার ক্ষেত্র অনেক । একজন শিশুর জন্ম থেকে শুরু করে তার প্রতিপালন,পারিবারিক, সামাজিক, আত্মিক, এমনকি বৈশ্বিক পরিমন্ডলে মুসলিমাহদের অনন্য অবদান আমাদের জীবনকে প্রতিনিয়ত সহজতর করছে। আর দ্বীনের জ্ঞান এবং পরিচয়ে সমুন্নত একজন নারী , শতাব্দীর পুরুষদের খামখেয়ালীপনা, স্বেচ্ছাচারিতার চাপে হারিয়ে যান না। বরং জ্ঞান গরিমায় উজ্জ্বল হয়ে পরিবার এবং সমাজের জন্য শক্তি হয়ে উঠেন। পর্দার সাথে জ্ঞান চর্চা, দাওয়াত, শিক্ষার কাজে আত্মনিয়োগ করে পরিবর্তন আনতে ব্যক্তিমন্ডল থেকে গোটা সমাজের ঘুনে ধরা মানসিকতায়। এর ধারাবাহিকতায়ই “ইসলাম” নারীকে যে অবস্থান দিয়েছে, তা দৃঢ় হতে থাকে প্রজন্মের মানসপটে, সভ্যতার ধাপে ধাপে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল বলেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“আমি সৃষ্টি করেছি জ্বিন ও মানুষকে কেবল এ জন্য যে, তারা আমারই ইবাদত করবে।“
(সূরা যারিয়াত: আয়াত ৫৬)

এই আয়াতে “ইবাদাত” শব্দটির মধ্যে অন্তর্নিহিত রয়েছে প্রত্যেকের জন্য নিজ নিজ কর্তব্যগুলো । এই কর্তব্যগুলোর গন্তব্য শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি । ইসলামে নারী এবং পুরুষভেদে কোন কাজকেই ছোট বা বড় করে দেখার অবকাশ আল্লাহ দেন নি। বরং যে উত্তম এবং উপকারী কাজটাই একজন নারী করে থাকে, তা শারিয়াহ এর মধ্যে থেকে হলে তা আল্লাহর কাছে ইবাদাত হিসেবে পৌঁছাবে। এর প্রতিদানে কোনরকম কমতি হবেনা।

সূরাতুল আলে ইমরানে এর স্বীকৃতি দিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ ۖ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ

“তাদের প্রভু তখন তাদের আহ্বানে সাড়া দিলেন -- ''আমি নিশ্চয়ই বিফল করবো না তোমাদের মধ্যের কর্মীদের কোনো কাজ -- পুরুষ হও বা নারী -- তোমাদের একজন অন্যজন থেকে”
(সূরা আলে ইমরান:১৯৫)

আল্লাহ তাআলার দেয়া এই স্বীকৃতি থেকে আজকে অনেক নারী বঞ্চিত। আমরা যখন পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রে প্রত্যেক নারীকে তার ভূমিকা রাখার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করতে পারবো, ইসলামে নারীকে যে অধিকার এবং মর্যাদা দেয়া হয়েছে তা নিশ্চিত করতে পারবো, তখনই আমাদের মুসলিমাহদের সর্বোচ্চ অবদান রাখার সুযোগ তৈরি হবে। আধুনিকতা আর পাশ্চাত্য সভ্যতার স্লোগান "নারী পুরুষের সমতা"। এই স্লোগানের ছায়ায় তৈরি হয় না নারীত্বের বিকাশের পরিবেশ। বরং নারীদেরকে ধাবিত করা হয় এক অসামঞ্জস্যপূর্ণ প্রতিযোগিতায়। এতে আত্মবিশ্বাসের সাথে নিজের অনন্য বৈশিষ্ট্যের অনুপ্রেরণায় দায়িত্ব পালনের সাহস কমে যায়। বরং পুরুষের অনুকরণে এক ভুল পথচলায় দায়িত্ব পালনের দক্ষতাটাই নষ্ট হতে থাকে।

সভ্যতা এবং ইতিহাস থেকে আমরা যদি আমাদের নারীদের সর্বোচ্চ অবদান নিশ্চিত করতে চাই, আমাদেরকে আধুনিকতা ও পাশ্চাত্যের ভাবধারা থেকে বের হয়ে ফিরতে হবে ইসলামেরই ছায়াতলে । তাহলে আজকেও আমরা ঘরে ঘরে পাব খাদীজা (রা.) এর মতো প্রেমময়ী চক্ষুশীতলকারী স্ত্রী, ফাতিমা (রা.) এর মতো বিশ্বনেতার কন্যা এবং গর্বিত বিশ্বজয়ী মুজাহিদের মা। উনাদের মধ্যে থেকেই পাব যুগের শ্রেষ্ঠ আলিমা, মুয়াল্লিমা, চিকিৎসক কিংবা বিজ্ঞানী।

তথ্যসূত্র

১. সহায়ক গ্রন্থ : মুসলিম মহীয়সীদের অমর অবদান (মাওলানা যুলফিকার আহমদ নকশবন্দী)
২. সহায়ক গ্রন্থ : ইসলামী দাওয়াত ও রাসূলুল্লাহর (সাঃ) মহিলা সাহাবা (ড. রাশীদাহ্)
৩. সহায়ক গ্রন্থ : ইসলামে নারীর ইলমী অবদান (মাওলানা কাজী আতহার মুবারকপুরী)
৪. সহায়ক গ্রন্থ : ইসলামে নারীর অবদান (মুফাক্কিরে ইসলাম হযরত মাওলানা সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.
৫. সহায়ক গ্রন্থ : নারী সাহাবীদের দীপ্তিময় জীবন (মাহমুদ আহমাদ গাদ্বানফার)
৬. সহায়ক গ্রন্থ : যুগে যুগে দাওয়াতী দ্বীনের কাজে মহিলাদের অবদান (মাসুদা সুলতানা রুমী)
৭. সহায়ক গ্রন্থ : আদর্শ সমাজ গঠনে নারী (শামসুন্নাহার নিজামী)
৮. সহায়ক গ্রন্থ : দ্বীন প্রতিষ্ঠায় মহিলাদের দায়িত্ব (শামসুন্নাহার নিজামী)
৯. সহায়ক গ্রন্থ : আদর্শ মুসলিম নারী (ডঃ মুহাম্মদ আলী আল হাশেমী)
১০. সহায়ক গ্রন্থ : মুসলিম নারী এবং সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য (অধ্যাপক ড. ফালেহ ইবন মুহাম্মাদ আস-সুগাইর)
১১. সহায়ক গ্রন্থ : মানবসভ্যতা বিনির্মাণে নারী (মুজাহিদুল ইসলাম মাইমুন)
১২. সহায়ক গ্রন্থ :নারী সাহাবিদের জীবনকথা (মাওলানা আবদুস সালাম নদভী)
১৩. https://www.alkawsar.com/bn/article/402/
১৪. https://www.alkawsar.com/bn/article/415/
১৫. https://www.alkawsar.com/bn/article/2059/
১৬. https://www.alkawsar.com/bn/article/598/
১৭. https://www.alkawsar.com/bn/article/402/
১৮. https://nari.alkawsar.com/bn/article/19/
১৯.
https://m.dailyinqilab.com/article/326762/%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A7%8E%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%AE-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AC%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%A8

২০. https://www.kalerkantho.com/feature/islamic-life/2021/03/08/1011854

২১. https://www.shomoyeralo.com/details.php?id=179387

২২. https://www.kalerkantho.com/print-edition/islamic-life/2021/03/08/1011854

২৩. https://projonmo.pub/dr-aafia-siddiqui/

২৪. https://m.somewhereinblog.net/mobile/blog/nurubrl/30308358

২৫. https://www.ummah24.com/?p=21726

২৬. https://www.kalerkantho.com/print-edition/islamic-life/2022/09/04/1179750

২৭. https://at-tahreek.com/article_details/7942

২৮. https://at-tahreek.com/article_details/11615

২৯. https://at-tahreek.com/article_details/11687

৩০. https://at-tahreek.com/article_details/11757

৩২. https://at-tahreek.com/article_details/11833

৩২. https://at-tahreek.com/article_details/11905

৩৩. https://at-tahreek.com/article_details/11976

৩৪. https://at-tahreek.com/article_details/12050